তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

একাদশ – দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

গোবিন্দ চন্দ্র রায়

সামসুজ্জামান

Shared By: Mozahidul Islam, Ctg

fb: Dream-Catcher Mozahid

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা, ফোন : 9881355, 01720557170/80/90

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩–১৪ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

রচনায়

গোবিন্দ চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক
ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
বিএসসি (অনার্স) ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স
এমএসসি, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ (রা.বি)
হায়ার ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড প্রোগ্রামিং,নট্রামস।
প্রাক্তন প্রভাষক (গেস্ট ফ্যাকাল্টি), আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা।
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (NTRCA সনদ প্রাপ্ত)

|||

সামসুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
বিএসসি (অনার্স), কম্পিউটার বিজ্ঞান (প্রথম শ্রেণি)
এমএসসি, কম্পিউটার বিজ্ঞান (প্রথম শ্রেণি)
প্রাক্তন প্রভাষক, রাজধানী আইডিয়াল কলেজ, রামপুরা।
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা
পরীক্ষক: শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
প্রধান পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন

প্লট–২, গুলশান সার্কেল–২, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল: ৯৮৮১৩৫৫, ০১৭২০৫৫৭১৭০/৮০/৯০

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট-২, গুলশান, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ১ জুলাই, ২০১৩

ট্রেডমার্ক রেজিঃ নং- ৯৬৫০৪, শ্রেণি-১৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাপ্তি স্থান: ক্যামব্রিয়ান বুকস্ এন মোর
৭২, প্রগতি সরণি,বারিধারা, জে-ব্লক, ঢাকা।
ফোন: ০১৮২৩০৫৫৩৯৯, ০১৭২০৫৫৭১৭৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া

চিত্র
সংগৃহীত

মূল্য: টাকা–

লেখকের প্রসঙ্গ কথা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনেক বিস্তৃত ও পরিবর্তনশীল বিষয়। প্রতিনিয়তই এই বিষয়ে ব্যাপক উন্নয়ন ও গবেষণা হচ্ছে। ফলে বিবর্তনের এ ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা প্রকৃতপক্ষে কঠিন কাজ। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অন্যতম চাবিকাঠি হল তথ্য। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যায়। যে যত দক্ষতার সাথে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবে সে তত দ্রুত উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়নশীল কোনো দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই।

ছাত্র-ছাত্রীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডার, মেধা ও সৃজনশীলতা, বেকারত্ব নিরসন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মে সফলতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওর্য়াকিং, সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস ও প্রোগ্রামিং ভাষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যথাসম্ভব বিশ্লেষণমূলক, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রণয়ন ও রূপায়ণ করা হয়েছে। ফলে বিষয়গুলো তাদের কাছে সহজে অনুধাবনযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হবে। বইটি পড়ে যাতে ছাত্র-ছাত্রী সহজে বুঝতে পারে সেদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। বইটি রচনার জন্য উচ্চতর শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের সহায়তা নিতে হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝার সুবিধার্থে বইটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি রচনা করতে দেশি-বিদেশি অনেক বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেই সাথে দেশি-বিদেশি সাময়িকী, জার্নাল ও ইন্টারনেট এর সহায়তা নিতে হয়েছে সর্বশেষ তথ্য সংযোজনের জন্য। এজন্য সংশ্লিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদের কাছে আমরা ঋণী।

কষ্টসাধ্য এবং বই লেখার মত দুঃসাহসী এই কাজটি করার জন্য আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন; ক্যামব্রিয়ান কলেজের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব জনাব **লায়ন এম, কে, বাশার** (পিএমজেএফ)। সেই সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সেলিমা রওশন এবং পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ গুলশান ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ ড. করুণাময় গোস্বামী। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স থেকে বইটি প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বইটি কম্পিউটার কম্পোজ ও সহযোগিতা করার জন্য আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনার মোহাম্মদ ইউনুছ মিয়া, কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ ওমর ফারুক'কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটি রচনার পেছনে ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষার্থীরা আমাদের নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে সেজন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞমণ্ডলির বিভিন্ন পরামর্শ বইটির মান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। এনসিটিবি (NCTB) কর্তৃক নতুন সিলেবাসের আলোকে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

বইটি প্রকাশে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটির উত্তরোত্তর মানোন্নয়নে যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা, নির্দেশনা, পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা সাদরে গ্রহণযোগ্য এবং একান্ত কাম্য।

গোবিন্দ চন্দ্র রায়
সামসুজ্জামান

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

প্রকাশকের কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এ পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য রচনা করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত, থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

লায়ন এম.কে. বাশার (পিএমজেএফ)
প্রকাশক
ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

পাঠ্যসূচি

১ম অধ্যায়ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (১০ পিরিয়ড)

বিশ্বগ্রামের ধারণাঃ যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস, বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদ, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি: প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতাঃ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, রোবটিকস, ক্রায়োসার্জারি, মহাকাশ অভিযান, আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, বায়োমেট্রিক্স, বায়োইনফরম্যাট্রিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো টেকনোলজি,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা,সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

২য় অধ্যায়ঃ কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং (১৫ পিরিয়ড)

কমিউনিকেশন সিস্টেমঃ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা, ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা, ব্যান্ড উইড্থ, ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড, ডেটা ট্রান্সমিশন মোড। ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমঃ তার মাধ্যম :কো-এক্সিয়াল, টুইস্টেড পেয়ার, অপটিক্যাল ফাইবার। তারবিহীন মাধ্যমঃ রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমঃ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা, ব্লু-টুথ, ওয়াই-ফাই, ওয়াই-ম্যাক্স। মোবাইল যোগাযোগঃ বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংঃ নেটওয়ার্কের ধারণা, নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য, নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ, নেটওয়ার্ক ডিভাইসঃ মডেম, হাব, রাউটার, গেটওয়ে, সুইচ, NIC । নেটওয়ার্কের কাজ, নেটওয়ার্ক টপোলজি, ক্লাউড কম্পিউটিং এর ধারণা, ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা।

৩য় অধ্যায়ঃ সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস (২০ পিরিয়ড)

সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস, সংখ্যা পদ্ধতিঃ প্রকারভেদ, রূপান্তর। বাইনারি যোগ বিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা, ২ এর পরিপূরক, কোডঃ কোডের ধারণা, BCD, EBCDIC,Alphanumeric code, ASCII,Unicode । বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইসঃ বুলিয়ান অ্যালজেবরা, বুলিয়ান উপপাদ্য, ডি-মরগানের উপপাদ্য, সত্যক সারণি, মৌলিক গেইট(AND,OR,NOT), সার্বজনীন গেইট, বিশেষ গেইট(X-OR,X-NOR) এনকোডার,ডিকোডার, অ্যাডার, রেজিস্টার, কাউন্টার।

৪র্থ অধ্যায় : ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML (২৫ পিরিয়ড)

ওয়েব ডিজাইনের ধারণাঃ ওয়েব সাইটের কাঠামো, HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ, HTML এর ধারণা, HTML এর সুবিধা, HTML ট্যাগ ও সিনটেক্স পরিচিতি, HTML নকশা ও কাঠামো লে-আউট, ফরম্যাটিং, হাইপারলিক, চিত্র যোগ করা (ব্যানারসহ), টেবিল, ওয়েব পেইজ ডিজাইনিং, ওয়েব সাইট পাবলিশিং।

৫ম অধ্যায়ঃ প্রোগ্রামিং ভাষা (৩৫ পিরিয়ড)

প্রোগ্রামের ধারণা, প্রোগ্রামের ভাষা, মেশিন ভাষা, অ্যাসেম্বলি ভাষা, মধ্যমস্তরের ভাষা, উচ্চস্তরের ভাষা- সি, সি++, ভিজুয়াল বেসিক, জাভা, ওরাকল, অ্যালগল, ফোরট্রান, পাইথন। চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা ,অনুবাদক প্রোগ্রামঃ কম্পাইলার, অ্যাসেম্বলার,ইন্টারপ্রেটার, প্রোগ্রামের সংগঠন, প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহঃ অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট, প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল। 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষাঃ প্রাথমিক ধারণা, বৈশিষ্ট্য, প্রোগ্রাম কম্পাইলিং, প্রোগ্রামের গঠন, ডেটা টাইপঃ ধ্রুবক, চলক, রাশিমালা, কী ওয়ার্ড, ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট, কনডিশনাল স্টেটমেন্ট, লুপ স্টেটমেন্ট, অ্যারে, ফাংশন ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (৩৫ পিরিয়ড)

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, DBMS এর কাজ, RDBMS, RDBMS এর বৈশিষ্ট্য, RDBMS এর ব্যবহার, ডেটাবেজ তৈরিঃ কুয়েরি, সর্টিং, ইনডেক্সিং, ডেটাবেজ রিলেশন, কর্পোরেট ডেটাবেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ, ডেটা সিকিউরিটি, ডেটা এনক্রিপশন।

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত **INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY**	০১ – ৩৩
২.	কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং COMMUNICATION SYSTEM & NETWORKING	৩৪ – ৭৩
৩.	সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস NUMBER SYSTEM & DIGITAL DEVICES	৭৪ – ১২৭
৪.	ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML INTRODUCTION TO WEB DESIGN & HTML	১২৮ – ১৫০
৫.	প্রোগ্রামিং ভাষা PROGRAMMING LANGUAGE	১৫১ – ২১২
৬.	ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম DATABASE MANAGEMENT SYSTEM	২১৩ – ২৩৮

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY: WORLD & BANGLADESH PERSPECTIVE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি- তথ্যের আদান-প্রদান, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার অনুপস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্যময় আধুনিক জীবন চিন্তাই করা যায় না। ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় জীবনের উন্নতি ও প্রগতি এবং বিশ্বের জাতিসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ এক অভিন্ন পরিবারের সোনালি স্বপ্ন দেখিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশের অসীম সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে, যোগাযোগে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, মেধাচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশ, বিনোদন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এটি মানসম্পন্ন কর্মসম্পাদনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিশ্বগ্রামে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে।

১.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of Global Village)

“গ্রাম” শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। গ্রামে সবাই মিলেমিশে একসাথে বসবাস করে। গ্রামে সবাই একে অপরকে ভালোভাবে চিনতে পারে। সবাই সবার সুখ দুঃখে এগিয়ে যায়। গ্রামের কোথায় স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি আছে তা সবারই জানা। গ্রামে কোথাও কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো ঘটনা ঘটলে সবাই মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারে। ঠিক তেমনই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে আজ সমগ্র পৃথিবী গ্রামের মতো ছোট হয়ে আসছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। যে কোনো বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে কি বিষয়ে কে গবেষণা করছেন তা আমরা জানতে পারি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যকার দূরত্ব অনেক কমেছে। আমরা যে কোনো দেশের মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারি। এজন্য বলা যায় যে, পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। এটি আমাদের ব্যবসায় উন্নতি এবং পারস্পারিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। এটি প্রায় অসম্ভব ছিল যে, বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় বসবাসকারি আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, কিন্তু এখন শুধু কথা নয়, যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তার সচল চিত্রও দেখা যায়। আমরা আগ্রহী হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি।

১.১.১ যোগাযোগ (Communication)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যোগাযোগ ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছে। বর্তমানে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ মাধ্যমগুলো হলো মোবাইল ফোন, ই-মেইল, টেলি কনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। আগে মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল চিঠি/পত্র। ডাক বিভাগের উপর আমাদের নির্ভর করতে হতো। তখন একটি চিঠি পৌঁছতে দেশের অভ্যন্তরে ৩ থেকে ৪ দিন এবং দেশের বাইরে চিঠি পাঠানোর ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১০ দিন বা তার চেয়েও বেশিদিন লাগতো। বিদেশে চিঠি পাঠানোর সময় নির্ভর করত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিডিউলের উপর। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাগজ, কলম ব্যবহার করে চিঠি লেখা অনেকেই ভুলে গেছে। ডাক বিভাগ অনেকটা অলসভাবেই সময় কাটাচ্ছে। এখন তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ই-মেইল। ই-মেইলের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে অল্প খরচে অতি দ্রুত যে কোনো সংবাদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করতে পারি। এক্ষেত্রে দেশ বা বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই সমান সময় লাগে। অপেক্ষা করতে হয় না কোনো ফ্লাইট সিডিউলের। এক্ষেত্রে সময় এবং খরচ বাঁচে এবং পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ, এর জন্য দরকার শুধু একটি ইন্টারনেট সংযোগ।

তাছাড়া মোবাইল টেকনোলজির ফলে আমরা খুব সহজে, অল্প খরচে সরাসরি কারো সাথে কথা বলতে পারি। ভিডিও কনফারেন্সিং এর সাহায্যে আমরা যার সাথে কথা বলি তাকে সরাসরি দেখতেও পারি। তাছাড়া রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে যেকোনো সংবাদ সহজে দেশ এবং বিশ্বের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া যায়। তাছাড়াও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আইসিটির একটি বড় ব্যবহার হলো বিভিন্ন যানবাহন যেমন-রেল, বিমান ইত্যাদির টিকেট রিজার্ভেশন এর ফলে আমরা বিভিন্ন স্থান থেকে রেলওয়ে এবং বিমানের টিকেট বুকিং করতে পারি। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আইসিটি যোগাযোগ ক্ষেত্রে গতি এনেছে এবং খরচ অনেক কমিয়েছে।

১.১.২ কর্মসংস্থান (Employment)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশ এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরে কোথায় কোন ধরনের কাজের চাহিদা রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারি এবং সে অনুযায়ী নিজেকে দক্ষ করে তুলতে পারি। বর্তমানে প্রায় সকল অফিস-আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। এর ফলে এ ফিল্ডের দক্ষ লোকের যেমন- প্রোগ্রামার, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি প্রয়োজন এবং এদের সাথে আরো অনেক সাপোর্টিং স্টাফ প্রয়োজন। এর ফলে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমাদের দেশে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু হয়েছে। এর ফলে অনেক বেকার যুবক/যুবতীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ/প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী তৈরি করার জন্য অনেক ট্রেনিং স্কুল/সেন্টার গড়ে উঠেছে-যাতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো। কিন্তু তাদের একটু যুযোপযোগী প্রশিক্ষণ দিলে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এদের বেকারত্ব ঘুচানো সম্ভব। আউট সোর্সিং হলো দেশে বসে অনলাইনের মাধ্যমে অন্যদেশের ক্লায়েন্টদের কাজ করিয়ে দিয়ে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করা। কাজগুলোর মধ্যে কম্পিউটার বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, ওয়েব ডিজাইন করা, ইমেজ এডিটরের কাজ। যারা একাজে জড়িত তাদেরকে ফ্রিল্যান্সার বা মুক্ত ব্যবসায়ী বলা হয়।

চিত্র: আইসিটি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে।

১.১.৩ শিক্ষা (Education)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারে একটি শক্তিশালী টুলস। ফরমাল এবং নন-ফরমাল উভয় পদ্ধতিতেই এটি অত্যন্ত কার্যকর। যে কোনো সময় এবং যে কোনো স্থানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে আইসিটির বদৌলতে। কোনো শিক্ষার্থী দিনের যে কোনো সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সকল কোর্স সংক্রান্ত তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। তাছাড়াও রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে লেকচার ব্রডকাস্টিং করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা প্রচুর পরিমাণে কোর্স সম্পর্কীয় উপাত্ত এবং তথ্য পেয়ে থাকে। সুতরাং উভয়ের জন্য যে কোনো বিষয়ে গবেষণা সহজ হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করছে। আইসিটি ব্যবহারের ফলে দেশের শিক্ষাবিদ বা এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণে ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রেণি, বয়স অনুযায়ী পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন দেশে পরিচালিত গবেষণা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম তৈরি করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করা যায়। গতানুগতিক লেখাপড়ার পদ্ধতির একটু পরিবর্তন করে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে শিক্ষাকে আরো আকর্ষণীয় করা হচ্ছে। ক্লাসের পাঠের

চিত্র: প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছেন।

সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন চিত্র, অডিও, ভিডিও ব্যবহার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণমূলক ক্লাসের মাধ্যমে পাঠের বিষয়কে শিক্ষার্থীদের সামনে আরো সহজ, বোধগম্য করে তোলা হয়। এর জন্য কম্পিউটার এবং প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়। শিক্ষকরা তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আপডেট রিচার্স/ গবেষণা সম্পর্কে ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য আর লাইব্রেরির মধ্যে বসে থাকতে হয় না। শুধু ইন্টারনেটে প্রবেশ করে উল্লেখিত/ প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে সার্চ দিলেই বের হয়ে আসে শত শত প্রবন্ধ রচনা বা বিভিন্ন ছবি। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অডিও এবং ভিডিও পাওয়া যায়। যা ব্যবহার করে শিক্ষকরা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পারে।

শিক্ষকরা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেকচার/ প্রবন্ধ/ অডিও/ ভিডিও নির্দিষ্ট ওয়েব সাইটে আপলোড করে রাখতে পারে, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে না গিয়েও ঐ লেকচার ডাউনলোড করতে পারে। বর্তমানে কিছু পরীক্ষাও অনলাইনের মাধ্যমে নেয়া হয়। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নেও তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তর পত্র মূল্যায়ন এবং রচনামূলক অংশের নম্বর মিলকরণ, বিভিন্ন বিষয়ের গ্রেডিং করা এবং জিপিএ নির্ণয় করা ইত্যাদি সকল কাজই প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাথে যোগাযোগ করে থিসিস পেপার তৈরি করা যায়। বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করে এমফিল/ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা যায়।

১.১.৪ চিকিৎসা (Treatment)

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা যা তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর তা আজ মানুষকে এনে দিয়েছে দীর্ঘ এবং সুন্দর জীবন। আইসিটি ব্যবহারের ফলে এক্সরে, আলট্রাসাউন্ড, এম আর আই (MRI) প্রভৃতি প্রযুক্তির সুফল আমরা পেয়ে থাকি। নতুন ঔষধ আবিষ্কার এবং ঔষধ এর উন্নয়ন সাধনের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ক্রটি নির্ণয় করা সম্ভব এবং প্রযুক্তি ও ঔষধ দ্বারা ঐ সকল ক্রটি সংশোধন করা সম্ভব। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির ব্যবহার করে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। আজকাল টেলিফোন এর মাধ্যমেও জনগণ চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকে। হাসপাতালে রোগীদের পাল্‌স, তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণে, রোগীর শরীর স্ক্যান, এবং রোগীদের রেকর্ড সংরক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। মূলকথা চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, রোগীর রেকর্ড, ওয়েব বেসড সাপোর্ট, যোগাযোগ ও গবেষণায় আইসিটি ব্যবহৃত হয়। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গ্রামের রোগীরা শহরের বড় বড় হাসপাতালের ডাক্তারদের পরামর্শ পেতে পারে। আইসিটি ব্যবহার করে দেশের বাইরে ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব। অর্থাৎ ডাক্তার এবং রোগী দুই স্থানে থেকে পরামর্শ আদান-প্রদান করা সম্ভব। তাছাড়া এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহার করেও আমরা চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ পেয়ে থাকি।

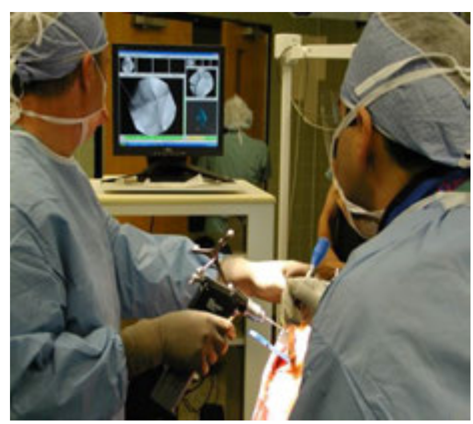

চিত্র: চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইসিটি

কাজ: "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়"—ব্যাখ্যা কর।

১.১.৫ গবেষণা (Research)

গবেষণা কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিসীম। পূর্বে দেখা যেত, একই বিষয়ের উপর একাধিক বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। একজন অন্য জনের খবর জানতেন না অথবা কোনো বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর গবেষণার অগ্রগতি, ফলাফল অন্যকে জানাতে পারতেন না। তিনি কোনো রেকর্ড রাখতে পারতেন না অথবা তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কেউ জানতো না। এ অবস্থায় ঐ আংশিক গবেষণা কোনো কাজে আসতো না। ঐ একই বিষয়ে অন্যজনকে আবার প্রথম থেকে কাজ শুরু করতে হতো। এভাবে হয়তো দিনের পর দিন চলতে থাকতো। কিন্তু বর্তমান এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে বিজ্ঞানীরা তাদের চিন্তাধারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা শুরু করলে ইন্টারনেটের সাহায্যে সবাই অবগত হয়। গবেষণার প্রতিটি ধাপের ফলাফল সকলের নিকট ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে একজনের গবেষণার ফলাফল কাজে লাগিয়ে অন্যজন গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে। ফলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয় না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং উপাত্তগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের সময় সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাব-নিকাস করার জন্য এবং যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কম্পিউটার/আইসিটি ব্যবহার করা হয়। প্রাণীর ডিএনএ তথা জীন নিয়ে গবেষণার জন্য আইসিটি ব্যবহার করা হয়। মানব দেহের বিভিন্ন গবেষণায় ত্রিমাত্রিক এনিমেশন ব্যবহার করা হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে গবেষণায় ত্রিমাত্রিক চিত্র ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার বিপদজ্জনক পদার্থ তৈরিতে যা ব্যবহারের পূর্বে পরীক্ষা করা প্রয়োজন সেখানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে পরীক্ষা করা যায়, সঠিক পরিমাপ এবং সূক্ষ্ম হিসাব গবেষণায় সঠিক ফলাফল পেতে সাহায্য করে। আর এ দুটিই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব শুধুমাত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

১.১.৬ অফিস (Office)

অফিস-আদালত অনেকটাই এখন তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ। অফিস বলতে এখন আর কক্ষের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে স্তূপ করা গুছানো বা অগুছানো কাগজ ফাইল, রেজিস্টার-এর উপর ধূলাবালি পড়ে আছে এমন একটি পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ে না। টেবিলের উপর একটি কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি প্রযুক্তির সব যন্ত্রপাতি প্রায় সকল অফিসেই রয়েছে। দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা অফিসের সকল ধরনের তথ্য, রিপোর্ট ইত্যাদি সবকিছুই এখন কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকে। অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারিদের হাজিরা এখন আর রেজিস্টারে স্বাক্ষর করে দিতে হয় না। বেশিরভাগ তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অফিসে পাঞ্চ কার্ড, ফিঙ্গার প্রিন্ট এর মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়। অফিসের সকলের বেতনের হিসাব এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে করে থাকে। অনেক অফিসের কর্মকর্তা-

চিত্র: সাধারণ অফিসের চিত্র।

চিত্র: আইসিটি সমৃদ্ধ অফিস।

কর্মচারিদের বেতন ইলেকট্রনিক উপায়ে কর্মচারিদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে যায়। এখন আর পিয়নকে অফিসের বিভিন্ন রুমে বিভিন্ন নোটিস নিয়ে ছুটা ছুটি করতে দেখা যায় না, কারণ এখন ই-মেইলের মাধ্যমে সকলের নিকট একযোগে যেকোনো নোটিস বা সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায়। বর্তমানে অফিসে কাগজের ব্যবহার নেই বললেই চলে। অফিসের নতুন কর্মচারিদের প্রশিক্ষণেও ব্যবহার করা হয় আইসিটি। সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। যেখানে ই-মেইলে সংবাদ পাঠানো যায় না সেখানে মোবাইল ফোন তো আছেই। তাছাড়া প্রত্যেক অফিসেরই রয়েছে নিজস্ব ওয়েব সাইট। এর মাধ্যমে জনগণ ইচ্ছা করলেই যেকোনো সময় ঐ অফিসের কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ জানতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন অফিসের কাজের দরপত্রও আহবান করা হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। জমাও নেয়া হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এর ফলে অফিসে পাবলিক গেদারিং নেই বললেই চলে।

১.১.৭ বাসস্থান (Residence)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের বাসস্থানকে করে তুলেছে অধিকতর নিরাপদ। আমরা আমাদের বাসস্থানের বাইরের দিকে সিসি (ক্লোজ সার্কিট) ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এর ফলে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কিছুর গতি-বিধি মনিটরিং করা যায়। এমন কি প্রয়োজনে রেকর্ডিং করা যায়। পরবর্তিতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে রেকর্ডকৃত তথ্য থেকে অপরাধী সনাক্ত করা বা সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মধ্যে সেন্সর ব্যবহারের ফলে এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে পারে। যেমন- ঘরে থাকা অবস্থায় লাইট, ফ্যান, এসি ইত্যাদি চালু থাকে এবং কেউ না থাকলে এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া আমাদের ঘরের দরজায় বিভিন্ন ধরনের সেন্সর ও বায়োমেট্রিক্স ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাসস্থানের নিরাপত্তায় আইসিটির ব্যবহার

১.১.৮ ব্যবসা-বাণিজ্য (Business)

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। সকল ক্ষেত্রেই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও আইসিটির ব্যবহার অপরিসীম। আইসিটি ব্যবহারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন শুধু নির্দিষ্ট দোকান বা ব্যবসা কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে। ইন্টারনেট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকেই বলে ই-কমার্স। ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইন্টারনেট মার্কেটিং, অনলাইন ট্রানজেকশন প্রসেসিং, ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জ, ইনভেন্টিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অটোমেটেড ডেটা কালেকশন

ব্যবসা- বাণিজ্যে আইসিটির ব্যবহার

সিস্টেমসমূহের উদ্ভাবন এবং ব্যাপক প্রচলনের ফলে দ্রুত ই-কমার্সের প্রসার ঘটছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পণ্য বেচা-কেনা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান রইল না। এখন সারা পৃথিবীব্যাপী বাজার তৈরি হয়েছে। কোনো পণ্য ক্রয় করার জন্য স্ব-শরীরে কোথাও যেতে হয় না। ঘরে বসেই বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য দেখতে বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। একই জাতীয় বিভিন্ন কোম্পানির পণ্যের মধ্যে তুলনা করতে পারা যায়। পণ্য পছন্দ হলে ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা বিভিন্ন প্রকার কার্ডের মাধ্যমে টাকা/মূল্য পরিশোধ করা যায় এবং ঘরে বসেই পণ্য ডেলিভারি পাওয়া যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া ব্যাংক, বিমা, ক্রেডিট কোম্পানি, পরিবহন ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডই অচল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান এবং যোগাযোগ টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার বুলেটিন বোর্ড, ইলেকট্রনিক মেইল, ওয়েব সাইট এবং ইন্টারনেট বাণিজ্যিক যোগাযোগ ইত্যাদি হলো যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর মাধ্যম। আজকাল কৃষি মার্কেটেও চালু হয়েছে এর ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর জানা যায় এবং কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

কাজঃ বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় যেসব উপাদান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

১.১.৯ সংবাদ (News)

আজকাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া সংবাদ মাধ্যম কল্পনা করা যায় না। আগে সংবাদ মাধ্যম বলতে কাগজে ছাপানো পত্রিকাকেই বুঝাত। তাছাড়াও ছিল সীমিত পরিসরে রাষ্ট্রীয় রেডিও এবং টেলিভিশন ব্যবস্থা। অতীতে দেশের এক প্রান্তে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে তা জানতে ২/৩ দিন সময় লাগত। এর ফলে অনেক তথ্যে বিকৃতি ঘটত বা হারিয়ে যেত। পূর্বে দেশের এক প্রান্তে পত্রিকা ছাপানো হত, সেটি দেশের অপর প্রান্তে যেতে সারাদিন লেগে যেত। কখনো কখনো পরের দিন পত্রিকায় পৌঁছাত। যদিও সাধারণভাবে আমরা সকালে নাস্তার টেবিলে পত্রিকা আশা করি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহরে ফলে অতি দ্রুত আমরা প্রতিদিনের সংবাদপত্র পেয়ে থাকি। কারণ এখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে একযোগে সংবাদপত্র ছাপানো হয়। বর্তমানে কোনো ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আমরা জানতে পারি। কারণ সংবাদ কর্মীরা টেলিফোনের মাধ্যমে তা কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছে দিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় অফিস তা ব্রডকাস্ট করতে পারে। তাছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিং- এর মাধ্যমেও সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে। দেশের কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে তার সংবাদ এবং ভিডিও ফুটেজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসে পৌঁছে দিতে পারে। ফলে আমরা ঘরে বসে কোনো ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই জানতে পারি এবং প্রাসঙ্গিক ভিডিও ফুটেজ দেখতে পারি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আজ আমরা সহজেই ইন্টারনেট, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট ইত্যাদির মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে থাকি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ, তথ্য এবং গবেষণা, ফলাফল পেয়ে থাকি এবং নিজের ইচ্ছা, চিন্তাধারা, কোনো গবেষণার ফলাফল আপলোড করতে পারি। তাছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদ সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে প্রচার করছে। ফলে সাধারণ জনগণের নিকট সংবাদের গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো খবর সম্পর্কে সন্দেহ হলে ইন্টারনেট বা টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা কোয়েরি করে নিশ্চিত হতে পারি।

১.১.১০ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ
Entertainment and Social Communication

বর্তমান যুগে বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। ছোট-বড় সকলেই কম্পিউটারে গেম খেলতে এবং অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করতে পছন্দ করে। তাছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন গেম খেলতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকের সাথে গল্পের আসর করা যায়। তাছাড়া পৃথিবীর বিখ্যাত সিনেমা, গল্প, উপন্যাস ডকুমেন্টারি ইত্যাদি অনলাইনে দেয়া থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় তা উপভোগ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া টুলস ব্যবহার করে শব্দ ছবি এনিমেশন ইত্যাদি ব্যবহার করে স্বপ্নের ভুবন তৈরি করা যায়। যেমন: সৌরজগৎ, সাগরের তলদেশ ইত্যাদি। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র: বিনোদনে আইসিটি।

নিচে কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ওয়েব সাইটের বর্ণনা দেয়া হলো-

ফেসবুক (Facebook):

বিশ্ব-সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েব সাইট, যা ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনো রকম খরচ ছাড়া এতে সদস্য হওয়া যায়। মার্ক জোকার বার্গ (Mark Zuckerberg) ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ, এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি হালনাগাদ করতে এবং তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। ওয়েব সাইটটির সদস্য প্রাথমিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এটা সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুল এবং ১৩ বছরের সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন কার্যকরী সদস্য রয়েছে এই ওয়েব সাইটটির। ফেসবুককে তার চলার পথে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সিরিয়া, চীন, এবং ইরানসহ বেশ কয়েকটি দেশে এটি আংশিক কার্যকর আছে। এটার ব্যবহার সময়ের অপচয় ব্যাখ্যা দিয়ে কর্মচারীদের নিরুৎসাহিত করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চিত্র: মার্ক জোকার বার্গ।

টুইটার (Twitter):

সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা ও মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েব সাইট। এখানে ব্যবহারকারিরা সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের বার্তা আদান-প্রদান ও প্রকাশ করতে পারেন। এই বার্তাকে টুইট বলা হয়। টুইটার সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইটটি পড়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারেন। টুইট লিখার জন্য সদস্যরা সরাসরি টুইটার ওয়েব সাইট ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়াও মোবাইল ফোন বা এসএমএস এর মাধ্যমেও টুইট লেখার সুযোগ রয়েছে। টুইটারের প্রধান কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো শহরে। তাছাড়া টেক্সাসের সান এন্টেনিও এবং ম্যাসাচুসের বুস্টনে টুইটার সার্ভার ও শাখা কার্যালয় আছে। ২০০৬ সালে টুইটার যাত্রা শুরু করে চার বছরের মাথায় এর সদস্য হয় প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন- যা এর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

এমিম: এটি একটি সামাজিক মিডিয়া ইন্টারনেট সার্ভিস। যেখানে ব্যবহারকারিরা মন্তব্য করে এবং মাল্টিমিডিয়া লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও) ভাগাভাগি করে একে অপরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ডাল্টন কল্ডওয়েল, নেপস্টারের অনেক প্রকৌশলীবিদদের দল ২০০৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাইস্পেস একে কিনে নিয়েছে এবং বর্তমানে এর সার্ভিস বন্ধ রয়েছে। মাইস্পেস এর প্রধান শাখা বেভারলি হিলোস, ক্যালিফোর্নিয়াতে।

১.১.১১ সাংস্কৃতিক বিনিময় (Cultural Exchange)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার ধরন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন। বিভিন্ন দেশে অনেক ধরনের উৎসব, পার্বণ উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বে একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব পালন করত। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রবাহের ফলে এক অঞ্চলের বিভিন্ন উৎসব সম্পর্কে অন্য অঞ্চলের লোকজন জানতে পারে। স্যাটেলাইট বা ডিস ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠান দেখতে পারি। আবার আমাদের অনুষ্ঠানও অন্যান্য দেশের লোকজন দেখতে পারে। অন্যান্য দেশের নাটক, সিনেমা, গান ইত্যাদি দেখে আমরা ঐ দেশের কৃষি, কালচার, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। এভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংস্কৃতির বিনিময় হয়।

১.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো কম্পিউটার এবং বিভিন্ন প্রকার সেন্সর এর সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিবেশ যার অস্তিত্ব থাকতে পারে আবার সম্পূর্ণ কাল্পনিক হতে পারে । যেমন- সৌরজগতের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটার, স্পিকার, বিভিন্ন ছবি বা চিত্র বিশেষ পদ্ধতিতে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা হয় যা প্রদর্শনের পর দর্শকের মনে হবে যেন সে সৌর জগৎ প্রদক্ষিণ করেছেন। এখানে অভিজ্ঞতা এবং কল্পনা শক্তি কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বপ্নের ভুবন তৈরি করা হয়।

১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব
Influence of Vertual in daily life

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো–

শিক্ষাক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

শিক্ষাক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা যায়। এর সুবিধা হলো এখানে ত্রিমাত্রিক পরিবেশে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট বড় গ্রুপ তৈরি করা যায়। জোতির্বিদ্যার ছাত্রদের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে অতি সহজে শিখানো যায় সৌরমণ্ডল সম্পর্কে, কীভাবে গ্রহ চলমান থাকে। একটি ধুমকেতুর অগ্রগতি ট্র্যাক ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক পরিবেশে সহজে বুঝানো সম্ভব। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিশেষভাবে অর্থাৎ চিহ্ন, রং এ অঙ্গ-বিন্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করে শিখতে পছন্দ করে। ঔষধের ছবি দেখে শেখা, মেডিক্যালে অস্ত্রপাচার অনুশীলন এবং ত্রিমাত্রিক ছবি দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে শিখতে পারবে।

সামরিক বাহিনীতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

সামরিক বাহিনীতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনটি (সেনা, নৌ, বিমান) বাহিনীতেই এটি প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বিশেষ করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, অন্যান্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং এ সময় তাদের সঠিক করণীয় প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সামরিক বাহিনীতে যে সকল ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়-

- ফ্লাইট অনুশীলনে
- যুদ্ধক্ষেত্রের অনুশীলনে
- ঔষধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণে (যুদ্ধক্ষেত্রে)
- যানবাহন অনুশীলনে
- ভার্চুয়াল বুট ক্যাম্প।

স্বাস্থ্যসেবায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

স্বাস্থসেবায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে অস্ত্রোপচারে এবং আতঙ্কগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা, রোবটিক্স সার্জারি এবং চিকিৎসা প্রশিক্ষণে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সুবিধা হলো এটা ডাক্তারদের নিরাপদ পরিবেশে নতুন কিছু শিখতে বা অনুশীলন করতে সাহায্য করে। এবং এতে রোগীদের কোনো বিপদ ঘটছে না।

হিউম্যান সিমুলেশন সফটওয়্যার (Human Simulation Software)- এখানে ডাক্তার, নার্স এবং অন্যরা ইন্টারেক্টিভ পরিবেশে কাজ করতে পারে। প্রশিক্ষণের দৃশ্য থাকে, যেখানে তারা ত্রিমাত্রিক পরিবেশে রোগীর সাথে পারস্পরিক মতবিনিময় করতে পারে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি রোগ নির্ণয়কারী যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। MRI স্ক্যান করার সময় ডাক্তারগণ অন্যান্য পদ্ধতির সাথে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে। এটি অনেক সময় অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা বাদ দেয়।

ভার্চুয়াল রোবটিক্স সার্জারি:

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এর একটি জনপ্রিয় ব্যবহার হলো রোবটিক্স সার্জারি, যেখানে ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত রোবটিক্স ডিভাইস কম সময়ে এবং কম জটিলতা ও কম ঝুঁকিসহ অপারেশন করে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হয় এবং দূরবর্তী টেলি সার্জারি অর্থাৎ যেখানে ডাক্তার ও রোগী দুটি আলাদা স্থানে থাকে। এ পদ্ধতির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো- ডাক্তারের যখন কোনো হিসাব করার প্রয়োজন হয় রোবট তখন সেকেন্ডের মধ্যেই হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাছাড়াও স্বাস্থ্যসেবায় দন্তচিকিৎসা, ঔষধ, নার্সিং, সার্জারি, অটিজম, প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়।

বিনোদনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality in Entertainment):

বিনোদনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জনপ্রিয় এলাকাগুলো হচ্ছে–

- ভার্চুয়াল জাদুঘর, যেমন–মিথস্ক্রিয় প্রদর্শনী
- গ্যালারি
- থিয়েটার, যেমন–মিথস্ক্রিয় ক্রিয়াকাণ্ড
- ভার্চুয়েল থিম পার্ক
- আবিষ্কার কেন্দ্র।

দর্শক সংশ্লিষ্টতা-

যেসব পরিবেশে সাধারণের প্রদর্শনী আগে অজানা বা নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে উচ্চ ক্ষমতার লেন্সসহ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গ্লাস (চশমা) এর সাহায্যে ত্রিমাত্রিক বস্তু বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একটি ঐতিহাসিক বিল্ডিং (স্থাপনা) জনসাধারণ বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে পারেন। এর ফলে তারা ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ের মানুষের জীবন যাপন উপলব্ধি করতে পারে। তারা একটি ট্র্যাকিং সিস্টেম (চশমা), যা তাদের চলাচল (Movement) ট্র্যাক করে কম্পিউটারে পাঠায়। কম্পিউটার দর্শকের উপলব্ধি পরিবর্তনের সাথে সাথে ইমেজ/ ছবি পরিবর্তন করে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গেইমিং বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং হেরিটেজ:

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি যাদুঘর এবং ঐতিহাসিক সেটিং এ ব্যবহৃত হয়। এই সেটিং (মিথস্ক্রিয়া প্রয়োগ করে) এ জনগণ নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উপায়ে তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমে ইন্টারেক্টিভ হয়। শিশুদের জন্য মনোযোগের সাথে যাদুঘর প্রদর্শনী বিরক্তিকর। তাই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এর মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতিতে শিশুদের এ বিরক্তি দূর করা যায় এবং দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

কিছু ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেরিটেজ সাইট হলো-

- স্মৃতিসৌধ (Monuments)
- স্টোন হেঞ্জ (Stonehenge)
- ভাস্কর্য (Sculptures)
- গুহা (Caves)
- ঐতিহাসিক ভবন (Historical Building)
- প্রত্নতাত্ত্বিক ফরম (Archaeological dig)
- প্রাচীন শহর ও গ্রাম (Old towns and village)

স্মৃতিসৌধ (Monuments)

স্টোন হেঞ্জ (Stonehenge)

ভাস্কর্য (Sculptures)

গুহা (Caves)

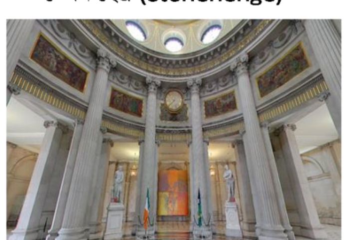
ঐতিহাসিক ভবন (Historical Building)

প্রত্নতাত্ত্বিক ফরম (Archaeological dig)

ব্যবসায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

বিভিন্ন উপায়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন–

- একটি ভার্চুয়াল পরিবেশে ব্যবসায়িক ভ্রমণ
- নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- একটি পণ্যের A360 দেখা

কিছু ব্যবসায় সম্পূর্ণ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। ala CAVE System তাদের মধ্যে অগ্রগামী। তারা তাদের প্রোডাক্টগুলোকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই চালিয়ে পরীক্ষা করতে পারে। তাও আবার অতিরিক্ত খরচ ছাড়া এবং ঝুঁকিমুক্তভাবে। যে সকল কোম্পানি বিপদজনক এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন করে, তারা দ্রব্য ব্যবহার/ বাজারজাত করার পূর্বে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করার দরকার হয়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে এ কাজটি করা যায়, এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের কোনো ঝুঁকি থাকে না। কোনো কোনো কোম্পানি ডেটা বিশ্লেষণের কাজেও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করছে।

প্রকৌশল বিভাগে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রকৌশল বিভাগে ত্রিমাত্রিক মডেলিং টুলস এবং পরিকল্পনার নকশা দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রকৌশলীরা তাদের ত্রিমাত্রিক প্রকল্প দেখতে পারে এবং কীভাবে প্রকল্পটি কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এটি কোনো প্রকল্প নিরাপদ পরিবেশে দেখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে সময় এবং খরচ উভয় বাঁচে। কোনো ডিজাইন চক্রের শুরুতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে কোনো ডিজাইনে ত্রুটি থাকলে সংশোধন করা যায়। রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে অল্প খরচে সহজে ডিজাইন পরিবর্তন এবং ফলাফল দেখা যায়।

খেলাধুলায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

গলফ, অ্যাথলেটিক্স (শরীর চর্চা), স্ক্রিটিং, সাইক্লিং ইত্যাদি খেলায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ট্রেনিং কিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শরীরচর্চায় দক্ষতা পরিমাপ, কৌশল বিশ্লেষণের কাজে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে খেলোয়াড়দের পোশাক, যন্ত্রপাতি এবং কৌশল নির্ধারণ করা যায়। খেলোয়াড়দের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। খেলোয়াড়রা কোনো নির্দিষ্ট এরিয়াতে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কাজে লাগায়। যেমন- একজন গলফার সুইং উন্নত করতে চাচ্ছে অথবা ট্র্যাক সাইকেল আরোহী তার সাধ্যের মধ্যে দ্রুত যেতে সমস্যাগুলো খুঁজছে। তখন ত্রিমাত্রিক পদ্ধতি ক্রীড়াবিদদের তার করণীয় পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দিবে (বায়োম্যাট্রিক বা কৌশলগত)। ড্রাইভিং সরঞ্জামের নকশা এবং নতুন কিছুর নকশা তৈরিতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। খেলোয়াড়দের জামা-কাপড়, জুতা ও তাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামের নকশা করতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়, যা তাদের আরো গতিশীল করে।

খেলাধুলায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার

মিডিয়ায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি:

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের প্রোগ্রামে নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে নির্মিত ইংরেজি চলচ্চিত্র হলো–

- The Lawnmower Man
- The Matrix
- Torn (1982 version)
- The Thirteenth Floor
- eXistenZ
- Vanilla Sky.

তাছাড়াও সংগীত, বই তৈরি, বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী, টেলিকমিউনিকেশন, নির্মাণ, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ইত্যাদিতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়।

কাজঃ ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে বিপদজ্জনক দ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমে- ব্যাখ্যা কর।

১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা (Contemporary tends of ICT)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমানে শুধু জটিল এবং কঠিন কাজগুলো সমাধান করেই বসে নেই। আইসিটি ব্যবহার করে বর্তমানে আমাদের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তির বহুবিদ ব্যবহার শুরু হয়েছে। যা মানুষের কল্পনা বা ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সেই সকল ইচ্ছা বা কল্পনাগুলো বাস্তবে রূপ নেয়। সূচনা হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তির এবং পরিবর্তিত হয়েছে ব্যবহারের ধারণা/ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, রোবটিকস বায়োমেট্রিক্স, বায়ো-ইনফরমেট্রিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো টেকনোলজি ইত্যাদি নতুন নতুন প্রযুক্তি এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

১.৩.১ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (Artificial Intelligence)

আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (Artificial Intelligence) বিভিন্নভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে-

আবহাওয়া গবেষণা (Taming the weather):

আবহাওয়ার পূর্বাভাস এর জন্য প্রচুর পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করতে হয়। অভিজ্ঞ আবহাওয়াবিদগণও সবসময় সূক্ষ্মভাবে তা বিশ্লেষণ করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এমন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়্যার তৈরি করতে পারে যা সকল ডেটা নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ, মানুষের মিস করা spot patterns আমলে নিয়ে অতি অল্পসময়ে নির্ভুল ফলাফল দিবে। সফটওয়্যারটি যখন একটি বড় ঝড় দেখবে তখন সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনগণ এবং গণমাধ্যমকে সতর্ক সংকেত পাঠাবে যা জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। [source: Association for the Advancement of Artificial Intelligence].

বিপদজনক/ বিরক্তিকর কাজ (Tackling dangerous or boring task):

আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলোর মধ্যে অনেক কাজই বিরক্তিকর অথবা বিপদজনক। যেমন- ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা, সিঁড়ি, আসবাবপত্র এমন কি পোষা বিড়াল পরিষ্কার করার জন্য আমরা রোবটিক্স ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করে থাকি, আসলে এটাও আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (Artificial Intelligence) এর ব্যবহার। তাছাড়া খনির ভিতর কাজ করা বা আগুনের অতি নিকটে কাজ করার মতো স্মার্ট রোবট ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবী সংরক্ষণে (Saving the Planet):

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে শিঘ্রই বিজ্ঞানীরা রোবট ও অন্যান্য ডিভাইস ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী পদার্থগুলো পরিষ্কার করবে। উন্নত সফটওয়্যার দ্বারা মেশিনগুলো বুঝতে পারবে বা পার্থক্য করতে পারবে জৈবিক প্রাণী এবং বিপদজনক বর্জ্য বা তেল। এগুলো ক্ষতিকর বর্জ্য গ্রাস করবে এবং জৈব বর্জ্য অক্ষত ছেড়ে দিবে।

চালকবিহীন পরিবহন (Driverless transport):

গাড়ি আগাম বার্তা দিবে দুর্ঘটনা থেকে অথবা নিজেই চলতে শুরু করবে এমনটি কি চিন্তা করা যায়? হ্যাঁ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব শিঘ্রই এটি সম্ভব করতে পারে ক্যামেরা, সেন্সর এবং বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে চালকবিহীন ট্রেন মানুষের সাহায্য ছাড়া জাপানের এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াত করছে।

মহাকাশের সীমা অতিক্রম:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের ফলে বিংশ শতকের মহাকাশ সীমা পেরিয়ে অনেকদূর যেতে পারবে এবং সৌরজগতের সীমানা পিছনে ফেলে বিচরণ করা সম্ভব হবে। নাসা এরই মধ্যে মানুষ্যবিহীন উপগ্রহ দূরবর্তী ছায়াপথে প্রেরণের উদ্যোগ নিয়েছে। যেখানে মানুষ পৌঁছতে অনেক সময় লাগত। চালকবিহীন রোভার্স মঙ্গল গ্রহ এবং অন্যান্য গ্রহ থেকে ছবি উঠিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়েছে যেখানে মানুষের বিচরণ অসম্ভব।

অর্থনীতি রক্ষা করে:

২০১০ সালের হিসাবে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শেয়ার বাজার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রোগ্রাম spot patterns অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এর উপর ভিত্তি করে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এই প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও লাভবান করতে সাহায্য করে।

নিরাপদ বাসস্থান:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি শীঘ্রই আন্তর্জাতিক হুমকি থেকে আমাদের রক্ষা করবে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট দুটি ভার্চুয়াল এজেন্ট ব্যবহার করে দুজন কর্মীর পরিবর্তে। সংস্থাটি সিস্টেম পর্যবেক্ষণ, ফোন কল ও অন্যান্য যোগাযোগ স্ক্যান করা ইত্যাদি কাজে এই কর্মীদের ব্যবহার করে। এ প্রোগ্রামটি খুব অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ ডেটা পরীক্ষা করতে পারে এবং সাধারণ কথাবার্তা এবং সম্ভাব্য হুমকির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

দৈনন্দিন সাহায্য:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ রোবট শুধু ঘরবাড়ি পরিষ্কার করবে না ঘরের আসবাব পত্র সাজানো (Assembling) অথবা শিশু বা পোষা বিড়ালের যত্ন নেয়ার কাজও করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ মেশিনগুলো কোনো জিনিস/বস্তু চিনতে এবং সাজাতে সক্ষম হবে। যখন কাজ করবে অপেক্ষাকৃত কম ভুল করবে। রোবটিক্স শুধু পরিবারের কাজ করবে না এটি বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদেরও সাহায্য করবে। ভয়েজ রিকগনাইজেশন সফটওয়্যারের ব্যবহার করে অন্ধদের সাহায্য করা যেতে পারে। Cedar- Sinai medical সেন্টারে হার্টের পরীক্ষা এবং হার্ট অ্যাটাক সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা বন্ধ করতে বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। সর্বশেষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ ডিভাইস জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং ভেজাল ঔষধ নির্ণয় করতে পারে।

১.৩.২ রোবটিক্‌স (Robotics)

রোবট হচ্ছে এক ধরনের মেশিন যা কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটি মানুষের মতো কাজ করতে পারে অথবা এর কাজের ধরন দেখে মনে হয়, এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আছে। রোবট যে শুধু মানুষের আকৃতির হবে তা নয়। একে তার কাজের উপযোগী করে আকার এবং আকৃতি দেয়া হয়। রোবট অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং ক্লান্তিহীনভাবে পূর্বলিখিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। প্রথমে নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী যান্ত্রিক অংশ তৈরি করা হয়, পরে রোবটের যান্ত্রিক সংগঠনের সাথে একটি কম্পিউটার চিপ সংযুক্ত করা হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাথে এর পার্থক্য হলো-রোবট একই কাজ বার বার না করে তাকে যেমনটি শেখানো হয় তেমন বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। কিছু কিছু রোবট শুধু প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করে আবার অনেকগুলোকে দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা জটিল এবং বিপদজনক কাজগুলো রোবটের সাহায্যে করা যায়। এর সাহায্যে বিরামহীনভাবে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারে। কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানারকম বিপদজনক কাজ; যেমন–ওয়েল্ডিং, ঢালাই, ভারি মালামাল ওঠানো-নামানো যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদি কাজ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো সার্কিটের কাজ সূচারুরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে রোবটের সাহায্যে যা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বা সাগরের তলদেশের বিভিন্ন গবেষণার কাজের জন্য রোবট ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রানজিশন রিসার্চ কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী জোসেফ এফ এনজেলবার্গার হচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট এর জনক। তার রোবটটি ছিল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রোবট। এটি কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়াই বড় বড় সুপার মার্কেট, এয়ারপোর্ট বা ফ্যাক্টরি পরিষ্কারের কাজ করতে পারে।

চিত্র: রোবট

রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো–

- মহাকাশ গবেষণায়
- স্বয়ংক্রিয় বিমান ও গাড়ি চালনায়
- বাড়ি ঘরের দৈনন্দিন কাজে
- শিল্প কারখানায়
- খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম পরিবেশে
- ওয়েল্ডিং- এর কাজে
- মাটির নিচে বিভিন্ন খনিতে কাজ করতে

চিত্র: স্বাস্থ্য সেবায় রোবট

কাজ: বাংলাদেশের বড় বড় শহরে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভুমিকম্প পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগানো যেতে পারে? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

১.৩.৩ ক্রায়ো সার্জারি (Cryosurgery)

ক্যান্সার বর্তমান বিশ্বের একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। এমন কি সকল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরও এর সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিকার নেই। ক্যান্সারের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে এগুলোর সব কটিরই আবার বিধ্বংসী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অপারেশন করে অপসারণ, কেমোথেরাপি, বিকিরণ চিকিৎসা (Radiation treatement), হাইপারথারমিয়া (Hyperthermia), ক্যান্সার চিকিৎসায় আরো একটি পদ্ধতি রয়েছে যার নাম হলো ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery).

চিত্র: ক্যান্সার আক্রান্ড় কোষ

পদ্ধতি:

ক্রায়োসার্জারিতে তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় আক্রান্ত টিস্যুতে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয় যাতে কোষগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এটি একটি সাধারণ এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতি সহজ, কার্যকর এবং কম খরচ। ক্রায়োসার্জারির জন্য রোগীর তেমন কোনো পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না, তবে ব্যথার প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ৩০–৯০ মিনিট পূর্বে ব্যথানাশক (Numbing Cream) ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে ঝুঁকি কম এবং সময় অনেক কম লাগে। তরল নাইট্রোজেন কটন, স্প্রে বা মেটাল প্রোব ব্যবহার করে আক্রান্ত টিস্যুতে ৩০ সেকেন্ডের জন্য প্রয়োগ করা হয়। অধিকতর আক্রান্তের ক্ষেত্রে ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োগকৃত স্থানে বরফের কারণে সাদা হয়ে যায়, কারণ তরল নাইট্রোজেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই তারা সামান্য অস্থায়ী ব্যথা এবং কম্পন অনুভব করে।

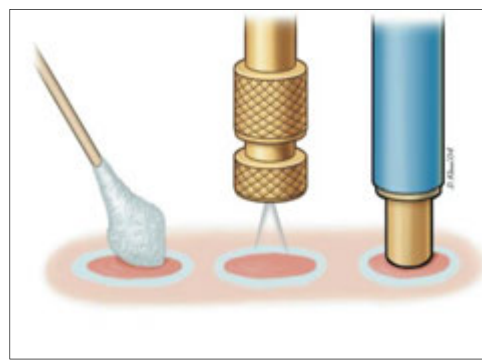

সাধারণত নিম্নলিখিত ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ক্রায়োসার্জারি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে–

- skin tumors.
- pre-cancerous skin moles.
- nodules.
- skin tags.
- unsightly freckles.
- retinoblastomas, a childhood cancer of the retina.
- prostate, liver, and cervical cancers, especially if surgical resection is not possible.

ক্রায়োসার্জারিতে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়–

- আলট্রা সাউন্ড (ultrasound)
- কম্পিউটেড টমোগ্রাফি বা ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজ
- (computed tomography (CT) or magnetic resonance (MR) imaging)
- কটন বাট / স্প্রে ডিভাইস (a cotton swab or spray device)
- ক্রায়োপ্রোব (cryoprobe)
- ব্রঙ্কোস্কোপ (bronchoscope)

১.৩.৪ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration)

একুশ শতকে মহাকাশ অভিযান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। চাঁদে অবতরণ, মহাকাশে স্টেশন স্থাপন, অন্যান্য গ্রহে অভিযান এবং পৃথিবীর উপর লেখাপড়া করার জন্য ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, ডেটা স্থানান্তর, সংরক্ষণ এবং বণ্টন ইত্যাদিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। মহাকাশ অভিযানে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো অভিযানে অংশগ্রহণকারি সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কাজ করা। কোনো কারণে কোনো একটি অংশ বিকল হলে বা কাজ না করলে সম্পন্ন অভিযান বাতিল হয়ে যায়। এতে প্রচুর সময় এবং অর্থের অপচয় হয়। বর্তমানে মহাকাশ কেন্দ্রে পাঁচটি সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি কম্পিউটার বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সহজ এবং জটিল কাজগুলো সম্পন্ন করে। জটিল কাজ করার জন্য চারটি কম্পিউটার প্রয়োজন হয় এবং পঞ্চমটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সমস্যা সমাধানের জন্য রাখা হয় অতিরিক্ত হিসেবে।

চিত্র: মহাকাশ অভিযানে আইসিটির ব্যবহার।

নাসা (NASA) সেন্সর ওয়েব সিস্টেমের কথা চিন্তা করছে। এর ফলে বিশাল আকারের স্যাটেলাইটের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের স্যাটেলাইট তৈরি। প্রেরণ করা হবে নির্দিষ্ট টার্গেট করে। এরা প্রয়োজনে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে এবং পরিবর্তিত নির্দিষ্ট এরিয়া কভার করতে পারবে। স্যাটেলাইটের কম্পিউটারগুলোকে সুপার কম্পিউটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে। ছোট ছোট স্যাটেলাইটগুলোকে পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। স্যাটেলাইটের কোনো একটি অংশ বিকল হলে বা কার্যক্ষমতা কমে গেলে সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট ধ্বংস না করে ঐ নির্দিষ্ট অংশ পরিবর্তন করা বা আপডেট করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে মহাকাশ অভিযান ব্যয় অনেক কমবে। মহাকাশ অভিযান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে হাতে হাত রেখে সকল সমস্যা সমাধান করে পৃথিবী জুড়ে উন্নয়ন বয়ে আনবে।

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

১.৩.৫ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT in Productions)

উৎপাদন হচ্ছে আমাদের সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে। বর্তমান যুগ ইনফরমেশন ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। উৎপাদন ব্যবস্থায়ও এর ভূমিকা অপরিসীম। কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (CAD) এর ব্যবহার আজকাল খুব সাধারণ বিষয়। এর মাধ্যমে অতি সহজে নতুন নতুন পণ্যের ডিজাইন করা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন জটিল পণ্যের ডিজাইনও কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সংবাদপত্র ছাপানোর ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অমূল পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে একটি বই প্রিন্ট করতে অনেক সময় লাগত এর সাধারণ ডিজাইনের বাইরে যাওয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে খুব সহজে ছাপার কাজ করা যায়। একযোগে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা যায়। পণ্যের ডিজাইন, গ্রাফিক্স, চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিম্নলিখিত উপায়ে উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে:

১. Templates-এ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ডায়াগ্রাম কার্ডের উপর প্রিন্ট কর।

২. ছাপানো লেখা/টেক্স শিটে আঁটানো এবং সেই অনুযায়ী কাটা।

৩. বিভিন্ন ধরনের জটিল ফর্ম (shap) খুব সহজে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মেশিনের সাহায্যে কাটা যায়। যা হাতের সাহায্যে/ ম্যানুয়াল বেশ জটিল। বিশেষ করে বিভিন্ন ধাতব শিট এর উপর।

৪. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত লেদমেশিনের সাহায্যে সহজে বিভিন্ন আকৃতির টুকরা করা সম্ভব। বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা এবং ঔষধ শিল্পে পণ্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ করা কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্ভব। পোশাক শিল্পে কাপড় বিভিন্ন আকারে টুকরা করার জন্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মেশিন ব্যবহার করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের ফলে এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষক এখন জানতে পারে, কোন মাটিতে কোনো ধরনের ফসল/ জাত ভালো জন্মাবে এবং কখন কোন রোগের কোন ঔষধ/ কীটনাশক প্রয়োগ করতে পারবে।

   তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ফসলের জীনগত পরিবর্তন সাধন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এবং প্রতিকুল পরিবেশের উপযোগী করা যায়। অনেক শিল্প কারখানা রয়েছে যেখানে মানুষের পক্ষে কাজ করা বিপদজনক। সেসব ক্ষেত্রে যেমন- মাটির অনেক নিচের খনিতে, অধিক তাপমাত্রা বিদ্যমান। এমন কাজে আইসিটির অনন্য উপহার রোবট ব্যবহার করা যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়তা এনেছে।

স্বয়ংক্রিয় মেশিন ব্যবহারের সুবিধা হলো এটি সম্পূর্ণ জীবনের উৎপাদন পরিকল্পনায় (Life time of the production plant) উৎপাদন খরচ কমায় এবং নিম্নলিখিত সুবিধা দেয়–

- উচ্চতর গুণসম্পন্ন (Higher quality)
- অধিকতার সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণ (More Consistent quality)
- সারাদিন কর্মক্ষম থাকে
- অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন (Very fast)
- অধিকতর নির্ভরযোগ্য
- অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করে।

কাজ: চিকিৎসা ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত ৫টি আইসিটি সমৃদ্ধ যন্ত্রের নাম লেখ।

১.৩.৫ Defense (প্রতিরক্ষা)

প্রতিরক্ষা শিল্প হলো যে কোনো রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট। এটি অস্ত্র এবং যুদ্ধের বিশেষ যন্ত্রপাতি উৎপাদন/ তৈরি করে। অনেক দেশের প্রতিরক্ষা শিল্প খুব উন্নত। তারা বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম অন্য দেশে রপ্তানি করে। প্রতিরক্ষা শিল্পের আউটপুটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– আইসিটির মতোই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার।

প্রতিরক্ষা শিল্প থেকে যে সকল হার্ডওয়ার আউটপুট পাওয়া যায় তাহলো–

- বিভিন্ন ধরনের জাহাজ পেট্রোল শিপ, corvette, frigale, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় এমন জাহাজ, হেলিকপ্টার বহনকারী জাহাজ।
- আকাশ যান– ইউটিলিটি ও আক্রমণ হেলিকপ্টার, জঙ্গী, আটককারী, বোমারু বিমান ইত্যাদি।
- ভূমিভিত্তিক যান– ভারি যুক্ত ট্যাংক, পদাতিক যুদ্ধ বাহন, টেকনিক্যাল যান ইত্যাদি।
- সরবরাহ যন্ত্রপাতি– all terrain vehicle (ATV)
- অস্ত্র: ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের রাইফেল, কামান পিছ, মিসাইল, বোমা ইত্যাদি।

প্রতিরক্ষা শিল্পের সফ্টওয়ার আউটপুটগুলো হলো–

- ভূমি, সমুদ্র এবং আকাশে ব্যবহারযোগ্য রাডার
- অপট্রোনিক, অপটিক্যাল ইলেকট্রেনিক সিস্টেম
- সেকশন, প্লাটুন, কোম্পানি, রেজিমেন্ট, বিগ্রেড, বিভাগ এবং কর্পস পর্যায়ে যোগযোগের জন্য টেলিযোগাযোগ সিস্টেম।
- যুদ্ধক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

ইলেট্রনিক Countermeasures যন্ত্র:

প্রতিরক্ষা শিল্প অন্যান্য অনেক শিল্পের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। আইসিটি এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দুটির মধ্যে সরাসরি বা ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। আইসিটি প্রতিরক্ষা শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা শিল্পকে স্মার্ট বোমা তৈরি করতে শিখিয়েছে আগে যেখানে Dumb বোমা তৈরি/ব্যবহার করা হতো। আগে যুদ্ধ ছিল মানুষকেন্দ্রিক এখন তা হয় নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা। আগে যেখানে যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করা হতো সেখানে এখন বাস্তব সময়ে (Real time) যুদ্ধ পর্যালোচনা করা হয়। আগে যেখানে ভূমি এবং সমুদ্র থেকে আক্রমণ করা হতো। এখন সেখানে আকাশ এবং মহাকাশ কেন্দ্রিক, হার্ডওয়্যার বেজড যুদ্ধের পরিবর্তে সফটওয়্যার বেজড যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

প্রতিরক্ষা শিল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ার পূর্ব এবং পরের অবস্থা নিচে বর্ণনা করা হলো–

(i) আগে প্রতিরক্ষা শিল্প প্রচুর পরিমাণে dumb বোমা প্রস্তুত করত। এ বোমাগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হতো যেমন– হাইড্রো-ইলেকট্রিক বাঁধ, ব্রিজ, বিমান বন্দর, রেল এবং গুরুত্বপূর্ণ অফিস। যেমন- সরকারি প্রশাসনিক ভবন, শিল্প কমপ্লেক্সে কখনো সামরিক ব্যক্তিদের উপর ব্যবহার করা হয় ভয় দেখানোর জন্য। এ বোমাগুলোকে ædumb" বলা হতো কারণ এদের পছন্দ বা টার্গেট নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা নেই। এরা নিজের পছন্দ মতো কাজ করতে পারে না। তারা অধিক গুরুত্ব এবং কম গুরুত্বের স্থাপনা চিহ্নিত করতে পারে না।

নিশানা (target) মিস করা বা অপ্রয়োজনে বিস্ফোরিত হওয়া ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ১ম এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ ধরনের বোমার প্রচুর ব্যবহার ছিল।

তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা শিল্পকে অমূল পরিবর্তিত করেছে। আইসিটির সাহায্যে প্রতিরক্ষা শিল্প বর্তমানে æsmart” অস্ত্র তৈরি করছে। স্মার্ট অস্ত্র অধিকতর শক্তিশালী এবং নির্ভুল নিশানায় আক্রমণ করতে সক্ষম। সামরিক বাহিনী এসব অস্ত্রের সাথে কথা বলতে বা নির্দেশ দিতে পারে। তিনি (কমান্ডার) অস্ত্রকে নির্দিষ্ট বস্তু দেখে ধ্বংস করার নির্দেশ দিতে পারে চার পাশের এলাকার কোনো রকম ধ্বংস সাধন না করে।

(ii) পূর্বে অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরি হতো শুধুমাত্র বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য। শত্রুপক্ষের ক্ষতি সাধন করার জন্য এই অস্ত্রগুলোকে একসাথে ব্যবহার করা হতো। প্রচুর সৈন্য এবং সামরিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ ব্যবস্থাপনাকে মানবকেন্দ্রিক যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা বলে।

তখন কোনো বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার উপর ঐ বাহিনীর শক্তি পরিমাপণ করা হতো। ভালো কৌশলের চেয়ে তারা সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির কৌশল ব্যবহার করত। যুদ্ধে জয়ের জন্য জেনারেলগণের অধিক সংখ্যক সৈন্য, অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতির চাহিদা ছিল। সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আরো লোক দরকার হতো। তাছাড়া সাচিবিক কাজের জন্য আরো অনেক লোকের প্রয়োজন ছিল।

বর্তমানে নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা আইসিটির সুফল। এর ফলে একজন জেনারেল তার সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে, তাদের অবস্থান, তাদের যুদ্ধ সরঞ্জামের সরবরাহ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

এ ব্যবস্থায় সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করেছে। একজন স্কোয়াড লিডার শত্রু সৈন্য এবং মিত্র সৈন্য সনাক্ত করতে পারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়ানো-ছিটানো যুদ্ধ সরঞ্জাম সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এর ফলে একজন স্কোয়াড লিডার সঠিক সময়ে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(iii) প্রতিরক্ষায় আইসিটি যুক্ত হওয়ার পূর্বে এমন কোনো ডিভাইস বা যন্ত্র ছিল না যার দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রের সামরিক কার্যক্রম পরিমাপ করা যেত। যুদ্ধ পরবর্তী পর্যালোচনায় নিজেদের হিসাব এবং যতটুকু স্মৃতিতে থাকে তা দিয়েই যুদ্ধের দক্ষতা পরিমাপ করা হতো। এগুলো সাধারণত যুদ্ধের মডেল, মানচিত্র ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতো। এক্ষেত্রে শতভাগ গ্রহণযোগ্য তথ্য সংগ্রহ প্রশ্নবোধক ছিল। এর ফলে যুদ্ধপরবর্তী আহত (ইনজুরড) সৈন্য সংখ্যা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রবণতার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিরক্ষা শিল্পে আইসিটি যুক্ত হওয়ার পর রিয়েল টাইম যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ, নেটওয়ার্কভিত্তিক যুদ্ধের বড় অগ্রগতি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সব ঘটনা সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ খবর আদেশ/নির্দেশ সেন্টারে পৌঁছে যায়। এটা সম্ভব হয়েছে- কারণ সৈন্যরা এখন যুদ্ধাস্ত্রের সাথে অনেক আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রের সাহায্য নেয়- যার ফলে তারা সহজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শত্রুর টার্গেট এবং নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারে, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে কত সময় লাগলে তা হিসাব করতে পারে। শত্রুর স্থাপনা ধ্বংস করতে পারে। যখন কোনো বিপদজনক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন তাৎক্ষণাৎ কমান্ডারের নির্দেশ পেতে/ গ্রহণ করতে পারে।

কাজ: বর্তমান যুদ্ধে সাধারণ জনগণের মৃত্যুর হার খুব কম-এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

১.৩.৬ বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)

বায়োমেট্রিক্স হলো জৈব বৈশিষ্ট্য/ তথ্য বিশ্লেষণ এবং পরিমাপ করার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা। তথ্য প্রযুক্তিতে বায়োমেট্রিক্স বলতে ঐ কৌশল বা পদ্ধতিকে বোঝায় যা মানব দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন- ডি এন এ, আঙ্গুলের ছাপ, চোখের রেটিনা ও আইরিশ, ভয়েস প্যাটার্ন, মুখ মণ্ডলের প্যাটার্ন, হাতের মাপ ইত্যাদি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করে।

আঙ্গুলের ছাপ থেকে নিউমেরিক ডেটায় রূপান্তর হচ্ছে

চোখের রেটিনা স্ক্যান করা হচ্ছে

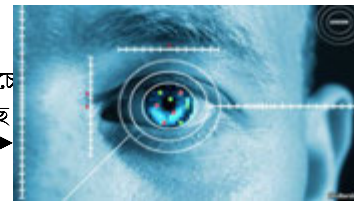

বায়োমেট্রিক্স যাচাইয়ের দ্বারা পরিচয় প্রমাণ ব্যবস্থা কর্পোরেট ও পাবলিক নিরাপত্তা, ইলেকট্রনিক্স পণ্য এবং বিক্রয় কেন্দ্রে একটি সাধারণ পদ্ধতি। নিরাপত্তা ছাড়াও বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের কিছু সুবিধা রয়েছে।

একটি বায়োমেট্রিক্স ডিভাইস যেমন- ফিঙ্গারস্ক্যানার (Finger-scanner) নিম্নলিখিত অংশের সমন্বয়ে গঠিত-

- একটি ইনপুট ডিভাইস বা স্ক্যানার (A reader or Scanner)
- একটি সফটওয়্যার যা- স্ক্যান করা তথ্যকে ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর করে এবং ম্যাচ পয়েন্ট তুলনা করে।
- একটি ডেটাবেজ, যেখানে তুলনা করা ডেটা সংরক্ষিত থাকে।

পরিচয় চুরি রোধে তথ্য গ্রহণ করার সময় সাধারণত ডেটা এনক্রিপ্ট করা হয়। এখন দেখা যাক কীভাবে বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের কাজটি সম্পন্ন হয়–

বায়োমেট্রিক ইনপুটকে রূপান্তর করতে এবং ম্যাচিং পয়েন্ট অব ডেটা সনাক্ত করার জন্য একটি ব্যবহারিক সফট্‌ওয়্যার ব্যবহার করা হয়। ডেটাবেজের মধ্যে ম্যাচ পয়েন্ট প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয় এবং তথ্যকে সংখ্যাবাচক ডেটায় রূপান্তর করা হয়। ডেটাবেজের মান সর্বশেষ বায়োমেট্রিক্স ইনপুটের সাথে তুলনা করা হয় এবং প্রমাণের জন্য নমুনা মিল বা অমিল ঘোষণা করা হয়।

১.৩.৭ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)

বায়ো-ইনফরমেটিক্স হলো জৈব তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তির একটি ব্যবহার। জৈব ও জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং একত্রিকরণের কাজ কম্পিউটারের মাধমে করা হয়, যা জিনভিত্তিক নতুন ঔষধ আবিষ্কার এবং উন্নয়নের কাজে লাগে। হিউম্যান জিনম প্রজেক্ট (Human Genome Project) এর ফলে জনসাধারণ জিন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানে, যার ফলে বায়ো-ইনফরমেটিক্স এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। হিউম্যান জিনমের উদ্দেশ্য- সকল মানব জিনে ক্রম নির্ধারণ করা যা প্রায় তিন বিলিয়ন জোড়া। বায়ো-ইনফরমেটিক্স বিজ্ঞান হলো আণুবিক জৈব বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের সমন্বিত রূপ। নতুন ঔষধ আবিষ্কারের জন্য মলিকুলার টার্গেট (Molecular targets) সুনির্দিষ্ট করা এবং মানব দেহের রোগ সম্পর্কে বোঝার জন্য জেনেটিক তথ্য ব্যবহার করা। এর স্বীকৃতির জন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি গননীয় জীববিজ্ঞানী (Computational biologists) এবং বায়োইনফরমেটিক্স কম্পিউটার বিজ্ঞানী (Bioinformatics Computer Scientists) এর সমন্বয়ে বায়োইনফরমেটিক্স গ্রুপ গঠন করছে।

আণুবিক জীববিজ্ঞানীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জেনম সিকোয়েন্সিং প্রজেক্টের ডেটাগুলোর তথ্য জানানো। কারণ, প্রথাগতভাবে গবেষণাগারে আণুবিক জীব বিজ্ঞানীরা কাজ করত সীমিত ডেটা নিয়ে, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য এ গবেষণার সাথে কম্পিউটার যুক্ত করা হয়। সিকোয়েন্স জেনারেট করা, সাব-সিকোয়েন্স সংরক্ষণ করা, ডেটা রূপান্তর এবং বিশ্লেষণ ইত্যাদি কম্পিউটার নির্ভর কাজ। তবে, একটি আণুবিক জৈব পরীক্ষা করা খুব জটিল কাজ- যখন তারা বিভিন্ন লেভেলে থাকে যেমন- genom, proteome, transcriptome এবং metabalome লেভেলে। বায়ো-ইনফরমেটিক্স সম্প্রদায়ের প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো বিশাল ডেটার ভান্ডারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা। সহজ বিচরণ (Access) এবং নির্ভরযোগ্য ডেটা প্রদানের দায়িত্ব পালন করা।

ডেটা বিশ্লেষণের পূর্বে একেবারে অর্থহীন থাকে। একজন প্রশিক্ষিত জীব বিজ্ঞানীর পক্ষেও ম্যানুয়েলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অতএব, অর্থপূর্ণ জৈবতথ্য প্রদানের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। একটি বায়ো-ইনফরমেটিক্স যন্ত্র তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া করে থাকে–

ডি এন এ ক্রম প্রোটিন ক্রম নির্ণয় করে (DNA sequence determines protein sequence)

প্রোটিন ক্রম প্রোটিন গঠন/ কাঠামো নির্ণয় করে (Protein sequence determines protein structure)

প্রোটিন গঠন/ কাঠামো প্রোটিনের কাজ নির্ণয় করে (Protein structure determines protein function) ।

১.৩.৮ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা জীবন্ত প্রাণির ডি এন এ (DNA) পরিবর্তন করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। আবার অন্যভাবে বলা যায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো কোনো প্রাণীতে ম্যানুয়েললি ডিএনএ (DNA) যোগ করার প্রক্রিয়া æGenetic Enginering is the process of manually adding new DNA to an organism”।

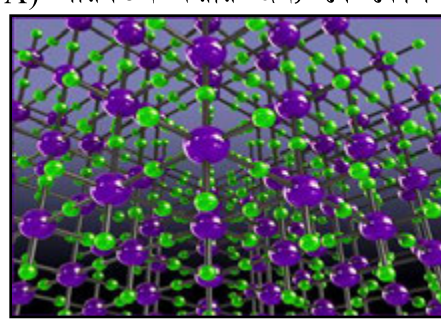

কোনো জীবের জীবন, বৃদ্ধিসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঐ জীবের DNA এর উপর নির্ভর করে। DNA এর যে অংশ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী তাকে জিন (Genes) বলে। আণবিক বিজ্ঞানীগণ অনেক এনজাইম আবিষ্কার করেছেন যা DNA এর গঠন পরিবর্তন করতে পারে। কিছু কিছু এনজাইম আছে যার সাহায্যে DNA এর কিছু অংশ (strands) বাদ দিতে অথবা যোগ করতে পারে। এ ধরনের এনজাইম ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা DNA থেকে নির্দিষ্ট জিন বাদ দিয়ে কাস্টমাইজ DNA তৈরি করতে শিখেছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো সহজ হবে- টমেটো ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না অন্যদিকে মাছ ঠাণ্ডা পানিতে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করবে কোনো জিনের জন্য মাছ ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে, সেই জিন টমেটোতে প্রতিস্থাপন করলে টমেটো ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারবে।

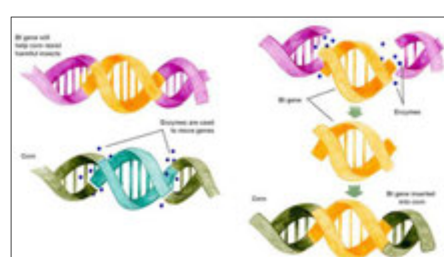

চিত্র: ডিএনএ

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপকার পেয়ে থাকি-

১। ইনসুলিন উৎপাদন হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবচেয়ে বড় সুফল। ইনসুলিন ডায়াবেটিক্স রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজন হয়।

২। Interferon হলো মানব কোষ থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রস (agent) যা ভাইরাস নাশক (Anti viral) হিসেবে কাজ করে। আজকাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে তৈরি Interferon ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩। জিন থেরাপি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি সুফল। জিন থেরাপির মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা এবং ক্রুটিপূর্ণ মানুষের জিন পরিবর্তন করে সুস্থ করে তোলা যায়।

৪। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন অনেক sophisticated ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন করা হয়। এ নতুন ঔষধ নির্দিষ্ট জিনের ক্লোনিং দ্বারা তৈরি।

৫। হিউম্যান গ্রোথ হরমোন এখন শিল্পজাত ব্যাকটেরিয়া থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে। এই হরমোন বামনত্ব (বেঁটে) রোধে ব্যবহৃত হয়। জেনেটিক্যাললি উৎপাদিত হিউম্যান গ্রোথ হরমোন পোড়া ত্বক, ফেটে যাওয়া হাঁড়, এবং খ্যাদ্য নালির আলসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৬। জেনেটিক্যাললি পরিবর্তিত (modified) ফসল উৎপাদনের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, তেল বীজ ইত্যাদি। এগুলো পোকা-মাকড় ও অন্যান্য উদ্ভিদ নাশক দ্বারা আক্রান্ত হলেও ছত্রাক ও ভাইরাস প্রতিরোধী। তাছাড়া জেনেটিক্যাললি পরিবর্তিত ফসল অধিক খরা ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে।

৭। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে জৈব কারখানায় প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও এনজাইম উৎপাদন করা যায়। এগুলো প্রচুর সংখ্যায় Tryptophan এর মতো টিকা ও সম্পূরক তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া জ্বালানি তৈরিতেও এগুলো ব্যবহৃত হয়।

৮। গর্ভবতী মহিলাদের Fetuses দেখে সন্তানের জেনেটিক ক্রুটিসমূহ নির্ণয় করা যায়। পিতা-মাতা ও ডাক্তার মিলে শিশুর জন্মের পূর্বেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

১.৩.৯ ন্যানো টেকনোলজি (Nano Technology)

ন্যানো শব্দটি গ্রিক nanos শব্দ থেকে এসেছে যার আভিধানিক অর্থ Dwarft কিন্তু এটি একটি মাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১ মিটারের ১০০০০০০০০০ (১০০ কোটি) ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ন্যানো মিটার। আর এ ন্যানোমিটার স্কেলে যে সমস্ত টেকনোলজি সম্পর্কিত সেগুলোকেই ন্যানো টেকনোলজি বলে।

বিজ্ঞানীরা ন্যানোবিজ্ঞান বা ন্যানোপ্রযুক্তি সম্পর্কে প্রথম ধারণা পান নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ Richard Feynman-এর ১৯৫৯ সালের American physical society এর একটি সম্মেলনে দেয়া æThere's Plenty of Room at the Bottom" নামের বক্তব্য থেকে। তারও এক দশক পরে Professor Norio Taniguchi ন্যানো প্রযুক্তি শব্দটি উদ্ভাবন করেন।

ন্যানো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হলো উপর থেকে নিচে (Top to Bottom) এবং অপরটি হলো নীচ থেকে উপরে (Bottom to Top)। টপডাউন পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে কেটে ছোট ছোট করে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়, এক্ষেত্রে Etching প্রক্রিয়াটি সম্পর্কিত। অন্যদিকে বটম-টপ হলো অতি ছোট ছোট আকারের জিনিসকে দিয়ে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা। আমাদের বর্তমান ইলেক্ট্রনিক্স হলো টপ-ডাউন প্রযুক্তির আর ন্যানো প্রযুক্তি হলো বটম-টপ প্রযুক্তির। ন্যানোমিটার স্কেলে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বস্তুর উপাদান

তৈরি করা হয় এই ন্যানো প্রযুক্তিতে। যেমন- আমাদের যদি বিশেষ ধরনের একটি DNA প্রয়োজন হয় তাহলে বটম-টপ প্রযুক্তিতে সেই DNA এর ছোট ছোট উপাদানগুলোকে মিশ্রণ করে সেই কাঙ্ক্ষিত DNA তৈরি করা হবে। তবে ন্যানো প্রযুক্তি শুধুমাত্র বটম-টপ প্রযুক্তিই নয় বরং টপ-বটম প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ দুটির মিশ্রণ করা হবে।

প্রতি বছরই দেখা যায়, কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু দাম আগের বছরের তুলনায় কমছে। কারণ এর সাথেও ন্যানো প্রযুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। কম্পিউটারের ভিতরের মাইক্রোপ্রসেসরে রয়েছে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্কিট। আর তাতে ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানো প্রযুক্তি। ন্যানো প্রযুক্তির ফলে মোবাইলেই কম্পিউটারের কাজ করা যায় (বর্তমানে বাজারে এ ধরনের কিছু মোবাইল আছে)। তাছাড়া এ প্রযুক্তির ফলে কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের ধারণ ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে, যা ১০/১৫ বছর আগে কল্পনাও করা যেত না।

ইন্টারনেটের পর এটিই প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় উপহার। ন্যানোর কারণে সায়েন্স ফিক্‌শনের অনেক কিছুই এখন বাস্তব। বিষয়টি এখন এতই ব্যাপক যে, এটি শুধুমাত্র আর বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে প্রায় সকল বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন ন্যানোপ্রযুক্তির গবেষণায় কাজ করছে। জাপান তার জাতীয় গবেষণা বাজেটের সিংহ ভাগ রেখেছে ন্যানো প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর। শুধু জাপান নয় ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, কোরিয়া- সবগুলো দেশই ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কাজ করছে। সকলের ন্যানোপ্রযুক্তির উপর এত আগ্রহ দেখে এটা বুঝতে বাকি থাকল না যে, সামনের যুগ হবে ন্যানোপ্রযুক্তির যুগ। কারো হৃদরোগ হয়েছে ? ন্যানো রোবট শরীরের ভিতর ঢুকে সেই সব মেরামত করবে। আমাদের হাতের ঘড়ি হয়ে যাবে কম্পিউটার, মোবাইল। সব কিছুই, আর তা সম্ভব হবে ন্যানো প্রযুক্তির বদৌলতে।

কাজঃ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় অনেক পরিচয় অজানা লোক মারা যায়। এদেরকে বেওয়ারিশ হিসাবে কবর করা হয়। পরবর্তীতে এদের আত্মীয়স্বজন সনাক্ত করার পদ্ধতি আছে কি? তোমার মতামতের পক্ষে বিশ্লেষণ কর।

১.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা (Morality in using ICT)

আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান দেখি, ফলগুলো খাওয়ার উপযুক্ত থাকে, তাই বলে বাগানে ঢুকে ইচ্ছামত ফল খাওয়া শুরু করি না। আমরা সভ্য মানুষ সে হিসেবে আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব থাকে। বরং যদি কখনো দেখা যায় কোনো পশু-পাখিতে বা অন্য কোনোভাবে বাগানের ক্ষতি হচ্ছে তখন আমরা বাগানকে আসন্ন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। কোনো বাড়ির দরজা খোলা পেলেই আমরা অপরিচিত কারো বাড়িতে ঢুকে যাই না। ইন্টারনেটে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখি, সেখানে যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তারা যে অংশটুকু সে আমাদের দেখাতে চাইছে আমরা সেই অংশটুকু দেখতে পাই। ওয়েব সাইটের নিজস্ব বা গোপন অংশটুকুতে আমাদের ঢোকার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। সেখানে যেতে পারে তাদের নির্দিষ্ট মানুষজন- যারা গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেখানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট তথ্য সাজিয়ে রাখে, সেখানে কাজ করে। বাস্তব জীবনে আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই তাহলে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটন হওয়ার চিত্র দেখতে বা খবর শুনতে পাই। যেমন ঃ সন্ত্রাসী, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং, প্রতারণা ইত্যাদি। বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। সকল আবিষ্কার/ উন্নয়ন/ পরিবর্তন মানুষের জন্য যেমন কল্যাণ বয়ে আনে তেমনি এর অপব্যবহার মানুষকে অনেক

বিপদ বা হয়রানির স্বীকার করে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বেশির ভাগই এককভাবে/ তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে লাইভ দেখার সুযোগ খুব সীমিত। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সমাজের খুব সাধারণ এবং অতি পরিচিত ঘটনা- আমরা প্রায়ই দেখি, মানুষ মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় নিজের অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেয় যা মোটেও উচিৎ নয়। এটা অনৈতিক কাজ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান মাধ্যম হলো কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট। আমাদের উচিৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখা। এখন আমরা জানবো অনৈতিক কাজগুলো কি কি–

ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ:

- ই-মেইলের মাধ্যমে হয়রানি
- কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি সাধন করা
- প্রতারণা করা
- অপবাদ দেয়া

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ:

- কম্পিউটার সিস্টেমে অবাঞ্ছিত প্রবেশ/ নিয়ন্ত্রণ
- নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত তথ্য অধিকার বা চুরি
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাইবার সন্ত্রাস করা
- পাইরেটকৃত সফটওয়্যার বিক্রয় ও বিতরণ

সমাজের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ:

- পর্নোগ্রাফি/ অশ্লীল ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বিষয় প্রদর্শনের মাধ্যমে যুব সমাজকে দূষিত করা
- গোপনীয় বা অবৈধ তথ্য পাচার
- অর্থনৈতিক অপরাধ
- অবৈধ আর্টিকেল বিক্রয়
- অনলাইন জুয়া

নিচে কিছু কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা নৈতিকতা বর্জিত অপরাধের নাম দেয়া হলো-

- স্প্যামিং (Spamming)
- হ্যাকিং (Hacking)
- সাইবার আক্রমণ (Syber Attack)
- সাইবার চুরি (Syber Theft)
- টাইম এন্ড রিসোর্স চুরি (Time and Resource Theft)
- সফ্‌টওয়্যার এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপ্রার্টি পাইরেসি (Software and intellectual Property Piracy)
- ভাইরাস এবং ওয়ার্ম (Virus and Worm) ইত্যাদি।

স্প্যামিং (Spamming)

ই-মেইল একাউন্টে প্রায়ই কিছু কিছু অচেনা ও অপ্রয়োজনীয় ই-মেইল পাওয়া যায় যা আমাদের বিরক্তি ঘটায়। এ ধরনের ই-মেইলকে সাধারণত স্প্যাম (Spam) বলে।

হ্যাকিং (Hacking)

সাধারণত অনুমতি ব্যতীত কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে কম্পিউটার ব্যবহার করা অথবা কোনো কম্পিউটারকে মোহাচ্ছন্ন করে তার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়াকে হ্যাকিং বলে। যে হ্যাকিং করে তাহাকে হ্যাকার (Haker) বলে।

সাইবার আক্রমণ (Syber Attack)

সাইবার আক্রমণ এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক আক্রমণ যাতে ক্রিমিনালরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কারও সিস্টেমে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে ফাইল, প্রোগ্রাম কিংবা হার্ডওয়্যার ধ্বংস বা ক্ষতি সাধন করে। একে সাইবার Vandalism ও বলা হয়।

সাইবার চুরি (Syber Theft)

অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্য চুরির সাথে সাথে টাকা পয়সাও চুরি করে। এখানে এরা কোনো নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে এবং ইউজার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ইনফরমেশনের ডেটাবেজের অনুকপি তৈরি করে। পরে সেই ইনফরমেশনগুলো ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে কারোর একাউন্ট থেকে তার সমস্ত টাকা নিজ একাউন্টে ট্রান্সফার করে নেয়।

সাধারণভাবে সাইবার চুরি দুই ভাবে ঘটতে পারে, যেমন-

ক. ডেটা চুরি (Data Theft)

খ. অস্তিত্ব চুরি (Identity Theft)

ডেটা চুরি (Data Theft):

কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি ব্যতীত ইনফরমেশন কপি অথবা সংগ্রহ করাকে ডেটা চুরি বলা হয়। ব্যক্তিগত ব্যবহারিক তথ্য কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু তথ্য থাকে যা অন্যের হাতে গেলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের তথ্য অন্য কেউ হস্তগত করলে তাকে ডেটা চুরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যক্তি পরিচয় চুরি (Identify Theft):

একজনের পরিচয় ব্যবহার করে অন্য কোনো ব্যক্তি কিছু ক্রয় করে তার দায়ভার ঐ ব্যক্তির উপর চাপানোকে পরিচয় চুরি বলে। কানাডা ও আমেরিকাতে এই অপরাধ সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়। কারও ব্যক্তি পরিচয় বা অস্তিত্ব (Identity) চুরি বলতে নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর User ID এবং Password চুরির কাজকে বুঝায়।

টাইম এন্ড রিসোর্স চুরি (Time and Resource Theft):

অনুমতি ছাড়া কোনো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করাকে টাইম এন্ড রিসোর্স থিপ্ট বলে।

সফ্টওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy)

সফ্টওয়্যার পাইরেসি বলতে প্রস্তুতকারীর বিনা অনুমতিতে কোনো সফ্টওয়্যার কপি করা, নিজের নামে বিতরণ করা কিংবা কোনো প্রকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে বুঝায়।

প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism)

অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়া বা প্রকাশ করাকেই প্লেজিয়ারিজম বলে। কোনো ব্যক্তির কোনো সাহিত্য, গবেষণা বা সম্পাদনা কর্ম হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করাই হলো প্লেজিয়ারিজম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরো একটি মাধ্যম হলো মোবাইল ফোন। এর মাধ্যমে যে সকল অনৈতিক কাজ হয়-

- নিজের অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যা বলা
- অপরিচিত কাউকে মিস কল দেয়া
- অপরিচিত কাউকে ফোন করে বিরক্ত করা
- কাউকে ভয়-ভীতি দেখানো বা হুমকি দেয়া

আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের অনৈতিক দিকগুলো জানলাম। সকলের এ কাজগুলো পরিহার করা উচিৎ।

১.৫ সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impacts of ICT in society)

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর ফলে চিরচেনা সামাজিক রূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাল মিলিয়ে চলছে যুগের সাথে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, সংস্কৃতি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করে নিজ নিজ অবস্থান আরো উন্নত এবং গতিশীল করছে। সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবগুলো নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি করেছে। আগে কোনো সংবাদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করতে অনেক সময় লাগত কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো সংবাদ মুহূর্তের মধ্যেই এক বন্ধুর নিকট থেকে অন্য বন্ধুর নিকট বা ব্যবসায়ির কাছে পৌঁছানো যায়। এতে সময় বাঁচে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের তুলনায় খরচ অনেক কম। কারণ এতে কোনো মাসিক সার্ভিস চার্জ দিতে হয় না। ইহা ব্যবহারকারীকে প্রচুর পরিমাণ ডেটা অ্যাক্সেস করার সুযোগ দেয় সেই তুলনায় খরচ অত্যধিক কম। কম্পিউটারের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় তথ্য বের করতে পারি। যোগাযোগের এটা হচ্ছে একটি সহজ পদ্ধতি। তবে কম্পিউটারে ডেটা ইনপুট দেয় মানুষ, সুতরাং মানুষ ভুল ডেটা ইনপুট দিলে ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে পৃথিবীর সকলের সাথে জ্ঞানের আদান-প্রদান করা যায়। ইহা একটি সীমানাহীন তথ্য সার্ভিস।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমাজ শুধুই যে সুবিধা পাচ্ছে তা নয় অসুবিধাও রয়েছে। যেমন- প্রতারণা, পরিচয় গোপন/ চুরি, পর্নোগ্রাফি, হ্যাকিং ইত্যাদি। অধিক মাত্রায় কম্পিউটার ব্যবহার এবং সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার না করার কারণে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত আধুনিক ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানিতে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া আজকাল ব্যাংক, বীমা, ক্রেডিট কোম্পানি, পরিবহন এবং উন্নত বিশ্বের সাধারণ কেনাকাটাসহ অনেক কর্মকাণ্ড অচল। ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সহজে কম সময়ে সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ, ই-মেইল, ওয়েব সাইট এবং ইন্টারনেট বাণিজ্যিক যোগাযোগসহ সব রকম যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনকে ই-কমার্স বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের বিষয়টি সকলের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। এর মাধ্যমে শুধু যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে তা নয়, বিভিন্ন ধরনের সেবাও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ই-ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আমরা ব্যাংকে না গিয়ে নির্দিষ্ট হিসাবে টাকা স্থানান্তর করতে পারি। বেশির ভাগ ব্যাংকই এখন এটিএম বুথ এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন ও জমাদানের সুবিধা দিচ্ছে। এর ফলে অতি সহজে কম খরচে এবং কম সময়ে টাকা উত্তোলন ও জমা দেয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। এখন ইচ্ছা করলে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কোনো লাইব্রেরি থেকে বই পড়তে পারেন। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কিংবা গবেষণা কর্ম সাথে সাথে ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। আজকাল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য কম্পিউটার এবং প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণির উপযোগী করে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। যুক্ত করা হয় সুন্দর, আকর্ষণীয় চিত্র এবং বর্ণনা। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে এরং আয়ত্ত করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে না বুঝে বই দেখে শুধু মুখস্থ করার দিন শেষ হয়ে গেছে । তাছাড়া শিক্ষকরা ক্লাস শুরুর আগেই লেকচার শিট অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে দিতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারেন। বিভিন্ন দেশের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী এবং উন্নত মানের পাঠ্যক্রম তৈরি করতে পারে। জ্ঞান অর্জন এখন আর শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে Distance learning এর সাহায্যে ঘরে বসে পড়া এমনকি ডিগ্রি নেয়াও সম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিপ্লব এনেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া সিডি ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো বিষয় সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ছাত্রদের বিভিন্ন ওয়েব সাইটের নাম ও ঠিকানা দিয়ে দেন। এর ফলে তাদের বিশ্লেষণ দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস বৃদ্ধি পায় যা বর্তমান বিশ্বে জ্ঞানের প্রধান ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত। বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। প্রশ্ন-উত্তর এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা (যেমনঃ এসএসসি ও এইচএসসি) খাতা মূল্যায়ন করে এবং ফলাফল প্রদান করে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

অফিস-আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ:

অফিস আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। অফিসে যেখানে আগে প্রচুর পরিমাণে কাগজপত্র স্তূপ দেয়া থাকত আজ সেখানে কাগজপত্র দেখা যায় না বললেই চলে। এতসব ফাইলের পরিবর্তে রয়েছে একটি মাত্র কম্পিউটার এবং একটি ইন্টারনেট সংযোগ। কম্পিউটারেই সংরক্ষিত আছে অফিসের সকল কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য। কম্পিউটারের মাধ্যমেই করা হয় বেতন, পাওনা ইত্যাদির হিসাব। দপ্তরে দপ্তরে ফাইল নিয়ে পিয়নদের দৌড়ঝাপ চোখে পড়ে না, কারণ ই-মেইলের মাধ্যমেই এ কাজগুলো সেরে নেয়া হয়। বিচারক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচার প্রার্থীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন।

আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার (ভিডিও কনফারেন্সিং)

বিচার প্রার্থীরা অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি এবং বিচার দায়ের করতে পারেন। সাধারণ জনগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। সাধারণ মানুষ আইন মান্য করতে উৎসাহী হবেন। সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের সকল আইনকে বিনামূল্যে জনগণের জন্য অনলাইনে প্রকাশ করতে পারে। বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে সমন্বিতভাবে করা সম্ভব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগে আদালত তথা বিচার ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম সমন্বিতভাবে করাই হলো ই-কোর্ট। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ই-কোর্ট চালু হয়েছে এবং সাফল্যজনকভাবে কাজ করছে।

বিজ্ঞান, চিকিৎসায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ:

পূর্বে কোনো একজন বিজ্ঞানী কোনো গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রেখে মারা গেলে অথবা অন্য কোনো কারণে চালিয়ে যেতে না পারলে, গবেষণা কাজটি সেখানেই সমাপ্ত হয়ে যেত কোনো ফলাফল ছাড়া। হয়তো পরবর্তীতে আবার কোনো বিজ্ঞানী ঐ একই বিষয়ের উপর গবেষণা শুরু করছেন। অথবা এমনও দেখা যায় যে, একই বিষয়ের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একযোগে প্যারালালভাবে গবেষণা করে, কারণ বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে কোনো প্রকার যোগাযোগ করতে পারতেন না বা সুযোগ ছিল না। একজন অন্যজনের গবেষণার অগ্রগতি বা ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারতেন না। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা কর্ম নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে টেলিফোন, টেলিভিশন, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং

চিকিৎসায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ

গবেষণা কর্ম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। ফলে বিজ্ঞান সামনের দিকে এগিয়ে চলছে রকেটের গতিতে। বিজ্ঞান নিত্য-নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দ্বারে হাজির হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ ঘরে বসে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে চিকিংসা সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন নতুন ঔষধের উদ্ভাবন এবং রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ পদ্ধতি আজ সবাই জেনে যাচ্ছেন। রোগীরা ঘরে বসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নত হাসপাতালের ডাক্তারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং পরামর্শ নিতে পারেন। বিভিন্ন প্যাথলজিক পরীক্ষার রিপোর্ট ইন্টারনেটের মধ্যমে দূর দেশে থাকা ডাক্তারকে দেখাতে পারেন। বর্তমানে আমাদের দেশেও টেলিমেডিসিন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে দুর্গম এলাকা থেকেও জনগণ টেলিফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকে।

শিল্প-সাহিত্যে এবং বিনোদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:

সারা বিশ্বের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান আজ ঘরে বসে উপভোগ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের থ্রিডি গেম এবং এনিমেটেড বিভিন্ন সিনেমা বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ডিজিটাল প্রজেকশনের ফলে দর্শক সিনেমা, নাটক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা আনন্দের সাথে উপভোগ করতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। সাহিত্য ও শিল্প কর্মের ফলাফল আজ মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষের কল্যাণে সেসব কর্ম অবদান রেখে যাচ্ছে। বিনোদনের কথাতো বলাই বাহুল্য। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সারা বিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। ফলে তথ্য প্রযুক্তি আমাদের বিনোদনের সকল চাহিদাকে পূরণ করে যাচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের ৮০% লোক কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষি শিল্পের উন্নতির সাথে সারা দেশের উন্নতি নির্ভর করে। আর এই কৃষির উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। আজ-কাল জমির মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাটির বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে পারেন, কোনো মাটিতে কোনো ফসল ভালো উৎপাদন হবে। তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কৌশল কৃষকরা জানতে পারে, পূর্বে তারা শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে চাষাবাদ করত। রোগ বালাইর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কার্যকরী ঔষধ, প্যাকেজিং ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

অনলাইন কৃষি বাজারও চালু হয়েছে-যার ফলে কৃষকরা সহজে বেশি দামে কৃষিপণ্য বাজারজাত করতে পারে। কৃষকরা গ্রামে থেকেই মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় শহরের পাইকারি বাজারের দাম জানতে পারে। ফলে কম দামে ফসল বিক্রি করে লোকসান দিতে হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন গবেষণা ও প্রয়োগের ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে উন্নত, অধিক ফলনশীল, প্রতিকূল পরিবেশে সহনশীল খাদ্যশস্য আবিষ্কার করছে যা কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে আমাদের সমাজে কিছু নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সহজে মানুষ প্রতারণা করতে ও মিথ্যা বলা বেড়ে গেছে। যেমন-আমরা প্রায়ই মোবাইল ফোনে নিজের অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যা বলতে দেখি। তাছাড়া ইন্টারনেটে অনেক মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে। তাছাড়া অনেকে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ চালিয়ে থাকে। পর্নোগ্রাফির করাল থাবায় দেশের যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এর ফলে এলাকার যুব সমাজের নৈতিক স্খলন ঘটে। তাছাড়া হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করার প্রবণতা দেখা যায়। তাছাড়া শিশু-কিশোররা বিভিন্ন প্রকার গেমস-এ আসক্ত হয়ে প্রচুর সময় নষ্ট করে। এতে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। এদিকে কম্পিউটারে মাত্রাতিরিক্ত কাজ করার ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়।

১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ICT and Economical Development

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ, আর এ বিশ্বায়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইসিটি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আইসিটি বাজারজাতকরণ, গবেষণা এবং পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আইসিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন বাজার ধরার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে কোনো কোম্পানি বা অর্গানাইজেশনের জন্য যেমন-আমেরিকার একটি কোম্পানি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাদের পণ্যের সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত আগ্রহীরা ঐ প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারে, ছবি দেখতে, কোনো বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হলে তা করতে পারে এবং এমন কি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসে পণ্য অর্ডার দেয়া যায়। উপরের আলোচনার সকল কিছুই সম্ভব তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। আইসিটি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুবিধা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা হচ্ছে যেকোনো দেশে উন্নয়নের বড় হাতিয়ার। তাই অনেক দেশ এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে। আইসিটি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছাত্রদের আকৃষ্ট করা যায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা আশি জন লোক কৃষি কাজ করে থাকে। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন হলে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক অগ্রগতি সাধিত হবে। আমাদের দেশে কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে দরিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে দেখছে। আইসিটির মাধ্যমে কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও অনুষ্ঠান (যেমন-হৃদয়ে মাটি ও মানুষ, কৃষি দিবানিশি, মাটির টানে ইত্যাদি) কৃষকদের কৃষি ফসল, চাষ পদ্ধতি, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করে এবং কৃষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র, যার মধ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা পেয়ে থাকে, কৃষিপণ্য সংক্রান্ত ওয়েব সাইট থেকে কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেতে পারে এবং ফসলের রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি, উন্নত জাত নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য লাভ করতে পারেন। এর ফলে কৃষক অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারে এর ফলে কৃষি এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়।

আজকাল কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় লেখালেখির কাজ এবং প্রশিক্ষণের জন্য তথ্যসেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং ফলে বেকারদের কর্মসংস্থান এবং অন্যদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। নিজে আত্মকর্মসংস্থান করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন। অদক্ষদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির ফলে আমরা বিদেশে আইটিতে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি যা অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে-বিদেশে কর্ম সংস্থানের জন্য রেজিস্ট্রেশনের কাজ ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে করা যায়। এর ফলে গ্রামের লোকজন বিশেষ করে অর্ধশিক্ষিত/ অশিক্ষিত লোকজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা নিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া করতে পারে এবং বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ইউটিলিটি বিল এমনকি আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং করের টাকা পরিশোধ করা যায়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ বিধায় জনসাধারণ আয়কর দিতে উৎসাহী হয় এবং এর ফলে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয় জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ব্যাংকিং খাতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ব্যাংক এখন সাধারণ চেক বইয়ের পরিবর্তে এমআইসি আর (MICR) চেক ব্যবহার করে। এর ফলে নিকাশ ঘরের কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিদেশ দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রেও পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেকট্রনিক্স ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে টাকা পাঠানো হয়। ফলে ফান্ড স্থানান্তর অতি দ্রুত হয় যা আমাদের অর্থনীতি উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। বাংলাদেশের আয়তন বেশি বড় নয় কিন্তু এর জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠির খাদ্যের চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞানীরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রতিকুল পরিবেশে ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে।

ক. ক্রায়োসার্জারি কোনো রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়?

খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

গ. বিজ্ঞানীরা কোনো পদ্ধতিতে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রতিকুল পরিবেশে ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করতে পারে তা বর্ণনা কর।

ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে বিভিন্ন ফলমূল, শাকসব্জি তার আদি বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে–ব্যাখ্যা কর।

২। রহিম মিয়া একজন কৃষক। তিনি তার নিজের জমিতে ফসল উৎপাদন করে পরিবারের খরচ মেটায়। কিন্তু এ বছর তার জমিতে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়নি তাই তিনি থানা কৃষি পরিদর্শকের নিকট পরামর্শের জন্য গেলেন। পরিদর্শক সাহেব তার জমির মাটি পরীক্ষা করতে এবং বাজার দর যাচাই করে উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের পরামর্শ দেন।

ক. ফেসবুক কি?

খ. রহিম মিয়া কিভাবে ফসলের বাজার দর সম্পর্কে জানতে পারবে?

গ. মাটি পরীক্ষা করে কিভাবে জৈব সারের ব্যবহার কমানো যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার–ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। নিচের কোনোটির কারণে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে আসছে-

ক. ইন্টারনেট খ. জেট বিমান আবিষ্কার

গ. সুপার কম্পিউটার আবিষ্কার ঘ. আন্তর্জাতিক হাইওয়ে তৈরি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

করিম সাহেব বাসায় একা থাকেন। একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখেন তাঁর ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারি, কম্পিউটার তছনছ করেছে। আলমারিতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলেন। পুলিশকে জানালে , পুলিশ রক্ত, আলমারি ও কম্পিউটারে লেগে থাকা হাতের আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই চোর ধরা পড়ল।

২। অনুমতি ছাড়া কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়াকে কী বলে–

ক. স্প্যামিং খ. হ্যাকিং

গ. সাইবার চুরি ঘ. প্লেজিয়ারিজম

৩। কোনো পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে পুলিশ অপরাধী ধরতে সক্ষম হয়েছে–

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স

গ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ. আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স

৪। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র গঠনের ফলে–

i. কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

ii. জনগণের যোগাযোগ খরচ কমেছে।

iii. জনগণের সময় অপচয় রোধ হয়েছে।

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

COMMUNICATION SYSTEM & NETWORKING

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। তথ্য প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজন ডেটা কমিউনিকেশন, টেলিফোন, মোবাইল, টেলিভিশন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। আজ বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচলন সভ্যতাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে কমিউনিকেশন বলতে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারের ডেটা স্থানান্তরকে বোঝানো হয়। সারা বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। মানুষ তথ্যের মহাসমুদ্রে অবস্থান করতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বব্যাপী উপাত্ত ও তথ্য বিনিময় করতে পারছে। এ উপাত্ত ও তথ্য বিনিময় করার জন্য কমিউনিকেশন সিস্টেম (ব্যান্ড উইথ, ট্রান্সমিশন মেথড, মোড), ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল অপটিক্যাল ফাইবার), ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই, ওয়াই-ম্যাক্স) মোবাইল যোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা ও ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

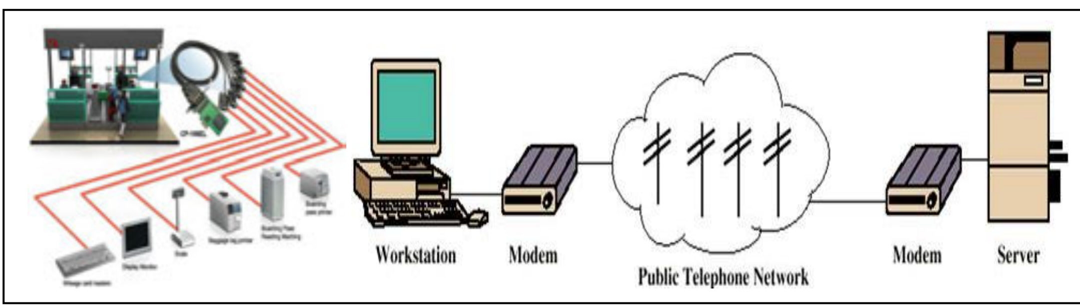

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।
- ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
- ডেটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ক্লাইড কম্পিউটিং এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রাথমিক ধারণা
Primary Concept of Communication System

কমিউনিকেশন শব্দের অর্থ যোগাযোগ এবং সিস্টেম শব্দের অর্থ পদ্ধতি। অর্থাৎ কমিউনিকেশন সিস্টেম শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ পদ্ধতি। এক সময়ে মানুষ পায়রার পায়ে বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্য পাঠাত। ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে। এক জায়গা থেকে খবর আরেক জায়গায় পাঠানোর জন্য রানারের ব্যবস্থা আমাদের দেশে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে টেলিগ্রাফ পদ্ধতির আবিষ্কার আমাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করল। ১৮৭৬ সালে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কর্তৃক বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে কণ্ঠস্বর প্রেরণের পদ্ধতি প্রদর্শনের ঘটনা থেকে ডেটা কমিউনিকেশনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯৪০ সালে ড. জর্জ স্টিবিজ প্রথম কম্পিউটার থেকে টেলিগ্রাফ লাইনের মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত বেল ল্যাবরেটরির ক্যালকুলেটরে ডেটা প্রেরণ করেন, তখন উন্মোচিত হয় তথ্য প্রেরণের নতুন দিগন্ত। তার হাত ধরে আজ বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচলন সভ্যতাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে কমিউনিকেশন বলতে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারের ডেটা স্থানান্তরকে বোঝানো হয়। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ও দূরবর্তী টার্মিনালের মধ্যে উপাত্ত স্থানান্তর প্রক্রিয়ার প্রচলন শুরু হয়। এসব টার্মিনালে সংরক্ষণ ও প্রসেসিং-এর ক্ষমতা ছিল না। এধরনের পদ্ধতি টেলিপ্রসেসিং নামে পরিচিত। বর্তমান যুগে ডেটা একটি মূল্যবান সম্পদ। একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, প্রতিষ্ঠানের জন্য বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাইরের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সাথে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশক সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য বা ডেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.১.১ ডেটা কমিউনিকেশন (Data Communication)

কোনো ডেটা বা তথ্যকে এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটার কিংবা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে (মোবাইল, স্মার্টফোন, পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিসটেন্ট, জিপিএস নেভিগেটর ইত্যাদি) কিংবা একস্থান হতে অন্য স্থানে কিংবা একজনের ডেটা বা তথ্যকে অন্যের নিকট স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে ডেটা কমিউনিকেশন বলে। এটি এমন ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্যস্থানে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা তথ্য সহজে ও দ্রুততম সময়ে আদান-প্রদান করা যায়।

ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান (Elements of Data Communication)

ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ায় একস্থান হতে অন্যস্থানে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব। ডেটা কমিউনিকেশনের পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো–

ক. উৎস (Source)
খ. প্রেরক (Transmitter)
গ. মাধ্যম (Medium)
ঘ. গ্রাহক বা প্রাপক (Receiver) ও
ঙ. গন্তব্য (Destination)

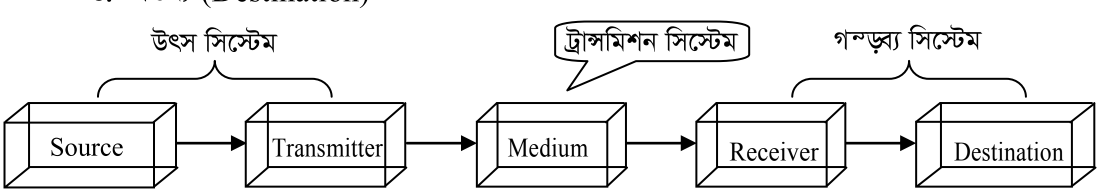

চিত্র-২.১: ডেটা কমিউনিকেশনের সাধারণ ব্লকচিত্র

ক. **উৎস (Source):** ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যেসব ডিভাইস হতে ডেটা বা উপাত্ত তৈরি করা হয় তাকে উৎস বলে। যেমন- কম্পিউটার, টেলিফোন ইত্যাদি।

খ. **প্রেরক (Transmitter):** উৎস থেকে ডেটা সরাসরি প্রেরণ করা যায় না। এর জন্য প্রেরকের প্রয়োজন হয়। উৎস থেকে প্রাপকের নিকট ডেটা পাঠানোর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে প্রেরক বলে। যেমন-মডেম।

গ. **মাধ্যম (Medium):** যার মাধ্যমে ডেটা একস্থান থেকে অন্যস্থানে অথবা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর করা হয় তাকে ডেটা প্রবাহের বাহক বা মাধ্যম বলা হয়। যেমন-ক্যাবল, পাবলিক টেলিফোন লাইন, রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, অপটিক্যাল ফাইবার, স্যাটেলাইট ও মডেম ইত্যাদি।

গ. **গ্রাহক বা প্রাপক (Receiver):** যে যন্ত্রের মাধ্যমে ডেটা গ্রহণ করা হয় তাকে গ্রাহক বা প্রাপক বলে। গ্রাহক বা প্রাপক হিসেবে মডেম ব্যবহার করা হয়। গ্রাহক কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মডেম কম্পিউটারের অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করে।

ঘ. **গন্তব্য (Destination):** সর্বশেষ যে ডিভাইসে ডেটাসমূহকে পাঠানো হয় তাকে গন্তব্য বলে। গন্তব্য হিসেবে সার্ভার, পার্সোনাল কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা (Data Communication System)

ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে অথবা কম্পিটার থেকে অন্য কোনো ডিভাইসে ডেটা বা তথ্যের আদান-প্রদান হতে পারে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার ডেটার উৎস, মডেম প্রেরক, পাবলিক টেলিফোন লাইন মাধ্যম, মডেম প্রাপক এবং সার্ভার গন্তব্য হিসেবে কাজ করছে। প্রেরক হতে যে মাধ্যমের সাহায্যে ডেটা অথবা তথ্য প্রাপকের কাছে পৌঁছায় তাকে বলা হয় মাধ্যম। টেলিফোন লাইন, ক্যাবল ইত্যাদি এ ধরনের মাধ্যমের উদাহরণ। নিচের চিত্রের একটি সাধারণ ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা দেখানো হলো–

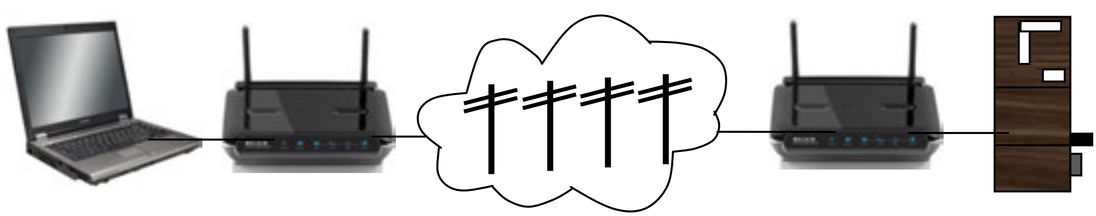

চিত্র-২.২: ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা

টেলিফোন লাইনের মধ্য দিয়ে অ্যানালগ সংকেত (Analog Signal) আদান-প্রদান হয়। কম্পিউটারে প্রসেসিং করার জন্য ডেটাকে ডিজিটাল সংকেতে (Digital Signal) রূপান্তর করা হয়। কাজেই ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে এবং অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করা প্রয়োজন।

প্রেরক কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত মডেম (Modem) কম্পিউটারে ব্যবহৃত ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে রূপান্তরিত করে টেলিফোন লাইনে প্রেরণ করে। প্রাপক কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত মডেম টেলিফোন লাইন থেকে প্রাপ্ত অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করে গ্রাহক কম্পিউটারে প্রেরণ করে।

২.১.২ ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড (Data Transmission Speed)

কোনো ডেটাকে এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে কিংবা একস্থান হতে অন্যস্থানে ডেটা স্থানান্তরের হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। এ ট্রান্সমিশন স্পিডকে Bandwidthও বলা হয়। সাধারণত Bit per Second (bps) এ এই ব্যান্ডউইথ হিসাব করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সমিট করা হয় তাকে bps বা Bandwidth বলে।

ডেটা ট্রান্সফার গতির উপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন গতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band)
২. ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band)
৩. ব্রড ব্যান্ড (Broad Band)

১. **ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band):** ন্যারো ব্যান্ডের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তরের গতি সবচেয়ে কম। যে ব্যান্ডে ডেটা চলাচলের গতি ৪৫ bps থেকে ৩০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে তাকে ন্যারো ব্যান্ড বা সাব-ভয়েজ ব্যান্ড বলে। সাধারণত ধীরগতির ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এ ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়। টেলিগ্রাফিতে তারের ব্যবহার বেশি হওয়ায় ডেটা স্থানান্তরের গতি কম। যেমন-টেলিগ্রাফ।

২. **ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band):** এ ব্যান্ডের ডেটা ট্রান্সমিশন হার ৯৬০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ল্যান্ড টেলিফোনে বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে কম্পিউটার ডেটা কমিউনিকেশনে কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কিংবা কার্ড রিডার থেকে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এ Band Width ব্যবহার করা হয়।

৩. **ব্রড ব্যান্ড (Broad Band):** এটি উচ্চ গতিসম্পন্ন Bandwidth- যার ডেটা ট্রান্সমিশন হার ১ মেগা bps হতে অতি উচ্চগতি পর্যন্ত হয়ে থাকে। Broad Band সাধারণত কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবার ডেটা স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া WiMax, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এবং মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়।

২.১.৩ ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি (Method of Data Transmission)

কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তর হয় সিগন্যাল বিটের মাধ্যমে। এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার সময় অব্যশই দুকম্পিউটারের মধ্যে সিগন্যাল বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে সম্মত হতে হয়। বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে না পারলে প্রাপক কম্পিউটার সে সিগন্যাল গ্রহণ করতে পারে না। এ সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বলা হয় বিট সিনক্রোনাইজেশন।

কম্পিউটার ডেটা কমিনিউকেশনে প্রধানত তিন ধরনের বিট সিনক্রোনাইজেশন ব্যবহৃত হয়। যথা:

১. এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission) ও
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)

যে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক কম্পিউটার হতে ডেটা গ্রাহক কম্পিউটারে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয় তাকে এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে। এসিনক্রোনাস পদ্ধতিতে ৮ বিটের ক্যারেক্টার ডেটাকে ট্রান্সমিশনের পূর্বে তার সম্মুখে একটি স্টার্ট বিট এবং শেষে একটি বা দুটি স্টপ বিট সংযুক্ত হয়ে প্রতিটি ক্যারেক্টার ১০ অথবা ১১ বিটের ডেটায় রূপান্তরিত হয়ে ট্রান্সমিট হয়।

স্টার্ট বিট	৮ বিট ক্যারেক্টার	স্টপ বিট

চিত্র: এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে একটি ক্যারেক্টার পাঠানোর জন্য সিগন্যাল।

এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Asynchronous Transmission)

১. এ ধরনের ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক যেকোনো সময় ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারবে এবং গ্রাহকও তা গ্রহণ করবে।

২. এ পদ্ধতিতে একটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হবার পর আরেকটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করার মাঝের বিরতি সময় সমান না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

৩. প্রেরক স্টেশনে প্রাইমারি স্টোরেজের প্রয়োজন হয় না।

৪. ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার দক্ষতা ও গতি কম।

৫. প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি Start bit এবং শেষে একটি অথবা দুটি Stop bit প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশনকে স্টার্ট/ স্টপ ট্রান্সমিশনও বলা হয়।

৬. স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন বন্ধ থাকলে খরচ বেড়ে যায়।

এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধাসমূহ (Advantages of Asynchronous Transmission)

১. যেকোনো সময় প্রেরক ডেটা স্থানান্তর করতে পারে এবং গ্রাহক তা গ্রহণ করতে পারে।

২. ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রেরকের কোনো প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।

৩. কম ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী।

৪. তুলনামূলকভাবে খরচ কম।

এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Asynchronous Transmission)

১. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের তুলনায় এর দক্ষতা কম।

২. ডেটা ট্রান্সমিশনে গতি কম।

৩. যখন ডেটা স্থানান্তরের কাজ বন্ধ থাকে তখন ট্রান্সমিশন মাধ্যমটি অকারণে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

৪. স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন বন্ধ থাকলে খরচ বেড়ে যায়।

এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার (Application of Asynchronous Transmission)

১. কম্পিউটার হতে প্রিন্টারে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

২. কীবোর্ড হতে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

যে ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক স্টেশনে প্রথমে ডেটাকে কোনো প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করে নেয়ার পর ডেটার ক্যারেক্টারসমূহকে ব্লক আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে। প্রতিটি ব্লকে (যাকে প্যাকেটও বলা হয়) কমপক্ষে ৮০ থেকে ১৩২টি ক্যারেক্টার থাকে। দুটি ব্লকের মাঝখানের সময় বিরতি সমান সময় হয়ে থাকে এবং প্রতিটি ব্লক ডেটার শুরুতে একটি হেডার (Header) ইনফরমেশন ও শেষে একটি ট্রেইলর (Tailer) ইনফরমেশন পাঠানো হয়। হেডার ইনফরমেশন গ্রাহকের ক্লক স্পিডকে প্রেরকের ক্লক স্পিডের সাথে সিনক্রোনাইজ করে এবং প্রেরক ও গ্রাহকের সনাক্তকরণ সংখ্যা বহন করে থাকে। আর ট্রেইলর ইনফরমেশন ব্লকের শেষ নির্দেশ করে। তাছাড়া ডেটার মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা তা যাচাই করতে সহায়তা করে থাকে।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Synchronous Transmission)

১. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি।
২. ট্রান্সমিশনের গতি অনেক বেশি।
৩. প্রতিটি ক্যারেক্টারের মাঝে টাইম ইন্টারভেল বা বিরতির প্রয়োজন হয় না।
৪. প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি Start bit এবং শেষে Stop bit প্রয়োজন হয় না।
৫. প্রেরক স্টেশনে প্রাইমারি স্টোরেজের প্রয়োজন হয়।
৬. তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধাসমূহ (Advantages of Synchronous Transmission)

১. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা (Efficiency) এসিনক্রোনাস এর তুলনায় বেশি।
২. যেহেতু ট্রান্সমিশন কার্য অনবরত চলতে থাকে ফলে তার ট্রান্সমিশন গতি বেশি।
৩. প্রতি ক্যারেক্টারের পর টাইম ইন্টারভেল এর প্রয়োজন হয় না এবং প্রতি ক্যারেক্টারের শুরু এবং শেষে Start এবং Stop bit এর প্রয়োজন হয় না।
৪. সময় তুলনামূলকভাবে কম লাগে।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Synchronous Transmission)

১. প্রেরক স্টেশনে একটি প্রাথমিক সংরক্ষণ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
২. এটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার (Application of Synchronous Transmission)

১. কম্পিউটার হতে কম্পিউটারে ডেটা কমিউনিকেশনে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
২. একস্থান থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে ডেটা স্থানান্তরে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
৩. এক কম্পিউটার হতে একই সময়ে অনেকগুলো কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন প্রায় সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের মতোই। তবে আরও উন্নত ভার্সন। আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রেরক ও প্রাপক স্টেশনের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলে (Delay) সর্বনিম্ন রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রেরক হতে গ্রাহককে অনেকগুলো বর্ণ নিয়ে একটি করে ব্লক তৈরি করে একসাথে একটি ব্লক ডেটা পাঠানো হয়। দুটি ব্লকের মধ্যে ডেটা ট্রান্সফারের সময় প্রায় ০ একক করার চেষ্টা করা হয়।

কাজ: এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন ও সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

২.১.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিককে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। ডেটা স্থানান্তরের প্রবাহের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ দিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

১. ইউনিকাস্ট (Unicast) ২. ব্রডকাস্ট (Broadcast) ৩. মাল্টিকাস্ট (Multicast)

ইউনিকাস্ট (Unicast): যে ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রেরক (কম্পিউটার) ও প্রাপকের (কম্পিউটার) মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান হয় তাকে ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়।

এ ট্রান্সমিশন মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

- সিমপ্লেক্স (Simplex)
- হাফ-ডুপ্লেক্স (Half Duplex)
- ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex)

সিমপ্লেক্স (Simplex): ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একদিকে ডেটা প্রেরণের মোড বা প্রথাকে বলা হয় সিমপ্লেক্স। এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র A হতে B এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে কিন্তু B হতে A এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে না। সিমপ্লেক্স ব্যবস্থায় যে প্রান্ত ডেটা প্রেরণ করবে সে প্রান্ত গ্রহণ করতে পারবে না এবং গ্রহণ প্রান্তও প্রেরণ করতে পারবে না। উদাহরণ-রেডিও, টিভি, PABX সিস্টেম ।

চিত্র-২.৩: Simplex

হাফ-ডুপ্লেক্স (Half Duplex): এ ব্যবস্থায় ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে ডেটা প্রেরণ করা যায় তবে তা একই সময়ে সম্ভব নয়। এ পদ্ধতিতে যেকোনো প্রান্ত একই সময়ে কেবলমাত্র ডেটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু গ্রহণ এবং প্রেরণ একই সাথে করতে পারে না। নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যবস্থায় A যখন ডেটা প্রেরণ করবে B তখন কেবলমাত্র ডেটা গ্রহণ করতে পারবে, প্রেরণ করতে পারবে না। A এর প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে B ডেটা প্রেরণ করতে পারবে কিন্তু ডেটা গ্রহণ করতে পারবে না। **উদাহরণ:** ওয়াকিটকি।

চিত্র-২.৪: Half Duplex

ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex)

এ ব্যবস্থায় ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একই সময়ে উভয় দিক হতে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে যেকোনো প্রান্ত প্রয়োজনে ডেটা প্রেরণ করার সময় ডেটা গ্রহণ অথবা ডেটা গ্রহণের সময় প্রেরণও করতে পারবে। চিত্রে ফুল-ডুপ্লেক্সের ক্ষেত্রে, A যখন B এর দিকে ডেটা প্রেরণ করবে B ও তখন A এর দিকে ডেটা প্রেরণ করতে পারবে। **উদাহরণ**-টেলিফোন, মোবাইল ও ইন্টারনেট।

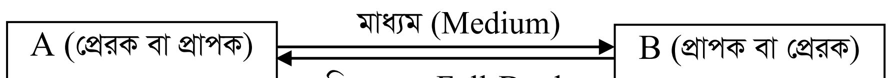

চিত্র-২.৫: Full-Duplex

সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্স মোডকে একত্রে ইউনিকাস্ট (Unicast) মোডও বলা হয়।

১. ব্রডকাস্ট (Broadcast)

এ ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড (কম্পিউটার, প্রিন্টার বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি) থেকে ডেটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল নোডই গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে টিভি ও রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলে তা সকলেই উপভোগ করতে পারে। পাশের চিত্রে A নোড থেকে কোনো ডেটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্ত সকল নোডই (B,C,D ও E কম্পিউটার) গ্রহণ করবে।

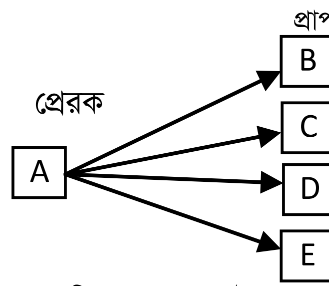

চিত্র-২.৬: ব্রডকাস্ট মোড

২. মাল্টিকাস্ট (Multicast)

মাল্টিকাস্ট ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড (কম্পিউটার, প্রিন্টার বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি) থেকে ডেটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল নোডই গ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি গ্রুপের সকল সদস্য গ্রহণ করতে পারে। যেমন- টেলিকনফারেন্সিং ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যাদের অনুমতি থাকবে তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে। পাশের চিত্রে, A প্রেরক নোড থেকে কোনো ডেটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্ত B, D ও E নোড গ্রহণ করবে।

C নোড ডেটা গ্রহণ করতে পারবে না কারণ C নোড আলোচ্য ভিডিও কনফারেন্সিং গ্রুপের সদস্য নয়।

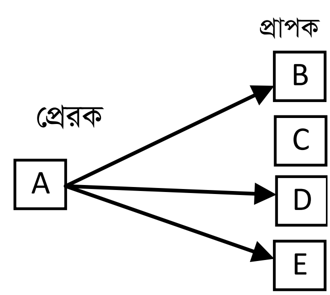

চিত্র-২.৭: মাল্টিকাস্ট মোড

২.২ ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Data Communication Medium)

ডেটা কমিউনিকেশনের প্রক্রিয়ায় প্রেরক কম্পিউটার এবং দূরবর্তী গ্রাহক কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য এক ধরনের সংযোগ প্রয়োজন। এ সংযোগকে সাধারণত চ্যানেল (Channel) বা মাধ্যম বলা হয়। চ্যানেল বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোই হচ্ছে মাধ্যম। যেমন- সাধারণ টেলিফোন লাইন, মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইত্যাদি।

নিম্নে কয়েকটি চ্যানেল বা মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. ক্যাবল বা তার (Cable or Wire)
২. সাধারণ টেলিফোন লাইন (Telephone line)
৩. বেতার তরঙ্গ (Radio Wave)
৪. মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
৫. ভূ-উপগ্রহ ব্যবস্থা (Satellite)
৬. ইনফ্রারেড (Infrared) ইত্যাদি।

ক্যাবল বা তার (Cable or Wire)

ডেটা কমিউনিকেশনে ক্যাবল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সাধারণত কম দূরত্বের নেটওয়ার্কিং যেমন- LAN (Local Area Network) ব্যবস্থায় ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে হাইস্পিড ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রেও ক্যাবল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

তবে নিম্নলিখিত ক্যাবলগুলোর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার লক্ষ্যণীয়–

- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial cable)
- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable)
- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (Optical Fiber cable) ইত্যাদি।

২.২.১ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial cable)

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের (Co-axial cable) অপর একটি নাম হচ্ছে কো-এক্স (Coax)। একটি সলিড কপার তার কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের কেন্দ্র দিয়ে অতিক্রম করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দুটি পরিবাহী তারের সমন্বয়ে গঠিত। পরিবাহী দুটি প্যাঁচানো অবস্থায় না থেকে একে অপরের ভিতরে থাকে। পরিবাহী দুটিকে পৃথক করে রাখা হয় এবং ভেতরের পরিবাহীকে আচ্ছাদিত করার জন্য বাহিরের পরিবাহী ও ভেতরের পরিবাহীর মাঝখানে অপরিবাহী পদার্থ থাকে। ভেতরের পরিবাহীটি সোজা থাকে। বাহিরের পরিবাহীটি চারদিক থেকে প্যাঁচানো থাকে এবং বাইরের পরিবাহককে আবার প্লাস্টিকের জ্যাকেট দ্বারা ঢেকে রাখা হয়।

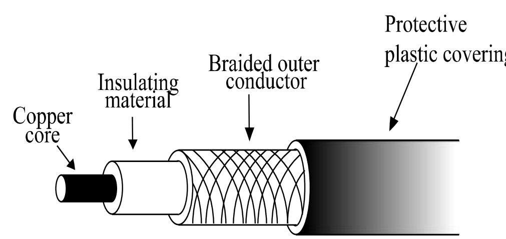

চিত্র-২.৮: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

এধরনের ক্যাবলের মধ্যদিয়ে খুব দ্রুত ডেটা স্থানান্তর হয়। তবে ডেটা স্থানান্তরের হার তারের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। সাধারণত কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করে এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডিজিটাল ডেটা প্রেরণ করা যায়, এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট 200 Mbps (Megabits per second) পর্যন্ত হতে পারে এবং ট্রান্সমিশন লস্ অপেক্ষাকৃত কম হয়। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দুপ্রকার। যথা: ১. থিননেট (Thinnet), ২. থিকনেট (Thicknet)

কো-এক্সিয়াল ক্যাবেলের সুবিধাসমূহ

১. এ ধরনের ক্যাবলের ট্রান্সমিশন লস্ অপেক্ষাকৃত কম হয়।
২. ডেটা স্থানান্তরের গতি বেশি।
৩. অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় ডেটা ট্রান্সমিশনে এ কেবল ব্যবহৃত হয়।
৪. টুইস্টেড পেয়ার কেবল অপেক্ষা এ কেবলের মাধ্যমে অধিক দূরত্বে তথ্য পাঠানো যায়।
৫. এটি ফাইবার কেবল অপেক্ষা কম ব্যয়বহুল এবং সহজে বহনযোগ্য।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের অসুবিধাসমূহ–

১. ডেটা ট্রান্সফার রেট নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর।
২. কো-এক্সিয়াল কেবল টুইস্টেড পেয়ার কেবল অপেক্ষা কিছুটা ব্যয়বহুল।

২.২.২ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair cable)

টেলিফোন লাইনের মধ্য দিয়ে তথ্য ও কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যোগাযোগের জন্য এধরনের মাধ্যম বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা তামার তারকে পরস্পর সমভাবে প্যাঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। প্যাঁচানো তার দুটিকে পৃথক রাখার জন্য এদের মাঝে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এধরনের ক্যাবলে সাধারণত মোট ৪ জোড়া তার ব্যবহার করা হয়। প্রতি জোড়া তারের মধ্যে একটি কমন রংয়ের (সাদা) তার থাকে এবং অপর তারগুলো হয় ভিন্ন রংয়ের। তারসমূহ সংযোজনের সময় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ৭, ৮, নম্বরের ভিত্তিতে সংযোগ দিতে হয়। প্রতি জোড়ার তার দুটির এক একটির পুরুত্ব হয় ০.৪ মিঃ মিঃ থেকে ০.৯ মিঃ মিঃ। টেলিফোন লাইনে এ তার ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল সিগন্যালিং এবং LAN-এ এই ক্যাবলের ব্যবহার রয়েছে। ডেটা ট্রান্সফারের দূরত্ব বাড়লে এর ডেটা ট্রান্সফারের হার কমে যায়। এ ক্যাবলের ট্রান্সমিশন ল্স অনেক বেশি। তবে অন্যান্য ক্যাবলের চাইতে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের দাম তুলনামূলকভাবে কম।

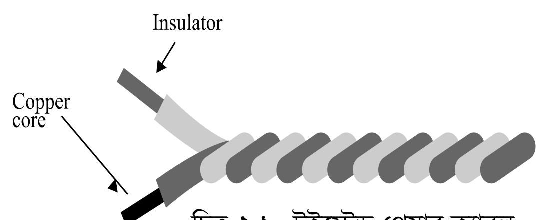

চিত্র-২.৯: টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল সাধারণত দুপ্রকারের হয়। যথা:

ক. আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বা ইউটিপি (Unshielded Twisted Pair-UTP)
খ. শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বা STP (Shielded Twisted Pair-STP)

ক. আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বা ইউটিপি (Unshielded Twisted Pair-UTP)

UTP ক্যাবল মূলত একাধিক জোড়া টুইস্টেড পেয়ারের সমষ্টি যা আবার প্লাস্টিক আবরণে মোড়ানো থাকে। তারের মধ্য দিয়ে যখন সিগন্যাল অতিক্রম করতে থাকে তখন এর শক্তি বা মান ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। দুধরনের UTP ক্যাবল আছে। যথা: UTP Catagory-5 ও Catagory-6। বর্তমানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে Catagory-5 ও Catagory-6 আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বা ইউটিপি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।

খ. শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বা STP (Shielded Twisted Pair-STP)

শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে এক বা একাধিক টুইস্টেড ক্যাবল থাকে যা ফয়েল (Foil) ও প্রটেকটিভ কপার শিল্ডিং দ্বারা আবৃত।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের সুবিধাসমূহ–

১. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দামে খুবই সস্তা এবং ইনস্টল করাও সহজ।

২. অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় ডেটা ট্রান্সমিশনে এ ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

টুইস্টেড পেয়ার কেবলের অসুবিধাসমূহ–

১. এধরনের ক্যাবল ব্যবহার করে ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে কোনো ডেটা প্রেরণ করা কষ্টকর।

২. ট্রান্সমিশন ল্স অনেক বেশি হয়ে থাকে।

২.২.৩ অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber)

অপটিক্যাল ফাইবার হলো কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ডাই ইলেকট্রিক (অন্তরক) পদার্থ,যা আলো পরিবহনে সক্ষম। অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে অতি দ্রুত ডেটা প্রেরণ করা যায়। অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। বর্তমানে যেসব অপটিক্যাল ফাইবার পাওয়া যায় তার ডেটা ট্রান্সমিশন হার ১০০ mbps থেকে ২ gbps ।

অপটিক্যাল ফাইবার তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত। যথা:

১. **কোর:** সবচেয়ে ভেতরের অংশ হচ্ছে কোর (Core) যা কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি। আলোক রশ্মি সঞ্চালন করে ভেতরের কোর। কোরের ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২. **ক্ল্যাডিং:** কোরের ঠিক বাইরের স্তরটি হচ্ছে ক্ল্যাডিং (Cladding)। ক্ল্যাডিং কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি যা কোর থেকে নির্গত আলোক রশ্মি প্রতিফলন করে তা পুনরায় ফেরত পাঠায়।

৩. **জ্যাকেট:** বাইরের অংশটি হলো জ্যাকেট যা ক্ল্যাডিং এর আবরণ হিসেবে কাজ করে।

অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন

ফাইবার তৈরির জন্য সোডা বোরো সিলিকেট, সোডা লাইম সিলিকেট, সোডা অ্যালুমিনা সিলিকেট ইত্যাদি মাল্টি কম্পোনেন্ট কাঁচগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও ফাইবারের ক্ল্যাডিং হিসেবে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

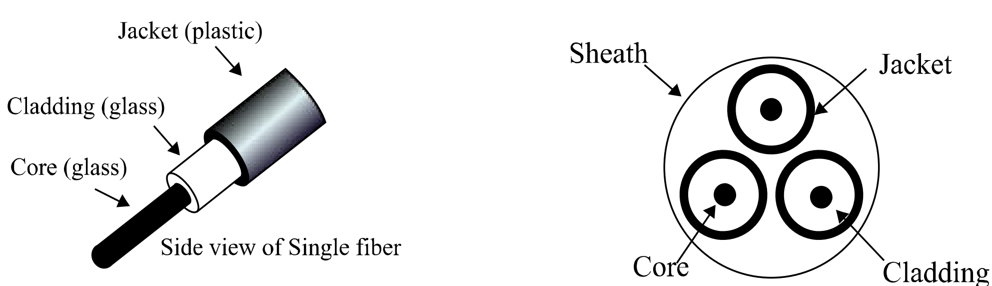

চিত্র-২.১০: ফাইবার অপটিক ক্যাবলের গঠন

অপটিক্যাল ফাইবারের বৈশিষ্ট্য হলো

ফাইবার তৈরিতে অন্তরক পদার্থ হিসেবে সিলিকা ও মাল্টি কমপোনেন্ট কাঁচ বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে নেটওয়ার্ক ব্যাকবোনের মাধ্যম হিসেবে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

- অত্যধিক উচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে।
- এটি ইলেক্ট্রিক্যাল সিগনালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।
- অতি স্বচ্ছতা।
- রাসায়নিক সুস্থিরতা বা নিষ্ক্রিয়তা
- এতে আলোকের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।
- শক্তির অপচয় রোধ।
- সহজ প্রক্রিয়াকরণ যোগ্যতা।
- নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন হিসেবে ফাইবার অপটিক ক্যাবল অধিক ব্যবহৃত হয়।

অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধাসমূহ

বিভিন্ন ধরনের সুবিধার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার আজ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো হলো–

চিত্র-২.১১: অপটিক্যাল ফাইবার

- আয়তনে ছোট, ওজনে হালকা ও সহজে পরিবহনযোগ্য।
- সহজে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।
- শক্তির অপচয় কম।
- বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত।
- ডেটা আদান-প্রদান নির্ভুল।
- পরিবেশের তাপ-চাপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সবচেয়ে বেশি।
- বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আলোকসজ্জা, সেন্সর ও ছবি সম্পাদনের কাজ করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবারের অসুবিধাসমূহ হলো

- ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে U আকারে বাঁকানো যায় না।
- অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত দামি।
- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ইনস্টল করা অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে তুলনামূলক কঠিন।

ফাইবারের প্রকারভেদ

ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতিসরাংকের উপর ভিত্তি করে ফাইবারকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index fiber)

খ. গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index fiber)

ক. **স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index fiber):** স্টেপ 'ইনডেক্স ফাইবার কোরের প্রতিসরাংক সর্বত্র সমান থাকে এবং ব্যাস বেশি।

খ. **গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index fiber):** গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার কোরের প্রতিসরাংক কেন্দ্রে সবচাইতে বেশি এবং এটির ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে।

কোরের ব্যাস অনুযায়ী ফাইবার অপটিককে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. মাল্টিমোড ফাইবার (Multimode Fiber)

২. সিঙ্গেলমোড ফাইবার (Singlemode Fiber)

অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন ব্যবস্থা

অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন ব্যবস্থা বেশ সহজ এবং অনেকটা টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মতো। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা তিনটি মূল অংশ নিয়ে সংগঠিত। যথা:

ক. প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটার

খ. প্রেরণ মাধ্যম এবং

গ. গ্রাহক যন্ত্র।

প্রেরক যন্ত্র উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ফাইবারের মাধ্যমে তা গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়। ফাইবারের মাধ্যমে যেসব ডেটা পাঠানো হয় তা সাধারণত অ্যানালগ সিগন্যাল অথবা ডিজিটাল সিগন্যাল হয়ে থাকে। ফাইবার সরাসরি এ ধরনের ডেটা পরিবহনে সক্ষম নয়। প্রেরক যন্ত্র অ্যানালগ সিগন্যাল অথবা ডিজিটাল সিগন্যালকে প্রয়োজনীয় মডুলেশনের মাধ্যমে ফাইবারের মধ্য দিয়ে ট্রান্সমিশনের উপযোগী আলোক তরঙ্গে পরিণত করে। ডেটাকে আলোক তরঙ্গে রূপান্তরের পর যন্ত্র তা ফাইবারের মধ্যে নিক্ষেপ করে। প্রেরক যন্ত্র মডুলেটর এবং আলোক উৎসের (লেসার বা লাইট ইমিটিং ডায়োড ইত্যাদি) মাধ্যমে একাজ সম্পন্ন করে।

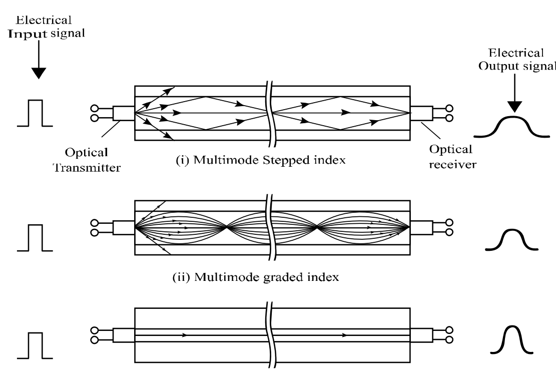

চিত্র-২.১২: অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন ব্যবস্থা

অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। এভাবে প্রতিফলিত রশ্মি সবশেষে গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়। গ্রাহক যন্ত্রে মূলত দুটি অংশ থাকে। যথা:

(ক) ফটো ডিটেকটর ও (খ) প্রসেসিং ইউনিট।

ফটো ডিটেকটরের কাজ হলো ফাইবার থেকে ডেটা উদ্ধার করা (Detection)। প্রসেসিং ইউনিটে ডেটাকে অ্যাম্পলিফিকেশন, ফিল্টারেশন ও ডিমডুলেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়।

তারবিহীন বা ওয়্যারলেস মাধ্যম (Wireless medium)

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো এমন এক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য কোনো প্রকার ক্যাবল বা তারের প্রয়োজন হয় না। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে রেডিও ওয়েভ এর মাধ্যমে প্রেরক যন্ত্র এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে বা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলই ডেটা চলাচলের ফিজিক্যাল পথ হিসেবে কাজ করে। যখন ডেটা চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা থাকে এবং তারযুক্ত মাধ্যম স্থাপনে সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন ওয়্যারলেস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। তারবিহীন মাধ্যম তিন ধরনের। যথা:

১. রেডিও ওয়েভ (Radio Wave)
২. মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
৩. স্যাটেলাইট (Satellite)

২.২.৪ রেডিও ওয়েভ (Radio Wave)

রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে অনেক দূর থেকে ডেটা প্রেরণ করা যায়। একারণে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। রেডিও ওয়েভ সহজে তৈরি করা যায়। এটি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে এবং দালানকোঠা পর্যন্ত ভেদ করতে পারে। এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংকেত প্রেরণের গতিবেগ ২৪ কিলোবিট পার সেকেন্ড। রেডিও ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি ১০ কিলোহার্টজ থেকে ১ গিগাহার্টজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১০ কিলোহার্টজ থেকে ১ গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রামকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ।

চিত্র-২.১৩: রেডিও ওয়েভ

রেডিও ওয়েভ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা:

- **কম শক্তির একক ফ্রিকোয়েন্সি (Low Power Single Frequency):** এ ধরনের রেডিও ওয়েভ শুধু একটি ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। এটি ন্যারো ব্যান্ড নামেও পরিচিত। এর ট্রান্সমিশন সিস্টেমের খরচ তুলনামূলকভাবে কম। ট্রান্সমিশন গতি ১ থেকে ১০ এমবিপিএস (Mbps)।
- **উচ্চ শক্তির একক ফ্রিকোয়েন্সি (High Power Single Frequency):** এ ধরনের রেডিও ওয়েভ কম শক্তির একক ফ্রিকোয়েন্সি শ্রেণির রেডিও ওয়েভের চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা ভেদ করতে পারে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন হবার কারণে দূরত্ব অতিক্রমের সাথে সাথে সিগন্যালের মানের অবনতি খুব একটা হয় না। রিপিটার ব্যবহারের মাধ্যমে সিগন্যালের আওতাভুক্ত সীমানা বাড়ানো যায়। ট্রান্সমিশন গতি ১ থেকে ১০ এমবিপিএস (Mbps)।
- **বিস্তৃত স্প্রেকট্রাম (Spread Spectrum):** এ সিস্টেমে একক ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সীমা বা রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সির মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যাল পাঠানো হয়। যে পদ্ধতিতে সিগন্যালকে কোডিং (Coding) করা হয় তাকে বলা হয় চিপস (Chips)। এ কোডিং প্রযুক্তির মাধ্যমে সিগন্যালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

২. মাইক্রোওয়েভ (Microwave)

তার বা ক্যাবল ছাড়া ডেটা আদান-প্রদানের পদ্ধতি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ। মাইক্রোওয়েভ এক ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যা সেকেন্ডে প্রায় ১ গিগা বা তার চেয়ে বেশিবার কম্পন বিশিষ্ট। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে প্রেরক ও গ্রাহক কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। মাইক্রোওয়েভ সংযোগ ব্যবহার করে ডেটা, ছবি, শব্দ স্থানান্তর করা সম্ভব। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার (Transceiver) নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Transmit) এবং অন্যটি রিসিভ (Receive) করার কাজে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ হচ্ছে ৩০০ MHz–৩০GHz। মাইক্রোওয়েভের এন্টিনা বড় কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং পথে কোনো বস্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

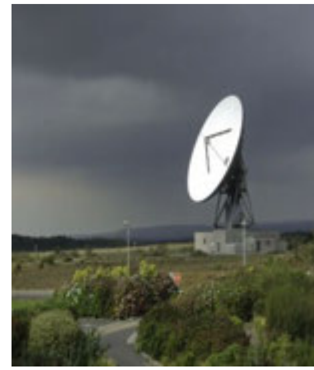

চিত্র-২.১৪: মাইক্রোওয়েভ

মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্য–

ক. মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।
খ. মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সসিভার (Transceiver) নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Transmit) এবং অন্যটি রিসিভ (Receive) করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
গ. মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
ঘ. মাইক্রোওয়েভের এন্টিনা বড় কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

মাইক্রোওয়েভ দুধরনের। যথা:

১. টেরেস্ট্রিয়াল (Terrestrial) মাইক্রোওয়েভ
২. স্যাটেলাইট (Satellite) মাইক্রোওয়েভ

১. টেরেস্ট্রিয়াল (Terrestrial) মাইক্রোওয়েভ

এ ধরনের প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। এতে মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি সীমার নিচের দিকে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার দৃষ্টিরেখায় যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগন্যাল কোনো ক্রমেই মধ্যবর্তী কোনো বাধা (যেমন- উচ্চ ভবন) অতিক্রম করতে পারে না বা বক্রপথ অতিক্রম করে না।

২. স্যাটেলাইট (Satellite) মাইক্রোওয়েভ

সাধারণত কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট বলতে একটি বস্তু অন্য আরেকটি বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করাকে বুঝায়। যেমন-চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট হচ্ছে পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে এমন স্থানে রকেট দ্বারা স্থাপিত বিশেষ ধরনের তারবিহীন রিসিভার/ ট্রান্সমিটার। বর্তমানে শত শত স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ প্রযুক্তিতে যোগাযোগ উপগ্রহের সহায়তা নিতে হয়। এতে পৃথিবী থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার উপরে জিওসিনক্রোনাস কক্ষে যোগাযোগ স্যাটেলাইট পৃথিবীর সমান গতিতে ঘুরতে থাকে। এ স্যাটেলাইটের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে যে রিসিভিং এন্টিনা ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে প্যারাবলিক। প্রেরক যন্ত্র সেকেন্ডে প্রায় ৬০০ কোটি বা তার কাছাকাছি বার কম্পনবিশিষ্ট মাইক্রোওয়েভ সংকেত উপগ্রহে পাঠায়। উপগ্রহে পৌঁছানোর পর এ সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। উপগ্রহে অনেকগুলো ট্রান্সপোন্ডার থাকে। এ ট্রান্সপোন্ডার ক্ষীণ সংকেতকে রিলে করে ৪০০ কোটি বার কম্পনবিশিষ্ট সংকেতে পরিণত করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে ফেরত পাঠায়।
স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ঐসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে সাধারণ ক্যাবলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যেসব দেশের মধ্যে সমুদ্র বা বিশালাকার পাহাড় অবস্থিত তাদেরকে নেটওয়ার্কভুক্ত করতে স্যাটেলাইটের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া একটি মাত্র স্যাটেলাইট ব্যবহার করে একই সময়ে অনেকগুলো দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

২.৩ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communication System)

বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর বা তারের পরিবর্তে বা বিনা তারে নির্দিষ্ট দূরত্বে তথ্যের স্থানান্তর করার পদ্ধতি। ওয়্যারলেস শব্দের অর্থ হলো তারবিহীন। কোনো প্রকার তার ব্যবহার না করেই তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন কখনও কম দূরত্বে আবার কখনও হাজার হাজার মাইল দূরত্বে হতে পারে। অধিক দূরবর্তী স্থানে যেখানে স্বাভাবিক তার ব্যবহার করে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না সেখানে ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে সহজে যোগাযোগ করা যায়। এর সাহায্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বিভিন্নভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

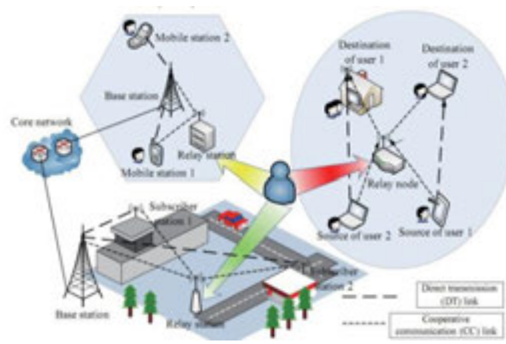

চিত্র-২.১৫: ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন

যেমন–মোবাইল ও টেলিফোনে কথা বলা, টেক্সট ম্যাসেজিং, চ্যাটিং ইত্যাদি কাজ খুব সহজেই করা যায়।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম তারের সাহায্য ছাড়া তথ্য স্থানান্তর করতে বিভিন্ন ধরনের শক্তি যেমন- রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (Radio Frequency-RF), শব্দশক্তি (Acoustic Energy) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় দূরত্বেই তথ্য স্থানান্তর করা যায়।

নিম্নলিখিত মাধ্যমে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সম্পন্ন হয়:

- রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কমিউনিকেশন।
- মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন। যেমন- শর্ট–রেঞ্জ কমিউনিকেশন।
- ইনফ্রারেড (Infrared-IR) শর্ট-রেঞ্জ কমিউনিকেশন।
  যেমন- রিমোট কন্ট্রোল (Remote Control)।

২.৩.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা–

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস প্রযুক্তি প্রয়োজন হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষেত্র হচ্ছে:

- **সিকিউরিটি সিস্টেম:** বিভিন্ন অফিস-আদালত বা বাসা বাড়ির নিরাপত্তার জন্য ওয়্যারলেস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
- **টেলিভিশন রিমোট কন্ট্রোল:** বর্তমানে টেলিভিশনগুলোর ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল প্রয়োজন হয়।
- **সেলুলার টেলিফোন:** বর্তমানে সেলুলার টেলিফোন ও মডেমসমূহে ওয়্যারলেস প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে সেলুলার টেলিফোন পরিচালনা করা হয়।
- **ওয়াই-ফাই:** ওয়াই-ফাই হলো স্বল্প পরিসরের একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক যা বহনযোগ্য কম্পিউটিং ডিভাইসগুলোকে (যেমন- ল্যাপটপ, মোবাইল) খুব সহজেই ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করতে পারে।
- **ওয়্যারলেস এনার্জি ট্রান্সফার:** এটি সম্পূর্ণ তারবিহীন। ওয়্যারলেস এনার্জি ট্রান্সফার এর সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি একটি শক্তি উৎস হতে একটি বৈদ্যুতিক লোডে ট্রান্সমিট হয়।
- **কম্পিউটার ইন্টারফেস ডিভাইস:** বর্তমানে কম্পিউটার ডিভাইস যেমন- কী-বোর্ড, মাউস ওয়্যারলেস সুবিধা পাওয়া যায়। বর্তমানে কম্পিউটার ডিভাইসগুলোতে ব্লুটুথ প্রযুক্তির সুবিধা পাওয়া যায়। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তিতে ওয়াইফাই ডিভাইসসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২.৩.২ ব্লুটুথ (Bluetooth)

ব্লুটুথ হচ্ছে তারবিহীন স্বল্প দূরত্বে ডেটা অদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রোপায়েটারি ওপেন ওয়্যারলেস প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে একটি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) সৃষ্টি হয় যেখানে উচুঁ মানের নিরাপত্তা বজায় থাকে। এর দূরত্ব সাধারণত ১০ থেকে ১০০ মিটার হয়ে থাকে। বিভিন্ন ডিভাইসে USB পোর্টের মাধ্যমে ব্লুটুথ সংযোগ দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালে টেলিকম ভেন্ডর এরিকসন ব্লুটুথ উদ্ভাবন করে। দশম শতাব্দির ডেনমার্কের রাজা হারাল্ড ব্লুটুথ এর নাম অনুসারে এ প্রযুক্তিটির নাম রাখা হয়েছে ব্লুটুথ। বর্তমানে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ল্যাপটপ, ট্যাব, পিডিএ, স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, মেডিক্যাল ডিভাইস এবং বাসাবাড়ির বিনোদন ক্ষেত্রের অনেক ডিভাইসে ব্লুটুথ প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ডিভাইসগুলোকে সংযুক্ত করতে এখন আর ক্যাবল সংযোগের প্রয়োজন পড়ছে না। বহনযোগ্য ও ভ্রাম্যমাণ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এধরনের যোগাযোগ সহজ হয়। এর ডেটা ট্রান্সফার রেট প্রায় ১ মেগাবিট/সেকেন্ড বা তারচেয়ে বেশি।

চিত্র-২.১৬: ব-টুথ

ব্লুটুথের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bluetooth)

১. স্বল্প দূরত্বে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে।
২. ব্লুটুথ ২.৪ গিগাহার্টজ (GHz) ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।
৩. ১০-১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থানকারী ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
৪. ব্লুটুথ একটি পিকো-নেট এর আওতায় সর্বোচ্চ ৮টি যন্ত্রের সাথে সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে পারে।
৫. মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ভিডিও গেম কনসোলগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করতে এবং তথ্য বিনিময় করতে ব্লুটুথ একটি নিরাপদ উপায়ে সরবরাহ করে থাকে।
৬. ব্লুটুথ ব্যবহারকারীর মধ্যস্থতা ছাড়াই অটো কনফিগার করতে পারে।

ব্লুটুথের ব্যবহার (Application of Bluetooth)

১. ফোনের সাথে হ্যান্ডস ফ্রি হেডসেটের সংযোগ সাউন্ড বা ভয়েস ডেটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
২. ফোন থেকে কম্পিউটারের ফাইল স্থানান্তরে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
৩. ব্লুটুথ ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ডিভাইসের সংযোগ ঘটানো যায় এবং তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৪. পিসির ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসগুলোর সাথে তারবিহীন যোগাযোগে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
৫. জিপিএস রিসিভার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, বারকোড স্ক্যানার ও ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোতে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।

চিত্র-২.১৭: ব-ুটুথ

৬. ডেডিকেটেড টেলিহেলথ ডিভাইসগুলোতে হেলথ সেন্সর ডেটাগুলোর শর্ট রেঞ্জ ট্রান্সমিশনে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
৭. প্রায়ই ইনফ্রারেড ব্যবহৃত হয় এমন স্থানে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।

২.৩.৩ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)

Wi-Fi শব্দটি Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি তারবিহীন নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা উচ্চ গতির ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক সংযোগসমূহ সরবরাহের জন্য বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোকে তারবিহীন উপায়ে সংযুক্ত করার একটি কৌশল হলো ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)। এটি ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WLAN) এর জন্য IEEE(Institute of Electrical & Electronics Engineers) 802.11 প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড। এর এরিয়া একটি কক্ষ, একটি ভবন কিংবা কয়েক কি.মি. এলাকা জুড়ে হতে পারে।

চিত্র-২.১৮: ওয়াই-ফাই

সাধারণত ইনডোরের ক্ষেত্রে এ দূরত্ব ৩২ মিটার এবং আউটডোরের ক্ষেত্রে ৯৫ মিটারের মতো হয়ে থাকে। ওয়াই-ফাই এনাবল্ড কোনো ডিভাইস যেমন- একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, ভিডিও গেম কনসোল, স্মার্টফোন কিংবা ডিজিটাল অডিও প্লেয়ার প্রভৃতি একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস পয়েন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে।

ওয়াই-ফাই এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Wi-Fi)

- এটি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WLAN)
- Wi-Fi প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া যায়।
- ওয়াই-ফাই এর কভারেজ সীমিত পরিসর থেকে নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে পাওয়া সম্ভব।
- Wi-Fi প্রযুক্তির সাহায্যে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়।
- কভারেজ এরিয়া সাধারণত ইনডোরের ক্ষেত্রে ৩২ মিটার এবং আউটডোরের ক্ষেত্রে ৯৫ মিটারের মতো হয়ে থাকে।
- নেটওয়ার্কে সহজে নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- একাধিক অ্যাক্সেস পয়েন্টের জন্য নেটওয়ার্ক রোমিং সুবিধা রয়েছে।
- 802.11b ও 802.11g স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং সুবিধা প্রদান করে।

ওয়াই-ফাই এর সুবিধা (Advantages of Wi-Fi)

- Wi-Fi প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া যায়।
- নেটওয়ার্কের জন্য কোনো লাইসেন্স বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।
- নেটওয়ার্কে সহজে নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- বাধামুক্ত সিগন্যাল ট্রান্সফারের জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যানক্রিপশন সুবিধা দিয়ে থাকে।
- একাধিক অ্যাক্সেস পয়েন্টের জন্য নেটওয়ার্ক রোমিং সুবিধা রয়েছে।
- 802.11b এবং 802.11g স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং সুবিধা প্রদান করে।
- ওয়াই-ফাই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের তুলনায় তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়।

ওয়াই-ফাই এর অসুবিধা (Disadvantages of Wi-Fi)

- Wi-Fi নেটওয়ার্কের সীমানা নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।
- নেটওয়ার্কের দক্ষতা ও গতি তুলনামূলকভাবে কম।
- বিদ্যুৎ খরচ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশি।
- অন্যান্য ডিভাইস কর্তৃক সিগন্যালে জ্যাম বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।
- ডেটা ও নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে যায়।
- দূরত্ব বেশি হলে নেটওয়ার্কের গতি ও সিগন্যালের গুণগত মান উল্লেখযোগ্যহারে কমে যেতে পারে।
- অজ্ঞাত বা অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক অ্যাক্সেস পয়েন্ট ব্যবহারের ঝুঁকি থাকে।

২.৩.৪ ওয়াইম্যাক্স (WiMAX)

WiMAX এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Worldwide Interoperability for Microwave Access। ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা, তারবিহীন ব্যবস্থায় বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ পাওয়া যায়। ১৯৯৮ সালে IEEE 802.16 গ্রুপ ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (WMAN) এর জন্য মানটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটি অপেক্ষাকৃত অধিক মানসম্মত ও অধিক নিরাপত্তা সুবিধা সংবলিত ওয়্যারলেস প্রটোকল। এ প্রটোকলের ডেটা ট্রান্সমিশন রেট ৭০ মেগাবিট/ সেকেন্ড।

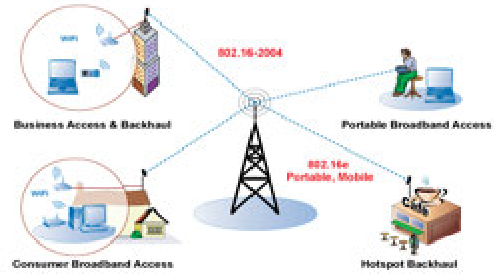

চিত্র-২.১৯: ওয়াইম্যাক্স

WiMAX এর প্রধান দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে WiMAX এর বেস স্টেশন যা ইনডোর ও আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। অন্যটি হচ্ছে এন্টিনাসহ WiMAX রিসিভার, যা কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপে সংযুক্ত থাকে। একটি WiMAX বেস স্টেশন সাধারণত ১০ কিমি হতে শুরু করে ৬০ কিমি পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সুবিধা দিয়ে থাকে।

ওয়াইম্যাক্স নামটি দিয়েছে ওয়াইম্যাক্স ফোরাম যা গঠিত হয়েছিল ২০০১ সালের জুনে। ওয়াইম্যাক্স ডিএসএল সেবাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ইউনিভার্সাল ইন্টারনেট অ্যাকসেসের সুযোগ করে দিয়েছে।

ওয়াইম্যাক্সের প্রকারভেদ: ওয়াইম্যাক্স দুধরনের হতে পারে। যথা:

১. ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স এবং ২. মোবাইল ওয়াইম্যাক্স।

১. **ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স:** ফিক্সড ওয়াইম্যাক্সে মূল্যসাশ্রয়ী পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট এবং পয়েন্ট-টু-মাল্টিপয়েন্ট সল্যুশন পাওয়া যায়।

২. **মোবাইল ওয়াইম্যাক্স:** মোবাইল ওয়াইম্যাক্সে যেকোনো ধরনের টেলিযোগাযোগকে মোবাইল ডিভাইসে ব্যবহার উপযোগী করে। মোবাইল ওয়াইম্যাক্স ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে সেলফোনের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে আরও বিশাল পরিসরে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়।

ওয়াইম্যাক্স এর সুবিধা (Advantages of WiMAX)

১. কভারেজ এরিয়া সাধারণত ১০ কিমি হতে শুরু করে ৬০ কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২. একক একটি স্টেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট সেবা দেয়া যায়।

৩. ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড লাইসেন্স বা লাইসেন্সবিহীন উভয়ই হতে পারে।

৪. প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেবা পাওয়া যায়; এমনকি যেখানে ফোনের সংযোগ পৌঁছেনি সেখানেও।

৫. কোয়ালিটি অব সার্ভিসের নিশ্চয়তা দেয়।

৬. তথ্য ও টেলিযোগাযোগ সেবাগুলো প্রদান করা যায়।

৭. এন্টিনাসহ WiMAX রিসিভার, যা কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপে সংযুক্ত থাকে।

ওয়াইম্যাক্স এর অসুবিধা (Disadvantages of WiMAX)

১. দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।
২. নেটওয়ার্কের অন্যান্য ওয়্যারলেস ডিভাইস সিগন্যালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।
৩. সংস্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
৪. অনেক ব্যবহারকারী একই টাওয়ার অ্যাক্সেস করায় সার্ভিসের সঠিক গুণগত মান বজায় রাখা অনেকক্ষেত্রে কঠিন।
৫. অন্যান্য নেটওয়ার্ক যেমন- ফাইবার অপটিক, স্যাটেলাইট, ক্যাবল ইত্যাদির সাথে তুলনা করলে ওয়াইম্যাক্স এর ডেটা রেট অত্যন্ত ধীরগতির।
৬. খারাপ আবহাওয়া যেমন বৃষ্টির কারণে এর সিগন্যালে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
৭. বেশি বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারকারী প্রযুক্তি যার ফলে সার্বিক নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

কাজ: ওয়াই-ফাই এবং ওয়াইম্যাক্স এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

২.৪ মোবাইল টেলিফোন সিস্টেমের বিভিন্ন প্রজন্ম

বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির যুগে মোবাইল ফোন একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ১৯৪০ সালের দিকে যুক্তরাষ্টে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন সার্ভিস চালু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের শুরুতে ইউরোপে মোবাইল সার্ভিস চালু হয়। ১৯৭৩ সালে সাধারণত মানুষের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও উন্নয়নের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম বলে। মোবাইল ফোন প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে মোবাইল ফোন আবিষ্কারের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চারটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১. প্রথম প্রজন্ম (First Generation-1G)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation- 2G)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation-3G)
৪. চতুর্থ প্রজন্ম (Fourth Generation-4G)

১. প্রথম প্রজন্ম (First Generation-1G)

প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোনগুলো ছিল সেলুলার নেটওয়ার্ক নির্ভর এবং অ্যানালগ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে সেনাবাহিনীর বাহিরে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে বাণিজ্যিকভাবে সাধারণত মানুষের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। সে জন্য ১৯৭৯ সালকে ১ম প্রজন্মের মোবাইল ফোনের সূচনা কাল বলা হয়। ১৯৭৯ সালে এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি জাপানের NTTC (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) সেলুলার টেলিফোন উৎপাদন শুরু করে। ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকোতে সেলুলার টেলিফোনের কিছু কিছু ব্যবহার শুরু হয়।

চিত্র-২.২০: **1G** মোবাইল

১৯৮১ সালে NMT (Nordic Mobile Telephone) কর্তৃক ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধাসহ ১ম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্কের ২য় যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে উত্তর আমেরিকায় বাণিজ্যিকভাবে প্রথম প্রজন্ম মোবাইল ফোন চালু করা হয় যার নাম ছিল AMPS (Advanced Mobile Phone System)। AMPS এনালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করত।

প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য :

- নেটওয়ার্কে রেডিও সিগন্যাল হিসেবে অ্যানালগ সিস্টেমের ব্যবহার।
- নেটওয়ার্কে NMT (Nordic Mobile Telephone) স্ট্যান্ডার্ড।
- চ্যানেল অ্যাক্সেস পদ্ধতি FDMA (Frequency Division Multiple Access)।
- মোবাইল ফোনসমূহ আকারে ছোট এবং ওজনে হালকা।
- সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলকভাবে কম।
- কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- এতে মাইক্রোপ্রসেসর এবং সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
- অপেক্ষাকৃত কম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ব্যবহার।

উদাহরণঃ এডভান্সড মোবাইল ফোন সিস্টেম (Advanced Mobile Phone System-AMPS), নর্ডিক মোবাইল টেলিফোন (Nordic Mobile Telephone), টোটাল একসেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Total Access Communication System- TACS) ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation-2G)

প্রথম প্রজন্মের অ্যানালগ সিস্টেমের মোবাইল ফোনের পরিবর্তে দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেম চালু হয়। ১৯৯০ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ট্রান্সমিশন কোয়ালিটি, সিস্টেম ক্যাপাসিটি এবং বিশাল এলাকা জুড়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেম চালু করা হয়। ভয়েসকে Noise মুক্ত করার মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্ম মোবাইল ফোনের আবির্ভাব ঘটে। এটি ভয়েস ট্রান্সমিট করে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে। ১৯৯১ সালে ফিনল্যান্ডে সর্বপ্রথম GSM নেটওয়ার্ক Radiolinja চালু হয়। ১৯৯২ সালে যুক্তরাজ্যে মেশিন নিয়ন্ত্রিত এবং ১৯৯৩ সালে ফিনল্যান্ডে Person to Person SMS টেক্সট ম্যাসেজ সার্ভিস চালু হয়। ফিনল্যান্ডে ২০০০ সালে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহার করে দৈনিক নিউজ হেডলাইন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

চিত্র-২.২১: 2G মোবাইল

দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য–

- ডিজিটাল পদ্ধতির রেডিও সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
- চ্যানেল অ্যাক্সেস পদ্ধতি TDMA, FDMA এবং CDMA।
- সীমিতমাত্রায় আর্ন্তজাতিক রোমিং সুবিধা চালু হয়।
- GSM পদ্ধতিতে ডেটা এবং ভয়েস প্রেরণ করা সম্ভব হয়।
- ডেটা স্থানান্তর করার গতি অনেক বেশি।
- কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন অবিচ্ছিন্ন থাকে।
- সর্বপ্রথম প্রিপেইড পদ্ধতি চালু হয়।
- এমএমএস (MMS-Multimedia Message Service) এবং এসএমএস (SMS-Short Message Service) সার্ভিস চালু হয়।

উদাহরণ: জিএসএম ৯০০, জিএসএম-আর, জিএসএম ১৮০০, জিএসএম ১৯০০, জিএসএম ৪০০, Digital AMPS (D-AMPS), CDMA ইত্যাদি।

৩. তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation-3G)

দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে তৃতীয় প্রজন্মের প্রধান প্রযুক্তিগত পার্থক্য হচ্ছে সার্কিট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে তৃতীয় প্রজন্মে প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের ব্যবহার। ২০০১ সালের মে মাসে জাপানের টোকিও এলাকায় NTT ডোকোমো চালু করে প্রথম অ-বাণিজ্যিক ও পরীক্ষামূলক 3G নেটওয়ার্ক। এ প্রজন্মেই আধুনিক মোবাইল টেকনোলজি HSPA (High Speed Packet Access) এর বাস্তবায়ন করা হয়। W-CDMA পদ্ধতি বর্তমানে UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) নামে পরিচিত। তৃতীয় প্রজন্মে উচ্চ গতির ডেটা ট্রান্সফার ও মাল্টিমিডিয়া ডেটা ব্যবহারসহ CDMA ও GPRS (General Packet Radio Service) স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ফলে সর্বাধিক ডেটা ট্রান্সফারের মোবাইল টেকনোলজি EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) চালু হয়।

চিত্র-২.২২: 3G মোবাইল

২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে WCDMA এর প্রতিদ্বন্দ্বী EV-DO টেকনোলজি চালু হলেও ২০০২ সালের শেষ দিকে জাপানে এবং ২০০৩ সালে ইতালি ও যুক্তরাজ্যে WCDMA টেকনোলজি ব্যবহারের প্রসার বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালে ৩য় প্রজন্মের নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী ২৯৫ মিলিয়নে দাঁড়ায়, যা ছিল মোট মোবাইল ব্যবহারকারীর ৯% মাত্র। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহারকারী WCDMA টেকনোলজি এবং এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহারকারী EV-DO স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করতো।

তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য:

- প্যাকেট সুইচিং ও সার্কিট সুইচিং উভয় পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন।
- মডেম সংযোজনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের ব্যবহার।
- রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি W-CDMA এবং UMTS স্ট্যান্ডার্ড।
- EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) পদ্ধতি কার্যকর হয়। ফলে অধিক পরিমাণ ডেটা স্থানান্তর সম্ভব হয়।
- ডেটা স্থানান্তর উচ্চগতি সম্পন্ন। ডেটা রেট ২ এমবিপিএস এর অধিক।
- মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম চালু সম্ভব হয়।
- এক্ষেত্রে GSM, EDGE, UTMS এবং CDMA প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
- আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা।
- চ্যানেল অ্যাকসেস বা সেল সিগন্যাল পদ্ধতি হলো TD-SCDMA এবং TD-CDMA।

তৃতীয় প্রজন্ম মোবাইল ফোনের সুবিধাসমূহ:

১. সবসময় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া থাকে, আলাদা করে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।
২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভয়েস এবং ডেটা স্থানান্তরিত হয়।
৩. যেকোনো সময় ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়; ইন্টারনেটে গেম খেলা এবং গেম ডাউনলোড করা যায়।
৪. ভিডিও কনফারেন্স (Video Conferance) করা যায়।
৫. গান শোনা, টিভি ও সিনেমা দেখা এবং চাহিদা অনুযায়ী ডাউনলোড করা যায়।
৬. বিকল্প পদ্ধতিতে বিল প্রদান সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা যায়।

উদাহরণ: UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), IMT (International Mobile Telecommunication)-2000, MC- CDMA, TD-SCDMA, EDGE, HSPA ইত্যাদি।

৪. চতুর্থ প্রজন্ম (Fourth Generation-4G)

আগামি দিনের মোবাইল ফোন সিস্টেম হলো চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন সিস্টেম। এ প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সার্কিট সুইচিং বা প্যাকেট সুইচিংয়ের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার। ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহারের ফলে মোবাইল টেলিফোন সিস্টেম (IP) ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন সিস্টেমে আলট্রা-ব্রডব্যান্ড গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে। দ্রুত চলনশীল ডিভাইসের ক্ষেত্রে এর ডেটা স্থানান্তর গতি ১০০ মেগাবিট/ সেকেন্ড এবং স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে এর ডেটা স্থানান্তর গতি ১ গেগাবিট/ সেকেন্ড। উদাহরণস্বরূপ, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এবং অন্যান্য মোবাইল ডিভাইসের সাথে ইউএসবি ওয়্যারলেস মডেম। চতুর্থ প্রজন্মে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে WiMAX, Flash-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১০ সালের শুরুর দিকে ওয়ারলেস ইন্টারনেট সুবিধাসহ Amazon Kindle, Nook নামে বিভিন্ন ই-রিডার (E-reader) বাজারে আসে। সর্বশেষ ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধাসহ অ্যাপেল কোম্পানির iPAD নামক টেবলেট ডিভাইস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

চিত্র-২.২৩: 4G মোবাইল

চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য:

- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্যাকেট ডেটা ট্রান্সমিশন।
- উচ্চ গতিসম্পন্ন ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সার্ভিস।
- উচ্চ গতির ফ্রিকোয়েন্সি।
- ওয়ারলেস ইন্টারনেট সুবিধাসহ iPAD নামক টেবলেট ডিভাইসের ব্যবহার।
- USB পোর্টের মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
- ত্রি-মাত্রিক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

২.৫ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা (Concept of Computer Network)

বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রসার হচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বাধুনিক ব্যবহার। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে নিজেদের কাজের সুবিধার্থে নিজস্ব কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে বুঝায় দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা। অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পিউটার কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা একসঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে বলে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা হলো অনেকগুলো কম্পিউটার পরস্পর যুক্ত থাকায় দু-একটি খারাপ হয়ে গেলেও সব কাজ বন্ধ হয়ে যায় না, ভালোগুলো দিয়ে সে কাজ করিয়ে নেয়া যায়।

২.৫.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ব্যবহার/উদ্দেশ্য (Use of Computer Network)

১. ফাইল বা তথ্য বিনিময় (File or Information Sharing)
২. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং (Hardware Resource Sharing)
৩. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং (Software Resource Sharing)
৪. তথ্য সংরক্ষণ (Information Preservation)
৫. তথ্য সুরক্ষা (Information Protection)
৬. বার্তা বা মেসেজ আদান-প্রদান (Exchanging Message)

২.৫.২ নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সার্ভিস প্রদানের ধরনের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ–

নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সার্ভিস প্রদানের ধরনের উপর ভিত্তি করে একে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network)
খ. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)
গ. মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

ক. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network)

এক বা একাধিক ডেডিকেটেড সার্ভারের সমন্বয়ে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। এ ডেডিকেটেড সার্ভার ক্লায়েন্ট পিসি'র জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করে। সার্ভিসসমূহের আওতায় প্রধানত যা থাকে তাহলো ফাইল, প্রিন্ট মেসেজ, ডাটাবেজ, এপ্লিকেশন ইত্যাদি।

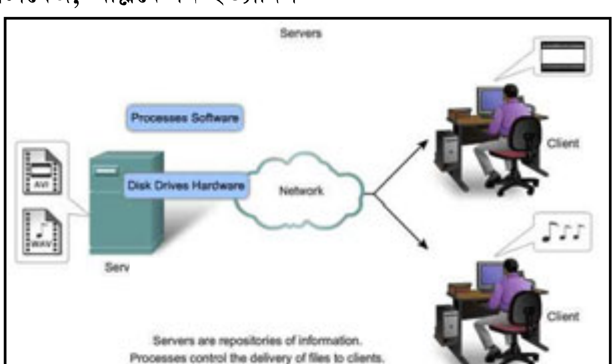

চিত্র: ২.২৪ ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্কের উদাহরণ

খ. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো সার্ভার থাকে না। এ প্রকারের নেটওয়ার্কে প্রতিটি পিসি রিসোর্স (Resource) শেয়ারিং-এর ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে কোনো ডেডিকেটেড সার্ভার থাকে না, ফলে এখানে পিসিগুলোর মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে কোনো শ্রেণিবিন্যাসও নেই। প্রতিটি পৃথক পিসি তার ডাটার নিরাপত্তা বিধানে নিজেই দায়ী থাকে। পিসি'র ব্যবহারকারী এক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দেন তার কোনো ফাইল বা ডেটা নেটওয়ার্কে অন্যান্যদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

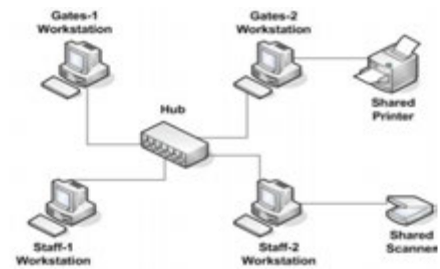

চিত্র-২.২৫: পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক

গ. মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক মূলত ক্লায়েন্ট সার্ভার ও পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কের একটি সমন্বয়। সাধারণত হাইব্রিড নেটওয়ার্কে ক্লায়েন্ট সার্ভার অংশের প্রাধান্য থাকে। তবে এর পাশাপাশি এখানে স্বল্প বিস্তারে পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কের অংশ জোড়া দেয়া হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার বা নোডগুলোকে সরাসরি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত না করে বিশেষ স্থানে স্থাপন করা হয় ও তারপর গতিশীল সংযোগপথ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

আকার ও বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান (Personal Area Network-PAN)
২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান (Local Area Network-LAN)
৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ম্যান (Metropolitan Area Network-MAN)
৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ওয়ান (Wide Area Network-WAN)

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান (Personal Area Network-PAN)

প্যান (PAN) এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Personal Area Network। কোনো ব্যক্তির নিকটবর্তী বিভিন্ন ডিভাইসের (টেলিফোন এবং পার্সোনাল ডিজিটাল এসিসটেন্টস) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে PAN বলে। প্যান ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে অথবা হায়ার লেভেল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটের সাথে যোগাযোগের জন্যও হতে পারে। প্যান এর বিস্তৃতি সাধারণত ১০ মিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। PAN এ ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিভাইস হচ্ছে ল্যাপটপ (Laptop), পিডিএ (PDA) বহনযোগ্য প্রিন্টার, মোবাইল (Mobile) ইত্যাদি। প্যান USB বাস এবং Fireware বাস দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে।

চিত্র-২.২৬: পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

প্যান এর বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of PAN)

১. পার্সোনাল কম্পিউটার ডিভাইসসমূহের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. ব্যাপ্তি সাধারণত কয়েক মিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
৩. কম্পিউটার বাসসমূহ যেমন- ইউএসবি বা ফায়ারওয়্যার এর মাধ্যমে তার দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে।
৪. ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি দ্বারা একটি ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব।

২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান (Local Area Network-LAN)

LAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Local Area Network। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান স্বল্প পরিসরের জায়গার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ১০ কি.মি. বা তার কম পরিসরের জায়গার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার টার্মিনাল বা অন্যকোনো পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন- প্রিন্টার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। বেশির ভাগ LAN ই বিল্ডিং বা দুই তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত বিল্ডিং এর মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো বড় অফিস বিল্ডিংয়ে ব্যবহার করা হয়। LAN এ অবস্থিত প্রতিটি কম্পিউটারই নিজেদের মধ্যে ডেটা, ফাইল, বিভিন্ন দামি ডিভাইস যেমন- স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টার ইত্যাদি শেয়ার করতে পারে। LAN এর টপোলজি সাধারণত স্টার, রিং কিংবা ব্রডকাস্ট চ্যানেল মেথড হয়ে থাকে। এর ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে সাধারণত টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল বা অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়।

চিত্র-২.২৭: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক উদ্ভবের মূল কারণ ছিল-কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, ডেটা স্থানান্তরকরণ, একজনের সিপিইউ অন্যজনে ব্যবহার করতে পারার সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যাবলি–

১. সীমিত দূরত্বের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ।
২. সিরিজ (শ্রেণি) সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত হয়।
৩. উপাত্ত স্থানান্তরের হার সাধারণত ১০ মেগাবিট/সেঃ থেকে ১০০০ মেগাবিট / সেঃ।
৪. এ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজ ও খরচ কম।

৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ম্যান (Metropolitan Are Network-MAN)

MAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Metropolitan Area Network। একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটার এবং ডিভাইস নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে MAN বলে। এটি LAN এর থেকে বড় Area এর নেটওয়ার্ক। যারা ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে সাধারণত টেলিফোন লাইন, মডেম বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়। এর দূরত্ব সাধারণত কোনো শহরভিত্তিক হয়ে থাকে। মাল্টিপাল রাউটার, সুইচ এবং হাব দ্বারা MAN গঠিত। সাধারণত কোনো ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা অফিসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এধরনের নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

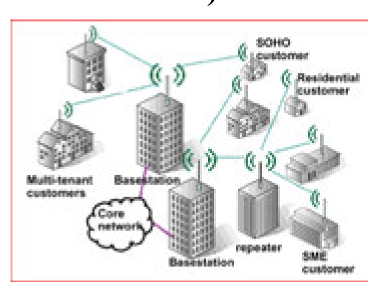

চিত্র-২.২৮: মেট্রোপলিটন এরিয়া

৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ওয়ান (Wide Area Network –WAN)

WAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wide Area Network। যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অনেক বড় ভৌগোলিক অবস্থান জুড়ে থাকে তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। এ নেটওয়ার্ক একটি দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত LAN বা MAN বা অন্য কোনো কম্পিউটার ডিভাইসও এ নেটওয়ার্কের সংযুক্ত থাকতে পারে। তবে ওয়ানের পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে ফিজিক্যাল লাইন, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন এবং মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের উপর। বড় বড় দেশের ক্ষেত্রে যেমন-ভারত, আমেরিকা ইত্যাদি ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে স্যাটেলাইট সিস্টেমও ব্যবহার করা হয়।

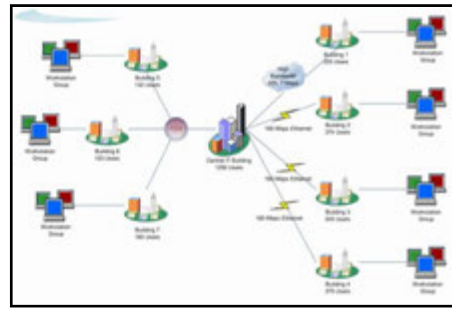

চিত্র-২.২৯: ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় WAN এর উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সুবিধা–

১. বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত উপাত্ত, পত্র-পত্রিকা, বই, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

২. স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের একস্থান থেকে অন্যস্থানে ডেটা এবং সংবাদ পাঠানো যায়।

৩. ইলেকট্রনিক মেইল প্রক্রিয়ায় বিশ্বের যেকোনো স্থানে চিঠিপত্র প্রেরণ করা যায়।

৪. রোগী ঘরে থেকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারবেন।

৫. ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।

৬. অনলাইন শপিং করা যায়।

৭. সমগ্র নেটওয়ার্ক-বিশ্বকে টেবিলে বসে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৮. ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজে না গিয়েও অন লাইনে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে।

২.৫.৩ নেটওয়ার্ক ডিভাইস

সকল নেটওয়ার্ক কতকগুলো মৌলিক উপাদান দ্বারা তৈরি। নেটওয়ার্কের মধ্যে আন্তঃসংযোগের জন্য Modem, Hub, Routers, Gateway,Switches, Network Interface Card (NIC) ইত্যাদি ডিভাইসের সাথে গ্যালভানিক ক্যাবল। যেমন-বহুল ব্যবহৃত Cats Cable, Microwork লিংক (যেমন-IEEE 802.11), অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

নিচে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

মডেম (Modem)

মডেম হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিকস ডিভাইস যা কম্পিউটারের তথ্যকে আরেক কম্পিউটারে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়। মডেম শব্দটি Modulator ও Demodulator সংক্ষিপ্তরূপ। Modulator শব্দের 'Mo' এবং Demodulator শব্দের 'Dem' নিয়ে 'Modem' শব্দটি গঠিত হয়েছে। নেটওয়ার্কিংয়ে তথ্যাবলি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Modulator এর কাজ হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করা এবং Demodulator এর কাজ হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা। প্রেরক কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মডেম কম্পিউটারের ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা গ্রাহকের নিকট ডেটা বা তথ্য প্রেরণ করে। এভাবে টেলিফোন লাইনের উপযোগী করে ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে মডুলেশন (Modulation) বলে। গ্রাহক কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মডেম সেই অ্যানালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিটাল সিগন্যালে পরিণত করে তা কম্পিউটারের ব্যবহারোপযোগী করে। এভাবে টেলিফোন লাইন থেকে প্রাপ্ত অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন (Demodulation) বলে।

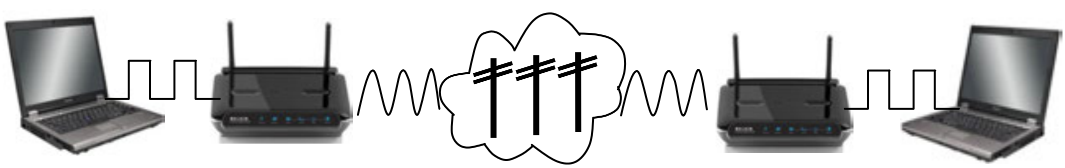

চিত্র-২.৩০: ডেটা প্রেরণে মডেমের ব্যবহার

সংযোগ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে মডেমকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ইন্টারনাল মডেম (Internal Modem)
২. এক্সটারনাল মডেম (External Modem)

ইন্টারনাল মডেম (Internal Modem): ইন্টারনাল মডেম মূলত একটি কার্ড বিশেষ। এ কার্ড পিসির মাদারবোর্ডের এক্সপানশান স্লটে লাগানো থাকে।

এক্সটারনাল মডেম (External Modem): যে মডেম ক্যাবলের সাহায্যে কম্পিউটারের কমিউনিকেশন পোর্টের সাথে বাইরের দিক থেকে সংযুক্ত করা হয় তাকে এক্সটারনাল মডেম বলে।

হাব (Hub):

হাব হলো নেটওয়ার্কের ডিভাইসসমূহের জন্য একটি সাধারণ কানেকশন পয়েন্ট। দুয়ের অধিক পোর্ট যুক্ত রিপিটারকে হাব বলে। হাবের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। কম্পিউটারের সংযোগ সংখ্যার উপর হাবের ক্ষমতা নির্ভর করে। ল্যানের সেগমেন্টগুলো কানেক্ট করার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। হাবের মধ্যে অনেকগুলো পোর্ট থাকে। ডেটা প্যাকেট একটি পোর্টে আসলে এটি অন্য পোর্টে কপি হয় যাতে সব সেগমেন্ট সব প্যাকেটসমূহ দেখতে পারে। স্টার টপোলজির ক্ষেত্রে হাব হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী ডিভাইস।

চিত্র-২.৩১: হাব

কার্যকারিতার দিক থেকে হাব প্রধানত দুপ্রকার। যথা–

১. সক্রিয় হাব (Active Hub)

২. নিষ্ক্রিয় হাব (Passive Hub)

সক্রিয় হাব (Active Hub)

এধরনের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে এবং মূল সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ করে। অধিক ক্ষমতাযুক্ত এ ধরনের হাবকে অনেক সময় Intelligent Hub বলা হয়।

নিষ্ক্রিয় হাব (Passive Hub)

এধরনের হাব কম্পিউটারসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র তথ্য আদান-প্রদান করে। এটি সংকেতের মান বৃদ্ধি করে না। এ কারণে এসব হাবকে কোনো এ্যাকটিভ ডিভাইসের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়।

হাবের সুবিধা (Advantages of Hub)

১. দাম কম।

২. বিভিন্ন মিডিয়ামকে সংযুক্ত করতে পারে।

হাবের অসুবিধা (Disadvantages of Hub)

১. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বৃদ্ধি পায়।

২. ডেটা আদান-প্রদানে বাধার সম্ভাবনা থাকে।

৩. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয় না।

সুইচ (Switch)

সুইচ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা নেটওয়ার্কের মধ্যে সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন এবং বিভিন্ন পেরিফেরিয়াল ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ প্রদানকারী প্রধান ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাবের সাথে সুইচের পার্থক্য হলো সুইচ প্রেরক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটা প্রাপক কম্পিউটারের সুনির্দিষ্ট পোর্টটিতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু হাব ঐ ডেটা সিগন্যাল প্রাপক কম্পিউটারের সবগুলো পোর্টেই পাঠায়।

সুইচের সুবিধা (Advantages of Switch)

১. ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়।

২. ভার্চুয়াল LAN ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সুইচের অসুবিধা (Disadvantages of Switch)

১. হাবের তুলনায় মূল্য কিছুটা বেশি।

২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব নয়।

৩. কনফিগারেশন তুলনামূলকভাবে জটিল।

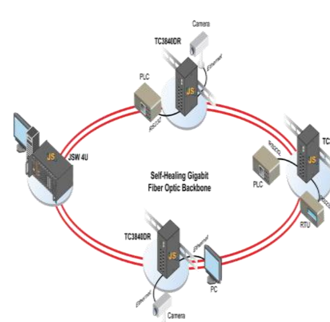

চিত্র-২.৩২: সুইচ

রাউটার (Router)

এটি একটি বুদ্ধিমান ইন্টারনেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস যা লজিক্যাল এড্রেস ব্যবহার করে দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ক সেগমেন্টের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে। রাউটার বিভিন্ন কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে। এটি এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডেটা স্থানান্তর করে। ডেটা উৎস ও গন্তব্যের উপর ভিত্তি করে রাউটার ডেটা স্থানান্তরের জন্য সহজ, নিরাপদ ও কম দূরত্বের পথটি বেছে নেয়। রাউটার উৎস কম্পিউটার থেকে গন্তব্য কম্পিউটারে ডেটা প্যাকেট (ডেটার সমষ্টি) পৌঁছে দেয়।

চিত্র-২.৩৩: রাউটার

রাউটারের সুবিধাসমূহ:

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়।

২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয়।

৩. বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন-ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।

রাউটারের অসুবিধা:

১. রাউটারের দাম বেশি।

২. রাউটার একই প্রোটোকল নেটওয়ার্ক ছাড়া সংযুক্ত হতে পারে না।

৩. কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল।

৪. ধীরগতিসম্পন্ন।

গেটওয়ে (Gateway)

গেটওয়ে ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়। গেটওয়ে একটি নেটওয়ার্ককে আরেকটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে। এটি একটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস যা বিভিন্ন কমিউনিকেশন প্রোটোকল ট্রান্সলেট করে অর্থাৎ এক প্রোটোকলকে অন্য আরেক ধরনের প্রোটোকলের সাথে সংযুক্ত করে।

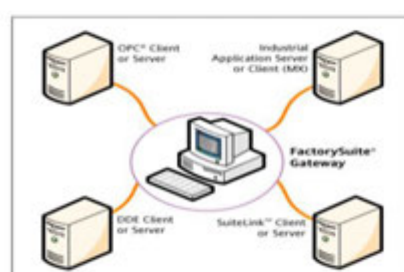

চিত্র-২.৩৪: গেটওয়ে

গেটওয়ের সুবিধাসমূহ (Advantages of Gateway)

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কম।

২. বিভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।

গেটওয়ের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Gateway)

১. এটি ধীর গতিসম্পন্ন।

২. অন্যান্য ডিভাইসের চেয়ে ব্যয়বহুল।

৩. কনফিগারেশন করা তুলনামূলক জটিল।

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (Network Interface Card)

NIC এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Network Interface Card। কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কভুক্ত করার জন্য যে ইন্টারফেস কার্ড ব্যবহার করা হয় তাকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বলে। এ কার্ডকে ল্যান কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ডও বলে। এটি ব্যবহারকারীকে একে অপরের সাথে ক্যাবল অথবা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে। এ কার্ড মাদারবোর্ডের বিভিন্ন আকৃতির স্লটের মধ্যে বসানো থাকে। অধিকাংশ NIC কার্ড কম্পিউটারের সাথে বিল্ট-ইন থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কার্ডের উপর নেটওয়ার্কের দক্ষতা ও গতি নির্ভর করে। নেটওয়ার্ক কার্ডের বৈশিষ্ট্য হলো এতে ৪৮ বিটের একটি অদ্বিতীয় কোড বা ক্রমিক নম্বর থাকে; যার ফলে একটি কার্ডের সাথে অপরটির কোনো মিল থাকে না। এই ক্রমিক নম্বরকে ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস বলে। এই ম্যাক অ্যাড্রেস কার্ডের রমে সংরক্ষিত থাকে। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড পিসি এবং ডেটা কেবলের মধ্যে সিগন্যাল আদান-প্রদানের কাজটি সমন্বয় করে থাকে।

এছাড়াও NIC নিম্নবর্ণিত দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে–

১. ডেটা কেবল এবং কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

২. ডিজিটাল ডেটা সিগন্যালকে লজিক্যাল আকারে অর্থাৎ ১ ও ০ আকারে ক্যাবলের মধ্য দিয়ে আদান-প্রদান করা।

৩. নেটওয়ার্ক ড্রাইভার থেকে তথ্য গ্রহণ করা এবং ড্রাইভার প্রদত্ত নির্দেশাবলি (Instruction) পালন করা।

২.৫.৪ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কাজ

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে খুব সহজে বিশ্বের একস্থান হতে অন্যস্থানে ডাটা বা সংবাদ পাঠানো যায়। এতে সময়ের অপচয় কম হয় এবং খরচও কম লাগে।

২. প্রয়োজনে তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং সময়মতো গ্রাহকের নিকট পাঠানো যায়।

৩. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে ঘরে বসে দূর-দূরান্তের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

৪. ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েই যেকোনো ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে যেকোনো সমস্যার সমাধান নিতে পারে।

৫. ঘরে বসে ক্রেতা কেনা-কাটা করতে পারেন।

৬. ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।

৭. ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণ করা যায়।

২.৫.৫ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)

বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগের জন্য যে জ্যামিতিক সন্নিবেশ করা হয় তাকে টপোলজি (Topology) বলে। অর্থাৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযোগ ব্যবস্থাকেই Topology বলে। নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে তারের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। তবে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলোকে তার দিয়ে যুক্ত করলেই হয় না। তারের ভিতর দিয়ে নির্বিঘ্নে ডেটা যাওয়া-আসার জন্য যুক্তিনির্ভর সুনিয়ন্ত্রিত একটি পথের প্রয়োজন। নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলোকে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করার নকশা এবং সংযোগকারী তারের ভিতর দিয়ে ডেটা যাওয়া-আসার জন্য যুক্তি নির্ভর পথের যে পরিকল্পনা এ দুয়ের সমন্বিত ধারণাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক টপোলজি।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সাধারণত নিম্নলিখিত সংগঠন ব্যবহার করা যায়–

ক. স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি (Star Network Topology)

খ. রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি (Ring Network Topology)

গ. বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি (Bus Network Topology)

ঘ. ট্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি (Tree Network Topology)

ঙ. মেশ টপোলজি (Mesh Topology) বা পরস্পরের সংযুক্ত নেটওয়ার্ক

চ. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক টপোলজি (Hybrid Network Topology)

ক. স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি (Star Network Topology)

স্টার টপোলজি নেটওয়ার্কে সবগুলো কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার (জাংশন) থেকে সংযোগ দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার (জাংশন) হিসাবে যে কম্পিউটারটি ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় হাব (Hub)। স্টার নেটওয়ার্কে প্রত্যেকটি কম্পিউটার একটি হাব (HUB) বা সুইচের (Switch) মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত থাকে। মাইক্রোকম্পিউটারগুলো হাবের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ও ডেটা আদান-প্রদান করে। কোনো কারণে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারটি কর্মদক্ষতা হারালে নেটওয়ার্কটি কর্মদক্ষতা হারায়। কেননা কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ছাড়া কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে কোনো সংযোগ থাকে না।

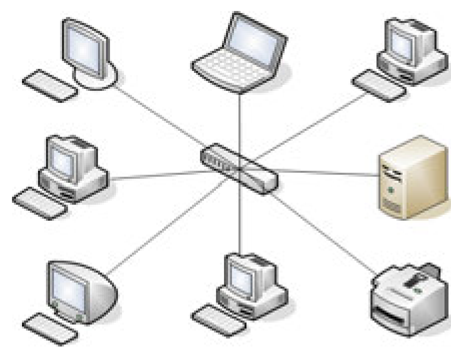

চিত্র-২.৩৫ : স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি

স্টার টপোলজির সুবিধাসমূহ–

১. নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার নষ্ট হলেও নেটওয়ার্কের বাকি অংশের কাজের ব্যাঘাত হয় না।

২. একই নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা যায়।

৩. স্টার নেটওয়ার্কে কোনো কম্পিউটার যোগ করা বা বাদ দেয়া যায়, তাতে কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

৪. কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ বা সমস্যা নিরূপণ সহজ।

স্টার টপোলজির অসুবিধাসমূহ–

১. এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সিস্টেমই অচল হয়ে পড়ে। কারণ পুরো নেটওয়ার্ক হাবের মাধ্যমেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

২. স্টার টপোলজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাবল ব্যবহৃত হয় বিধায় এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

খ. রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি (Ring Network Topology)

রিং টপোলোজি নেটওয়ার্কে সবগুলো কম্পিউটারকে ক্যাবলের মাধ্যমে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে একটি রিং বা লুপের সৃষ্টি হয়। এ টপোলজিতে কোনো শুরু বা শেষ প্রান্ত সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। রিং নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো নোড (কম্পিউটার যে বিন্দুতে যুক্ত থাকে তাকে নোড বলে) এর মাধ্যমে বৃত্তাকার পথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

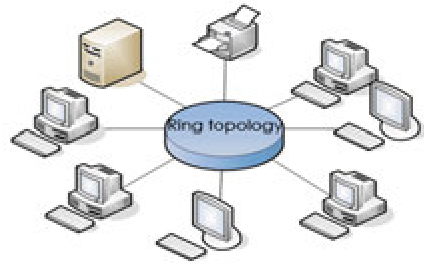

চিত্র-২.৩৬: রিং টপোলোজি

রিং টপোলজি নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলোকে সরাসরি পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে না বিধায় নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার অন্য যেকোনো কম্পিউটারে সরাসরি সংকেত পাঠাতে পারে না। সংকেতটি প্রেরক কম্পিউটার ও গ্রাহক কম্পিউটারের মধ্যবর্তী অন্যসব কম্পিউটারের ভেতর দিয়ে যেয়ে তবেই গ্রাহক কম্পিউটারে পৌঁছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কম্পিউটারকে অবশ্যই সংকেত গ্রহণ ও প্রেরণক্ষম হতে হবে। এজন্য নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার সংকেত পুনঃপ্রেরণের ক্ষমতা হারালে কিংবা খারাপ হয়ে গেলে অথবা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে, পুরো নেটওয়ার্কটি অকেজো হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে খারাপ কম্পিউটারটি অপসারণ করে পুনরায় সংযোগ সম্পন্ন করতে হয়।

রিং টপোলজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ–

১. নেটওয়ার্কে কোনো সার্ভার কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এটি এক ধরনের ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা প্রসেসিং সিস্টেম।
২. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়লেও এর দক্ষতা খুব বেশি প্রভাবিত হয় না।
৩. এ নেটওয়ার্কে কোনো নোডকে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় কোনো কম্পিউটারের উপর নির্ভর করতে হয় না। যদি কোনো কম্পিউটার নষ্ট থাকে তবে সেই কম্পিউটারকে রিং হতে বাদ দেয়া যায়।

রিং টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ–

১. এ নেটওয়ার্কে একটি মাত্র কম্পিউটার সমস্যায় আক্রান্ত হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়বে।
২. রিং টপোলজির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা নিরুপণ বেশ জটিল।
৩. নেটওয়ার্কে কোনো কম্পিউটার যোগ করলে বা সরিয়ে নিলে তা পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত করে।
৪. এ নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়লে ডেটা ট্রান্সমিশনের সময়ও বেড়ে যায়।
৫. রিং টপোলজির জন্য জটিল নিয়ন্ত্রণ সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়।

গ. বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি (Bus Network Topology)

যে ট্রপোলজিতে একটি মূল তারের সাথে সবকয়টি ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে বাস টপোলজি (Bus Topology) বলা হয়। বাস টপোলজির প্রধান ক্যাবলটিকে বলা হয় ব্যাকবোন (Backbone)। বাস নেটওয়ার্ক সংগঠনে একটি সংযোগ লাইনের সাথে সবগুলো নোড যুক্ত থাকে। সংযোগ লাইনকে সাধারণত বাস বলা হয়। একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটার নোডের সংযোগ লাইনের মাধ্যমে সংকেত পাঠায়। অন্যান্য কম্পিউটারগুলো তাদের নোডে সেই সংকেত পরীক্ষা করে এবং কেবলমাত্র প্রাপক নোড সেই সংকেত গ্রহণ করে।

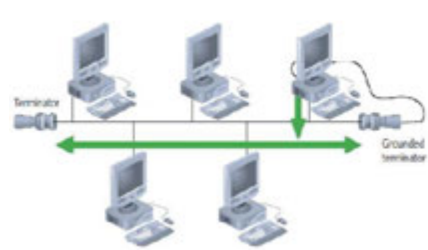
চিত্র-২.৩৭: বাস টপোলজি

বাস টপোলজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ:

১. এ নেটওয়ার্কের প্রধান সুবিধা হলো নেটওয়ার্ক খুব সাধারণ এবং ফিজিক্যাল লাইনের সংখ্যা মাত্র একটি।

২. নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বা বাস সহজে সম্প্রসারণ করা যায়।

৩. এ সংগঠনটি সহজ সরল এবং ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা সহজ।

৪. বাস নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে অন্য কম্পিউটারে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। সহজেই কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব।

৫. বাস নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংযুক্ত করতে কম তারের প্রয়োজন হয় ফলে খরচ কম হয়।

বাস টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ

১. মূল বাস নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সিস্টেম অচল হয়ে যায়।

২. এই টপোলজিতে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য কোনো সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই। যেকোনো কম্পিউটার যেকোনো সময়ে ডেটা ট্রান্সমিশন করতে পারে।

৩. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বেশি হলে ডেটা ট্রান্সমিশন বিঘ্নিত হয়।

৪. বাস টপোলজিতে সৃষ্ট সমস্যা নির্ণয় তুলনামূলক বেশ জটিল। বাসের একটি মাত্র স্থানে সৃষ্ট ত্রুটি বা ব্রেক (Break) পুরো নেটওয়ার্ককে অচল করে দেয়।

৫. ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।

ঘ. ট্রি নেটওয়ার্ক (Tree Network)

মূলত স্টার টপোলজির সম্প্রসারিত রূপই হলো ট্রি টপোলজি। এ টপোলজিতে একাধিক হাব (HUB) ব্যবহার করে সমস্ত কম্পিউটারকে একটি বিশেষ স্থানে সংযুক্ত করা হয় যাকে বলে রুট (Root)। যে টপোলজিতে কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার মতো বিন্যস্ত থাকে তাকে ট্রি টপোলজি বলা হয়। এ টপোলজিতে এক বা একাধিক স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রথম স্তরের কম্পিউটারগুলো দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোর হোস্ট হয়। একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলো তৃতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোর হোস্ট হয়।

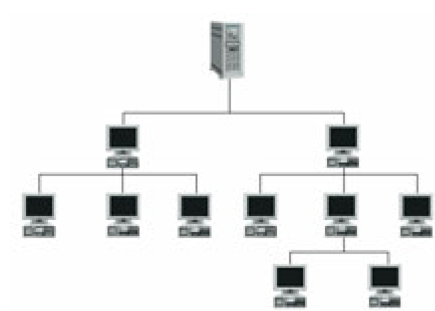

চিত্র-২.৩৮: ট্রি টপোলজি

ট্রি-টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Tree Topology)

১. অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে এ নেটওয়ার্ক টপোলজি খুবই উপযোগী।

২. শাখা-প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রি-টপোলজির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সহজ।

৩. নতুন কোনো নোড সংযোগ বা বাদ দিলে নেটওয়ার্কের স্বাভাবিক কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হয় না।

ট্রি-টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of Tree Topology)

১. এ টপোলজি কিছুটা জটিল ধরনের।
২. রুট বা সার্ভার কম্পিউটারে ক্রুটি দেখা দিলে ট্রি নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায়।

ঙ. মেস বা পরস্পর সংযুক্ত নেটওয়ার্ক (Mesh Network)

এ টপোলজি নেটওয়ার্ক প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশনের সাথে আলাদা আলাদা লিংক বা বাস থাকে। তাই প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশন সরাসরি যেকোনো ওয়ার্কস্টেশনের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। মেস টপোলজির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীনস্থ প্রত্যেক কম্পিউটার প্রত্যেক কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। যদি কোনো সময় যোগাযোগের একটি পথ নষ্ট হয় তবে বিকল্প আরেকটি পথ থাকে যোগাযোগের জন্য। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, যেকোনো একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

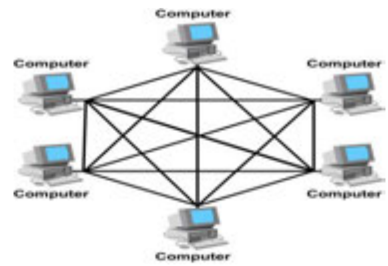

চিত্র-২.৩৯: মেস টপোলজি

মেস টপোলজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ–

১. যেকোনো দুটি নোডের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংকেত আদান-প্রদান করা যায়।
২. কোনো কম্পিউটার বা সংযোগ লাইন নষ্ট হয়ে গেলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ সহজে নেটওয়ার্ক খুব বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় না।
৩. এতে ডেটা কমিউনিকেশনে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে।
৪. নেটওয়ার্কের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়।

মেস টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ–

১. এ টপোলজিতে নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল।
২. নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত লিংক স্থাপন করতে হয় বিধায় এতে খরচ বেড়ে যায়।

চ. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

স্টার, রিং, বাস ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলে। উদাহরণস্বরূপ ইন্টারনেটকে এধরনের টপোলজি হিসেবে অভিহিত করা যায়। ইন্টারনেট একটি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক কেননা ইন্টারনেট হলো বৃহৎ পরিসরের একটি নেটওয়ার্ক যেখানে সব ধরনের টপোলজির মিশ্রণ দেখা যায়। হাইব্রিড নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা নির্ভর করছে ঐ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টপোলজিগুলোর উপর।

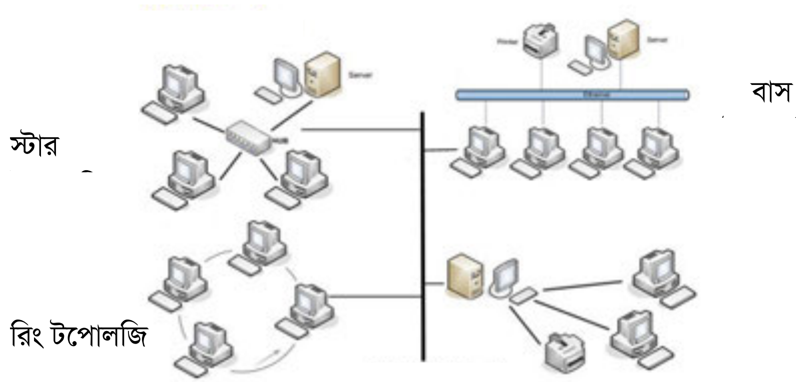

চিত্র-২.৪০: হাইব্রিড নেটওয়ার্ক।

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages Hybrid Topology)

১. এ টপোলজিতে প্রয়োজনানুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

২. কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সহজেই নির্ণয় করার সম্ভব হয়।

৩. কোনো এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট না হয়ে অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়।

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages Hybrid Topology)

১. এ টপোলজিতে ব্যবহৃত হাবসমূহ সর্বদা সচল রাখতে হয়।

২. নেটওয়ার্ক স্থাপন জটিল ও ব্যয়সাধ্য।

২.৫.৬ ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ক্লাউড মানে মেঘ, রূপকধর্মী হিসেবে যা ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬০ সাল থেকে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ইতিহাস শুরু হয়। ২০১০ সালে The Rackspace এবং NASA মুক্ত অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস ব্যবহার শুরু করে। এভাবে জনসাধারণের হাতের মুঠোয় ক্লাউড কম্পিউটিং আসতে শুরু করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং একটি বিশেষ পরিসেবা। এ উন্নত পরিসেবাটি কিছু কম্পিউটারকে গ্রিড সিস্টেম এর মাধ্যমে সংযুক্ত রাখে। ক্লাউড কম্পিউটিং অনলাইন পরিসেবা, কম্পিউটিং শক্তি, ডাটা অ্যাক্সেস এবং ডাটা স্পেস প্রদান করে যেখানে পরিসেবাগুলো ব্যবহারে ক্লাউড কম্পিউটিং বিষয়ে গভীরভাবে জানার দরকার পড়ে না। পরিসেবা হিসেবে যে কেউ ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করতে পারেন। বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে বিদ্যুৎ কী করে সংগৃহীত হয় তা জানার যেমন প্রয়োজন হয় না ঠিক তেমনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিতরণ সেবা ব্যবহার করে কম্পিউটারে কাজগুলো সম্পাদন করতে ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পকে বিশদ জানার প্রয়োজন হয় না।

'Cloud' এর ধারণা বলতে বুঝায় বিভিন্ন Network সংযোগসমূহ এবং কম্পিউটার ব্যবস্থাসমূহ যা 'Online' Services এর অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র-২.৪১: ক্লাউড কম্পিউটিং

ক্লাউড কম্পিউটিং বলতে আমরা এমন এক প্রযুক্তিকে বুঝি যা ডাটা এবং এর প্রয়োগসমূহকে ঠিক বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Internet এবং এর Central remote Servers (দূরবর্তী সার্ভারসমূহকে) ব্যবহার করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে বা গ্রাহকদেরকে ব্যক্তিগত প্রবেশাধিকারের সুযোগ এনে দেয় যা পৃথিবীর যে প্রান্তের কম্পিউটারেই হোক না কেন।

ক্লাউড কম্পিউটিং কম্পিউটার ব্যবহারের কতকগুলো সমন্বিত উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে Yahoo mail, Gmail অথবা, Hotmail তবে এ জন্য শুধুমাত্র ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন যা থাকলে আমরা মেইল পাঠাতে পারি।

ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) এর প্রকারভেদঃ

১. অবস্থানগত দৃষ্টিকোণ থেকে (Location of the cloud computing)

২. সেবা প্রদানের ভিত্তিতে (Type of services offered)

অবস্থানগত দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লাউড কম্পিউটিংকে নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা হয়ে থাকে–

১. **পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud):** পাবলিক ক্লাউড ব্যবস্থায় Computing অবকাঠামোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন Cloud vendor ভোক্তাগণের / গ্রাহকগণের এ ব্যাপারে কোনো সংশ্লিষ্টতা বা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব নেই।

২. **প্রাইভেট ক্লাউড (Private Cloud):** এ ব্যবস্থায় Computing Infrastructure এর দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের কাছে ন্যস্ত থাকে। অন্যান্য সংগঠনের সাথে তা ভাগাভাগি করা হয় না।

৩. **হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud):** যদি প্রাইভেট এবং পাবলিক ক্লাউড এক সাথে মিশ্রণ ঘটানো হয় তাকে হাইব্রিড বলে। এ ব্যবস্থাকে অন্যভাবে Cloud Burstingও বলা হয়ে থাকে।

৪. **কমিউনিটি ক্লাউড (Community Cloud):** কমিউনিটি ক্লাউড বলতে আমরা বুঝি, একই ধাঁচের সংগঠনগুলোর মধ্যে Computing অবকাঠামোর ভাগাভাগিকে সেবা প্রদানের ভিত্তিতে বিভাজন।

ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) এর সুবিধাঃ

১. **পরিমিতকরণ অর্জনঃ** স্বল্প কর্মশক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রকল্প ও পণ্য একক প্রতি উৎপাদন খরচ হ্রাস করে।

২. **প্রযুক্তির পরিকাঠামো ব্যয় হ্রাসঃ** সর্বনিম্ন খরচ সাপেক্ষে তথ্য সহজে প্রবেশাধিকার বজায় রাখে। সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে পরিশোধের সুযোগ রাখে।

৩. **সস্তায় কর্মশক্তিতে বিশ্বায়িত করাঃ** ইন্টারনেট সুবিধা থাকা সাপেক্ষে বিশ্বের যে কেউ Cloud এ প্রবেশ বা ব্যবহার করতে পারবে।

৪. **কার্যকর ব্যয় সংকোচন প্রক্রিয়াঃ** সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ে কম জনবল ব্যয়ে অধিক কর্ম সম্পাদন করে।

৫. **মূলধন বিনিয়োগ হ্রাসঃ** হার্ডওয়্যার, সফট্‌ওয়্যার বা লাইসেন্স খরচ মেটানোর জন্য অধিক অর্থ ব্যয় অপ্রয়োজনীয়।

৬. **সহজ প্রবেশ্যতা নিশ্চিতকরণঃ** যেকোনো স্থান থেকে যখন খুশি এতে প্রবেশ সুবিধা জীবনকে আরও সহজ করে।

৭. **অধিক কার্যকর প্রকল্প নিরীক্ষণঃ** সমাপ্তির সময় চক্রের আগেই কার্য সম্পাদন করায় বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা যায়।

৮. **কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যয় অনধিকঃ** হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ে অনধিক জ্ঞান সম্পর্কে স্বল্পসংখ্যক কর্মশক্তি ব্যবহার করেও বেশি কাজ করা সম্ভব।

৯. **নতুন সফটওয়্যার লাইসেন্সঃ** ব্যয়বহুল সফট্‌ওয়্যার লাইসেন্স বা প্রোগ্রাম ক্রয় ছাড়াই এর বিস্তার ঘটানো যায়।

১০. **নমনীয়তাঃ** গুরুত্বপূর্ণ কর্মশক্তিকে বা অর্থ সম্পদকে বিপদাপন্ন না করেই গতিধারা পাল্টে ফেলা যায়।

ব্যবহার:

ক্লাউড কম্পিউটিং আজকের দিনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। গুগল এর বিভিন্ন প্রয়োগ- যেমন জিমেইল, পিকাসা থেকে শুরু করে পৃথিবীর আবহাওয়া বা কোনো দেশের আদমশুমারির মতো বিশাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে এর অপরিসীম ব্যবহার। সর্বোপরি যোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি চিকিৎসা ও মানবকল্যাণেও এটি এক অন্যন্য সঙ্গী। এক কথায় ক্লাউড কম্পিউটিং এনেছে অনন্য বিপ্লব।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। সিসি কলেজের কম্পিউটার ল্যাবে ৫০টি কম্পিউটার আছে। কিন্তু তাদের ১টি প্রিন্টার রয়েছে, এর ফলে কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে হলে পেন-ড্রাইভ ব্যবহার করে ঐ নির্দিষ্ট কম্পিউটারে স্থানান্তর করে প্রিন্ট করতে হয়। এতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী ল্যাপটপ ব্যবহার করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সকলকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ক. ব্যান্ড উইথ কী?

খ. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?

গ. কীভাবে সকলে সরাসরি প্রিন্টারটি ব্যবহার করতে পারবে তা বর্ণনা কর।

ঘ. কলেজে ওয়াইফাই সংযোগের পক্ষে যুক্তি দাও।

২। ইশতিয়াক সাহেব একটি জরুরী ই-মেইল করার জন্য কম্পিউটার অন করলেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন ইন্টারনেটে কাজ করতে পারছেন না। একজন হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ানকে দেখালে তিনি জানান যে, মডেম ঠিক মত কাজ করছে না। এটা পরিবর্তন করতে হবে।

ক. ডেটা কমিউনিকেশন কি?

খ. ব্রড ব্যান্ড কি?

গ. মডিউলেশন ও ডি-মডিউলেশন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ডেটা প্রেরণে মডেমের ভূমিকা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। সিসি কলেজের একটি ভবনে ৪৭টি কক্ষ আছে। প্রত্যেক রুমে একটি করে স্পিকার সংযুক্ত আছে। যেকোনো নোটিস বা ঘোষণা একযোগে সবাইকে জানানো যায়। এখানে–

i. সিমপ্লেক্স মোডে ডেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে

ii. ব্রডকাস্ট পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে

iii. মাল্টিকাস্ট পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ **অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-কলেজের পাশাপাশি চারটি ভবনে অবস্থিত সকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।**

২। **তাদের নেটওয়ার্কটি কোন ধরনের হবে?**

ক. ISDN   খ. LAN

গ. MAN   ঘ. WAN

৩। **নেটওয়ার্ক চালু করার পর তাঁরা–**

i. সকলে একটি প্রিন্টার ব্যবহার করতে পারবে।

ii. এক কম্পিউটারের ডিভাইস অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর করতে পারবে।

iii. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করতে পারবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪। **নিচের কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল প্রয়োজন হয়–**

ক. রিং টপোলজি   খ. মেশ টপোলজি

গ. বাস টপোলজি   ঘ. ট্রি টপোলজি

তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

NUMBER SYSTEM & DIGITAL DEVICE

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতে শুরু করে এটির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ গণনা তথা হিসাব-নিকাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। প্রাচীনকালে গণনার জন্য হাতের আঙ্গুল, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, কাঠি, রশির গিট, দেয়ালে দাগ কাটা ইত্যাদি ব্যবহার করতো। সময়ের বিবর্তনে উন্নতির ধারাবাহিকতায় গণনার ক্ষেত্রে যুক্ত হলো বিভিন্ন প্রতীক ও চিহ্নের ব্যবহার। বর্তমানে মানুষ গণনার জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে। কম্পিউটার কাজ করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে। এছাড়াও কম্পিউটার কাজ করে অকট্যাল, হেক্সাডেসিমেল ও বিভিন্ন কোডের মাধ্যমে। কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বুঝার জন্য বুলিয়ান অ্যালজেবরা, লজিক গেইট, ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য, এনকোডার, ডিকোডার, অ্যাডার, রেজিস্টার ও কাউন্টার ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

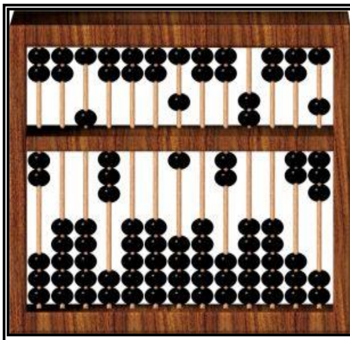
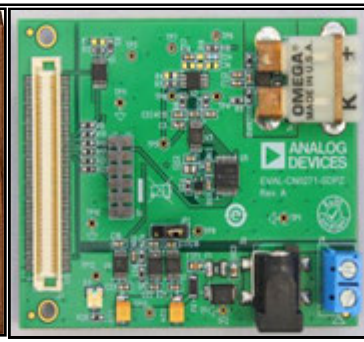

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।
- সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
- বাইনারি যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে।
- চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ২ এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে।
- কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।
- বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে।
- লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে।
- বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩.১ সংখ্যা আবিস্কারের ইতিহাস (History Of Inventing Numbers)

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতে শুরু করে এটির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ গণনা তথা হিসাব-নিকাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। প্রাচীনকালে গণনার জন্য নানা রকম উপকরণ ব্যবহার করা হতো। যথা: হাতের আঙ্গুল, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, কাঠি, রশির গিট, দেয়ালে দাগ কাটা ইত্যাদি। সময়ের বিবর্তনে উন্নতির ধারাবাহিকতায় গণনার ক্ষেত্রে যুক্ত হলো বিভিন্ন প্রতীক ও চিহ্নের ব্যবহার। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ সালে হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics) চিহ্ন বা সংখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম গণনার কাজে লিখিত সংখ্যা বা চিহ্নের প্রচলন শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে মেয়ান (Mayan) ও রোমান (Roman) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ভারতবর্ষ ও আরবে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়- যা বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিসাব-নিকাসের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আজও বহুবিধ গাণিতিক কাজে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

কোনো সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলে সংখ্যা পদ্ধতি। অন্য কথায়, যে পদ্ধতির মাধ্যমে সংখ্যা প্রকাশ ও গণনা করা হয় তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে। সংখ্যা প্রকাশ করার বিভিন্ন প্রতীকই হচ্ছে অঙ্ক। যেমন–১২৫ সংখ্যাটি ১, ২, ও ৫ এ তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত।

সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে তাদেরকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- নন-পজিশনাল (Non-Positional) সংখ্যা পদ্ধতি।
- পজিশনাল (Positional) সংখ্যা পদ্ধতি।

নন-পজিশনাল (Non-Positional) সংখ্যা পদ্ধতি

একটি প্রাচীনতম পদ্ধতি হচ্ছে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি। বর্তমানে এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই কম। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যায় ব্যবহৃত চিহ্ন বা অঙ্কসমূহ কোনো স্থানীয় মান বা অবস্থানের উপর নির্ভর করে না, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। সংখ্যার মধ্যে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো কোন অবস্থানে আছে তার কোনো প্রভাব নেই। সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্ক যেখানেই থাকুক না কেন এদের নিজস্ব মান দ্বারাই সংখ্যাটির মান নির্ধারণ করা হয়। যেমন- প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক্স সংখ্যা পদ্ধতি।

পজিশনাল (Positional) সংখ্যা পদ্ধতি

বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি। যে সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্ন, বেজ বা ভিত্তি এবং এর অবস্থান বা স্থানীয়মান থাকতে হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 ও 1 এ দুটি মৌলিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এবং বেজ হচ্ছে 2। ডিজিটের অবস্থানের উপর সংখ্যার মান নির্ভর করে। এজন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য তিনটি উপাদানের প্রয়োজন হয়। যথা–

১. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান,
২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (Base) বা ভিত্তি,
৩. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে র‍্যাডিক্স (Radix) পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুঅংশে ভাগ করা হয়।

যেমন: 125.625। এখানে 125 পূর্ণাংশ, (.) র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ও .625 ভগ্নাংশ।

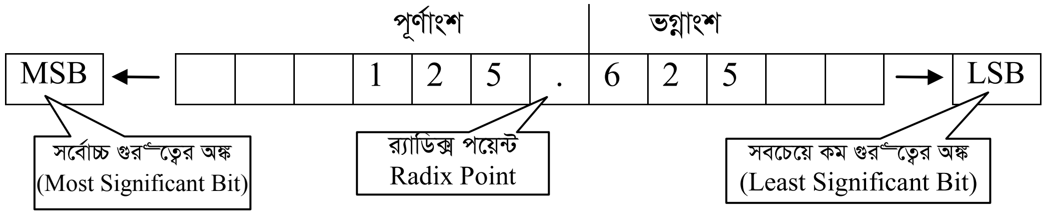

উদাহরণস্বরূপ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির 125 সংখ্যাটি বিবেচনা করি–
এখানে দশমিক 125 সংখ্যাটিতে 1, 2, 5 অঙ্ক তিনটি পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
যেহেতু উল্লেখিত সংখ্যাটি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির একটি সংখ্যা, সুতরাং এটির বেজ বা ভিত্তি হলো 10।
আবার যেহেতু $125 = 1\times100+2\times10+ 5\times1$ সংখ্যাটির ব্যবহৃত অঙ্কগুলো 5, 2, 1 কে যথাক্রমে একক, দশক ও শতক দ্বারা গুণ করা হয়েছে, সুতরাং এগুলোর স্থানীয় মান যথাক্রমে 5- একক, 2- দশক এবং 1- শতক।

সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (Base) বা ভিত্তি:

কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নসমূহের মোট সংখ্যা। যেমন- বাইনারির বেজ ২। কারণ এ পদ্ধতিতে মোট ২টি মৌলক চিহ্ন আছে। যেমন- 0 ও 1।
অন্য কথায়, কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক প্রতীক বা অঙ্কের মোট সংখ্যাকে উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (Base) বা ভিত্তি বলা হয়। বেজ দ্বারা কোনো একটি সংখ্যা, কোন সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা তা নিরূপণ করা হয়। যেমন-দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 10, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ যথাক্রমে 8 ও 16।

৩.২.১ কাজের ধরন ও হিসাব-নিকাসের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি প্রচলন ও ব্যবহার রয়েছে। যথা:

১. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)
২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)
৩. অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System)
৪. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Number System)

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

সাধারণ হিসাব-নিকাসের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এ দশটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে।
যেহেতু দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 হতে 9 পর্যন্ত দশটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এ বেজ 10। **উদাহরণ:** $(125)_{10}$

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি একটি সরলতম সংখ্যা পদ্ধতি। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পন্ন হয় বাইনারিসংখ্যা পদ্ধতিতে। 0 ও 1 এ দুটি অঙ্ককে Binary digit বা সংক্ষেপে Bit বলা হয়। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 ও 1 এ দুটি মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে যেহেতু 2টি অঙ্ক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এটির বেজ বা ভিত্তি 2।

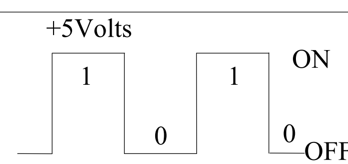

চিত্র: ডিজিটাল সংকেত

উদাহরণ: $(1011)_2$

এক্ষেত্রে 0 কে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি (OFF) এবং 1 কে বিদ্যুতের উপস্থিতি (ON) হিসেবে গণ্য করা হয় যা মেশিনের জন্য সহজেই বোধগম্য হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ইংল্যান্ডের গণিতবিদ জর্জ বুলি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এজন্য জর্জ বুলিকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির জনক বলা হয়।

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা
0	0	8	1000
1	1	9	1001
2	10	10	1010
3	11	11	1011
4	100	12	1100
5	101	13	1101
6	110	14	1110
7	111	15	1111

চিত্র: দশমিক সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি মান

সাধারণত 0 থেকে + 0.8 ভোল্ট পর্যন্ত লেভেলকে লজিক 0 এবং +2 ভোল্ট থেকে +5 ভোল্ট পর্যন্ত লেভেলকে লজিক 1 ধরা হয়। ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে +0.8 ভোল্ট থেকে +2.0 ভোল্ট লেবেল সংজ্ঞায়িত নয় বিধায় ব্যবহার করা হয় না। চিত্রে দুই অবস্থাবিশিষ্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। এখানে 0 ভোল্ট দ্বারা লজিক 0 এবং +5 ভোল্ট দ্বারা লজিক 1 নির্দেশ করা হয়েছে।

উদাহরণ: $(11110)_2$ একটি বাইনারি সংখ্যা।

বাইনারি সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান

MSB	... 2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	... LSB
MSB	... 32	16	8	4	2	1	.5	.25	.125	... LSB

অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System)

বাইনারি সংখ্যা ২ এর ভিত্তিতে গঠিত বলে এটি বেশি দীর্ঘ। একে সহজ ও ছোট করার জন্য আরো দুটি সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এর একটি অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতি। আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারে অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সংখ্যা পদ্ধতি 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 এ আটটি অঙ্ক বা চিহ্ন নিয়ে গঠিত তাকে অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এ 8টি মৌলিক অঙ্ক বা চিহ্ন নিয়ে যাবতীয় গাণিতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয় বলে এর বেজ বা ভিত্তি হলো 8।

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অকট্যাল সংখ্যা
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

চিত্র : দশমিক, বাইনারি ও অকট্যাল সমকক্ষ সংখ্যা।

এ পদ্ধতিতে 8 এবং 9 এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি অকট্যাল সংখ্যা তিনটি Binary digit কে Represent করে।

উদাহরণস্বরূপ: $(375)_8$ একটি অকট্যাল সংখ্যা। অকট্যাল সংখ্যা গণনার সুবিধার্থে পূর্বের পাতায় দশমিক সংখ্যার সমতুল্য অকট্যাল মান দেখানো হয়েছে। অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান:

MSB	8^3	8^2	8^1	8^0	.	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3}	... LSB
MSB	512	64	8	1	.	$1/8$	$1/64$	$1/512$	... LSB

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Number System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি চিহ্ন বা অঙ্ক আছে, সেই সংখ্যা পদ্ধতিকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক অঙ্ক বা প্রতীক মোট ১৬টি। যথা: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং, A, B, C, D, E F। এ 16টি মৌলিক প্রতীক বা অঙ্ক ব্যবহার করে সকল প্রকার গাণিতিক হিসাব- নিকাস সম্পাদন করা হয়। যেহেতু এখানে 16টি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। তাই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি হলো 16। সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
0	0	8	8
1	1	9	9
2	2	10	A
3	3	11	B
4	4	12	C
5	5	13	D
6	6	14	E
7	7	15	F

চিত্র: দশমিক ও সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা

পাশের সারণিতে দশমিক সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মান দেখানো হলো–

এখানে, A = 10, B = 11, C = 12 , D = 13 , E = 14 এবং F = 15।

উদাহরণ: $(3FC.\ 2B)_{16}$ একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার সিস্টেমে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান–

MSB	16^2	16^1	16^0	.	16^{-1}	16^{-2}	16^{-3}	... LSB
MSB	256	16	1	.	1/16	1/256	1/4096	... LSB

অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

কম্পিউটার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে তার আভ্যন্তরীণ কার্য সম্পাদন করে। আভ্যন্তরীণ কাজ সম্পাদনের জন্য দরকার হয় অসংখ্য 0 এবং 1 বিটের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। 0 এবং 1 দিয়ে এ ধরনের বর্ণনা লেখা খুবই কষ্টকর এবং তাতে ভুলের সম্ভাবনাও বেশি। সে জন্য অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিদ্বয়কে সাধারণত বাইনারি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কারণ কোনো প্রকার জটিল হিসাব-নিকাস ছাড়াই বাইনারি থেকে অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমালে পরিবর্তন করা যায়।

নিম্নে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক অঙ্ক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো–

সংখ্যা পদ্ধতির নাম	মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক	বেজ বা ভিত্তি	উদাহরণ
দশমিক	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	10	$(5678)_{10}$
বাইনারি	0, 1	2	$(11010)_2$
অকট্যাল	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	8	$(7567)_8$
হেক্সাডেসিমাল	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F,	16	$(8FC5)_{16}$

নিম্নে 0-20 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির সাথে অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতির তুলনামূলক সমতুল্য মান দেখানো হলো–

দশমিক সংখ্যা	সমতুল্য বাইনারি মান	সমতুল্য অকট্যাল মান	সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

কম্পিউটার ডিজাইনে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো, একটি সহজাত গণনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে '0' এবং '1' এ দুটি বিট ব্যবহার করা হয়। গণনার কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা: দশমিক, বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি। সাধারণভাবে কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকেই বোঝানো হয়। কম্পিউটারে বিভিন্ন ডেটা বা উপাত্ত (যথা: বর্ণ, অঙ্ক, সংখ্যা, চিহ্ন) সংরক্ষণ করা হয় বাইনারি কোডের মাধ্যমে। নিম্নে কম্পিউটার ডিজাইনে অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি অপেক্ষা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের অন্যতম কারণ ও সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি অপেক্ষা সরলতম সংখ্যা পদ্ধতি।

২. কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করা হয় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক/ ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট যথা: ট্রানজিস্টর, সেমিকন্ডাক্টর (অর্ধপরিবাহী), ম্যাগনেটিক উপাদান ইত্যাদির মাধ্যমে। উল্লেখিত সকল উপাদান সাধারণভাবে দুটি শর্ত (Condition) বা অবস্থা (State) নির্দেশ করে। একটি 1 (ON) অপরটি 0 (OFF)। এখানে ON, OFF দ্বারা যথাক্রমে বিদ্যুতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে।

৩. কম্পিউটার কাজ করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের ভিত্তিতে। বাইনারির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 0 ও 1 এর জন্য দুটি আলাদা আলাদা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল তৈরি করা যতটা সহজ ডেসিমাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে 10 টি ও হেক্সাডেসিমালের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক 16 টি সিগন্যাল তৈরি করা তুলনামূলক বেশি জটিল।

৪. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতিতে সার্কিট ডিজাইন তুলনামূলক জটিল ও ব্যয়বহুল।

৫. কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস যথা–ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিজিটাল ফোন ইত্যাদি বাইনারি মোডে কাজ করে। ফলে তাদের খুব সহজে কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেসিং করা যায়।

সুতরাং কম্পিউটার ডিজাইন ও এটি বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি অপেক্ষা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর সুবিধাজনক।

৩.২.২ সংখ্যার রূপান্তর (Conversion of Number)

সংখ্যা পদ্ধতিগুলো রূপান্তর করা যায়। রূপান্তরের মাধ্যমে সংখ্যা পদ্ধতির আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। অর্থাৎ এক সংখ্যা পদ্ধতিকে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর করলে কী ধরনের সংখ্যা হয়, তা জানা যায়। ফলে সংখ্যা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ হিসাব-নিকাসের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি। কিন্তু এমন কতকগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি অপেক্ষা অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার সুবিধাজনক। তাই বিভিন্ন সংখ্যার রূপান্তর ও এর যথাযথ প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে বিভিন্ন সংখ্যার রূপান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর (Decimal to Binary Conversion)

দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কোনো সংখ্যার দুটি অঙ্ক থাকতে পারে। যথা: পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশ। নিচে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশ রূপান্তরের সাধারণ নিয়ম দেখানো হলো। এখানে ভাগ-অবশিষ্ট (Division Remainder Technique) পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো–

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে (Incase of Integer Number)

১. দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি বেজ দিয়ে পর্যায়ক্রমে ভাগ করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাগফল শূন্য হয়।
২. প্রত্যেকবার ভাগ করার পর অবশিষ্ট সংখ্যাগুলোকে পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩. অতঃপর অবশিষ্ট (Remainder) সংখ্যাগুলোকে নিচ হতে উপর দিকে পর্যায়ক্রমে (Bottom to Top) সাজিয়ে লিখলে দশমিক পূর্ণ সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণস্বরূপ: $(125)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় করা হলো।

```
2 | 125                 (LSB)
  2 | 62-1                ↑
    2 | 31-0              |
      2 | 15-1            |
        2 | 7-1           |
          2 | 3-1         |
            2 | 1-1       |
                0-1       (MSB)
```

$\therefore (125)_{10} = (1111101)_2$

খ. ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে (Floating Point Number)

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে নিম্নের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়–

১. ভগ্নাংশটিকে বাইনারি বেজ 2 দ্বারা গুণ করে পূর্ণ অঙ্ক (দশমিক বিন্দুর পূর্বের অঙ্ক) ও ভগ্নাংশ (দশমিক বিন্দুর পরের) পৃথক করতে হবে।

২. নতুন প্রাপ্ত ভগ্নাংশটিকে পুনরায় বেজ 2 দিয়ে গুণ করে একই প্রক্রিয়ায় পূর্ণ অঙ্ক ও ভগ্নাংশ পৃথক করতে হবে।

৩. উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভগ্নাংশটি পরিপূর্ণ 1 হবে (অর্থাৎ ভগ্নাংশ নিঃশেষ হবে) তখন গুণ করা বন্ধ করতে হবে।

৪. কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি সংখ্যা আসলে গুণ করা বন্ধ করতে হবে।

৫. এমনও কিছু কিছু সংখ্যা আছে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি সংখ্যা নাও আসতে পারে। অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। সেক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর পর যে কয় ঘর পর্যন্ত নিতে বলা হবে ততবার 2 দ্বারা গুণ করে বন্ধ করতে হবে।

৬. অতঃপর পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে উপর হতে নিচের দিকে (Top to Bottom) সাজিয়ে লিখলে ভগ্নাংশটির সমতুল্য বাইনারি মান পাওয়া যাবে। নিম্নের উদাহরণগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়–

উদাহরণ-১: $(.625)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয়–

	পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
		. 625 × 2
(MSB)	1	.250 × 2
↓	0	.500 × 2
(LSB)	1	.000

$\therefore (.625)_{10} = (.101)_2$

উদাহরণ-২: $(.105)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয়–

	পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
		. 105 × 2
MSB	0	.210 × 2
↓	0	.420 × 2
↓	0	.840 × 2
↓	1	.680 × 2
LSB	1	.360

$\therefore (.105)_{10} = (.00011 \ldots\ldots\ldots.)_2$

উদাহরণ-৩: $(225.75)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি মান নির্ণয় কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

ভাজক	ভাগফল-ভাগশেষ
2	225
2	112-1 (LSB)
2	56-0
2	28-0
2	14-0
2	7-0
2	3-1
2	1-1
	0-1 (MSB)

$\therefore (225)_{10} = (11100001)_2$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

	পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
		.75 × 2
MSB	1	.50 × 2
LSB	1	.00

$\therefore (.75)_{10} = (.11)_2$

$\therefore (225.75)_{10} = (1110001.11)_2$

দশমিক সংখ্যাকে অকট্যালে রূপান্তর (Decimal to Octal Conversion)

দশমিক সংখ্যাকে অকট্যাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য দশমিক সংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে ৮ দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্টগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক পর্যন্ত পর্যায় ক্রমে লিখে দশমিক সংখ্যাটির অকট্যাল সমকক্ষ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম এবং শেষ অবশিষ্ট দুটি সংখ্যাকে যথাক্রমে অকট্যাল সংখ্যার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক বলে। (এ রূপান্তরও দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের মতোই)

উদাহরণ-১: $(125.625)_{10}$ এর সমকক্ষ অকট্যাল মান নির্ণয় কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

```
8 | 125
   8 | 15 - 5      (LSB)
      8 | 1 - 7      ↑
          0 - 1    (MSB)
```

$\therefore (125)_{10} = (175)_8$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
	.625
	8
5	.000

$\therefore (.625)_{10} = (.5)_8$

$\therefore (125.625)_{10} = (175.5)_8$

দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর (Decimal to Hexadecimal Conversion)

দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য দশমিক সংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে ১৬ দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্টগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে লিখে দশমিক সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সমকক্ষ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম এবং শেষ অবশিষ্ট দুটি সংখ্যাকে যথাক্রমে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক বলে। এখানে দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে ১৬ দ্বারা ভাগ এবং ভগ্নাংশকে বার বার ১৬ দ্বারা গুণ করতে হয়। (এ রূপান্তরও দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের মতোই)।

হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের উদাহরণটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়–

উদাহরণ–১: $(125.625)_{10}$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান নির্ণয় কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

```
16 | 125
   16 | 7 - 13 (D)   LSB
         0 - 7        ↑ MSB
```

$\therefore (125)_{10} = (7D)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
	.625
	16
(A)10	.000

$\therefore (.625)_{10} = (.A)_{16}$

$\therefore (125.625)_{10} = (7D.A)_{16}$

উদাহরণ-২: $(2528.875)_{10}$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল মান নির্ণয় কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

```
16 | 2528
   16 | 158 - 0      LSB
      16 | 9 - 14 (E)  ↑
            0 - 9     MSB
```

$\therefore (2528)_{10} = (9E0)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
	.875
	16
(E)14	.000

$\therefore (.875)_{10} = (.E)_{16}$

$\therefore (2528.875)_{10} = (9E0.E)_{16}$

নিম্নে ব্লকচিত্রের মাধ্যমে দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের প্রক্রিয়া দেখান হলো–

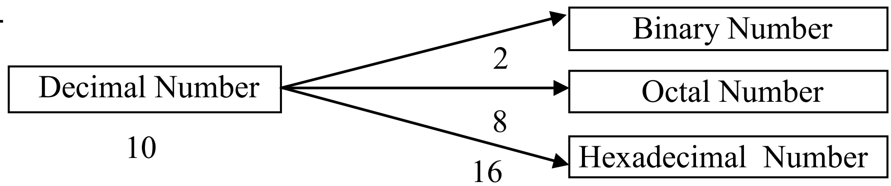

চিত্র: দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর।

বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর (Binary to Decimal Conversion)

ক. পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে: কোনো বাইনারি পূর্ণ সংখ্যা দশমিকে রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে–

১. সংখ্যাটিকে LSB (Least Significant Bit) বিট হতে শুরু করে MSB (Most Significant Bit) বিট পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্ককে পর্যায়ক্রমে 2^p দ্বারা গুণ করতে হবে। এখানে P = ০, ১, ২, ৩ ....

২. অতঃপর গুণফলগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

৩. প্রদত্ত যোগফলই হবে বাইনারি সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান।

উদাহরণ–১: $(110101)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় কর।

MSB → 110101 ← LSB

$$(110101)_2 = 1\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$$
$$= 1\times32 + 1\times16 + 0\times8 + 1\times4 + 0\times2 + 1\times1$$
$$= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1$$
$$= 53$$
$$\therefore (110101)_2 = (53)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে:

১. ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সংখ্যাটিকে MSB বিট হতে শুরু করে LSB বিট পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্ককে পর্যায়ক্রমে 2^{-p} দ্বারা গুণ করতে হবে। এখানে P = 1, 2, 3 ....

যেমন– P = 1 হলে $2^{-1} = \frac{1}{2} = .5$

P = 2 হলে $2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = .25$

P = 3 হলে $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = .125$

P = 4 হলে $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = .0625$

২. অতঃপর গুণফলগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

৩. প্রদত্ত যোগফলই হবে ভগ্নাংশটির সমতুল্য দশমিক ভগ্নাংশ মান।

উদাহরণ–২: $(0.1010)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় কর।

$$(0.1010)_2 = 1\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} + 0\times2^{-4}$$
$$= 1\times\frac{1}{2} + 0\times\frac{1}{4} + 1\times\frac{1}{8} + 0\times\frac{1}{16}$$
$$= \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} + 0$$
$$= .5 + .125$$
$$= .625$$
$$\therefore (.1010)_2 = (.625)_{10}$$

উদাহরণ–৩: $(11101.110)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

$$(11101)_2 = 1\times2^4+1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0$$
$$= 1\times16 + 1\times8 + 1\times4 + 0 + 1\times1$$
$$= 16 + 8 + 4 + 1$$
$$= 29$$
$$\therefore (11101)_2 = (29)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.110)_2 = 1\times2^{-1}+1\times2^{-2}+0\times2^{-3}$$
$$= 1\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+0$$
$$= \frac{1}{2}+\frac{1}{4}$$
$$= .5 + .25$$
$$= .75$$
$$\therefore (.110)_2 = (.75)_{10}$$

$$\therefore (11101.110)_2 = (29.75)_{10}$$

অকট্যাল সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর (Octal to Decimal Conversion)

বাইনারি সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তরের জন্য যে প্রক্রিয়া বা নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে অকট্যাল সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তরের জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়া বা নিয়ম অনুসরণ করত হবে। শুধু বাইনারির বেজ 2 এর স্থলে অকট্যালের বেজ 8 দ্বারা হিসেবে কাজ সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ 2^p এর স্থলে 8^p বসবে। এখানে 8 হলো অকট্যালের বেজ, p হলো তার ঘাত বা Power।

উদাহরণ–১: $(375.125)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

$$(375)_8 = 3\times8^2 + 7\times8^1 + 5\times8^0$$
$$= 3\times64 + 7\times8 + 5\times1$$
$$= 192 + 56 + 5$$
$$= 253$$
$$\therefore (375)_8 = (253)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.125)_8 = 1\times8^{-1}+2\times8^{-2}+5\times8^{-3}$$
$$= 1\times\frac{1}{8}+2\times\frac{1}{8^2}+5\frac{1}{8^3}$$
$$= \frac{1}{8}+\frac{2}{64}+\frac{5}{512}$$
$$= .125 + .03125 + .0097656$$
$$= .16601563$$
$$\therefore (.125)_8 = (.16601563)_{10}$$

$$\therefore (375.125)_8 = (253.166015)_{10}$$

উদাহরণ–২: $(175.50)_8$ এর দশমিক মান নির্ণয় কর।

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

$$(175)_8 = 1\times8^2+7\times8^1+5\times8$$
$$= 1\times64+7\times8+5\times1$$
$$= 64+56+5$$
$$= 125$$
$$\therefore (175)_8 = (125)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.50)_8 = 5\times8^{-1}+0\times8^{-2}$$
$$= 5\times\frac{1}{8}+0\times\frac{1}{8^2}$$
$$= \frac{5}{8}+0$$
$$= .625$$
$$\therefore (.50)_8 = (.625)_{10}$$

$$\therefore (175.50)_8 = (125.625)_{10}$$

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর (Hexadecimal to Decimal Conversion)

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য হেক্সাডেসিমাল অঙ্কগুলোকে নিজস্ব স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ: $(3FC.2B)_{16}$ এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় কর।

পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে,

$$(3FC)_{16} = 3 \times 16^2 + F \times 16^1 + C \times 16^0$$
$$= 3 \times 256 + 15 \times 16 + 12 \times 1$$
$$= 768 + 240 + 12$$
$$= 1020$$
$$\therefore (3FC)_{16} = (1020)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.2B)_{16} = 2 \times 16^{-1} + B \times 16^{-2}$$
$$= \frac{2}{16} + \frac{11}{256}$$
$$= \frac{32+11}{256} = \frac{43}{256}$$
$$= .167968$$
$$\therefore (.23)_{16} = (.167968)_{10}$$

সুতরাং $(3FC.2B)_{16} = (1020.167968)_{10}$

উদাহরণ: $(ABCD.EF)_{16}$ এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় কর।

পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে,

$$(ABCD)_{16} = A \times 16^3 + B \times 16^2 + C \times 16^1 + D \times 16^0$$
$$= 10 \times 16^3 + 11 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 13 \times 16^0$$
$$= 10 \times 4096 + 11 \times 256 + 12 \times 16 + 13 \times 1$$
$$= 40960 + 2816 + 192 + 13$$
$$= 43981$$
$$\therefore (ABCD)_{16} = (43981)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.EF)_{16} = E \times 16^{-1} + F \times 16^{-2}$$
$$= 14 \times 16^{-1} + 15 \times 16^{-2}$$
$$= \frac{14}{16} + \frac{15}{16^2}$$
$$= .875 + .0585940$$
$$= .933594$$
$$\therefore (.EF)_{16} = (.9335940)_{10}$$

সুতরাং $(ABCD.EF)_{16} = (43981.933594)_{10}$

বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে ডেসিমাল/ দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের ব্লকচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

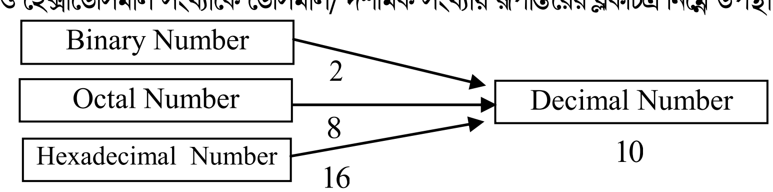

চিত্র: বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের ব্লকচিত্র।

অকট্যাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর (Octal to Binary Conversion)

কোনো অকট্যাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হলে অকট্যাল সংখ্যাটির প্রতি একটি ডিজিটকে সেটার সমতুল্য তিনটি বাইনারি ডিজিট দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। পাশের সারণিতে অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত 0 হতে 7 পর্যন্ত অঙ্কগুলোর সমতুল্য বাইনারি মান দেখানো হলো–

অকট্যাল সংখ্যা	সমতুল্য বাইনারি মান		
	4	2	1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

চিত্র: অকট্যাল ও সমতুল্য বাইনারি মান।

উদাহরণ–১: $(375.24)_8$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় কর।

$$(3\ 7\ 5\ .\ 2\ 4)_8$$
$$= (011\ \ 111\ \ 101\ .\ 010\ \ 100)_2$$
$$\therefore (375\ .\ 24)_8 = (11111101\ .\ 010100)_2$$

উদাহরণ–২: $(615.273)_8$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় কর।

$(6 \quad 1 \quad 5 \quad . \quad 2 \quad 7 \quad 3)_8$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$=(110 \; 001 \; 101 \; . \; 010 \; 111 \; 011)_2$

$\therefore (615.273)_8 = (110001101.010111011)_2$

বাইনারি সংখ্যাকে অকট্যালে রূপান্তর (Binary to Octal Conversion)

বাইনারি সংখ্যাকে অকট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর হলো অকট্যাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরের বিপরীত প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে প্রতি তিনটি বাইনারি ডিজিট দিয়ে একটি করে সমতুল্য অকট্যাল ডিজিট তৈরি করা হয়। পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান হতে বামদিকে তিনটি করে ডিজিট পৃথক করে নিতে হবে এবং তিনটির কম হলে বাম পার্শ্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য বসিয়ে তিনটি ডিজিট পূর্ণ করা হয়। আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম হতে ডান দিকে তিনটি করে ডিজিট আলাদা করে নিতে হয় এবং তিনটির কম হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য ডান পার্শ্বে বসিয়ে তিনটি ডিজিট পূর্ণ করতে হয়। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হলো–

উদাহরণ–১: $(11101011 \,.\, 1011011)_2$ এর সমতুল্য অকট্যাল মান নির্ণয় কর।

$(011 \; 101 \; 011 \; . \; 101 \; 101 \; 100)_2$

$\leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow$

$= (\; 3 \quad 5 \quad 3 \; . \; 5 \quad 5 \quad 4 \;)_8$

$\therefore (11101011 \,.\, 1011011)_2 = (353 \,.\, 554)_8$

উদাহরণ–২: $(1011011101 \,.\, 00110)_2$ এর সমতুল্য অকট্যাল মান নির্ণয় কর।

$(001 \; 011 \; 011 \; 101 \; . \; 001 \; 100)_2$

$\leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow \quad \leftrightarrow$

$= (\; 1 \quad 3 \quad 3 \quad 5 \; . \; 1 \quad 4 \;)_8$

$\therefore (10110111101 \,.\, 001100)_2 = (1335 \,.\, 14)_2$

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর (Hexadecimal to Binary Conversion)

কোনো হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হলে হেক্সাডেসিমালের প্রতি একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট/ প্রতীককে চারটি সমতুল্য বাইনারি ডিজিট দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। পাশের সারণিতে হেক্সাডেসিমালের সমতুল্য বাইনারি মান দেয়া হলো–

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা			
	8	4	2	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A (10)	1	0	1	0
B (11)	1	0	1	1
C (12)	1	1	0	0
D (13)	1	1	0	1
E (14)	1	1	1	0
F (15)	1	1	1	1

চিত্র: হেক্সাডেসিমাল ও সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা

উদাহরণ–১: $(35D.3F)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় কর।

$(\, 3 \quad 5 \quad D \; . \; 3 \quad F)_{16}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$=(0011 \; 0101 \; 1101 \; . \; 0011 \; 1111)_2$

$\therefore (35D \,.\, 3\,F)_{16} = (001101011101.\, 00111111)_2$

উদাহরণ–২: $(DEA \,.\, 4BC)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় কর।

$(D \quad E \quad A \; . \; 4 \quad B \quad C)_{16}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$= (1101 \; 1110 \; 1010 \; . \; 0100 \; 1011 \; 1100)_2$

$\therefore (DEA \,.\, 4BC)_{16} = (110111101010 \,.\, 010010111100)_2$

বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর (Binary to Hexadecimal Conversion)

বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর বাইনারি সংখ্যাকে অকট্যাল সংখ্যায় রূপান্তরের অনুরূপ। হেক্সাডেসিমালের ক্ষেত্রে চারটি করে বাইনারি ডিজিট ব্যবহার করে একটি হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক/ ডিজিট গঠন করা হয়েছে। পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে ডান হতে বাম দিকে চারটি করে বাইনারি ডিজিট পৃথক করে একটি করে হেক্সাডেসিমাল ডিজিট গঠন করতে হবে। চারটি ডান হতে বাম পার্শ্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য বসিয়ে চারটি ডিজিট পূর্ণ করতে হবে। আর ভগ্নাংশের বাম হতে ডান দিকে চারটি করে ডিজিট পৃথক করে হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক/ ডিজিট তৈরি করতে হয়। চারটির কম হলে ডান পার্শ্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য বসিয়ে চারটি পূর্ণ করতে হবে।

উদাহরণ–১: $(11100101110\ .\ 101010111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান নির্ণয় কর।

$$(0111\ \ 0010\ \ 1110\ .\ 1010\ \ 1011\ \ 1000)_2$$
$$=(7\ \ 2\ \ E\ .\ A\ \ B\ \ 8)_{16}$$
$$\therefore (11100101110\ .\ 111010111)_2 = (72E\ .\ AB8)_{16}$$

A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15
হেক্সাডেসিমালের সমতুল্য ডেসিমাল

উদাহরণ–২: $(111111001011\ .\ 10101101)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল নির্ণয় কর।

$$(1111\ \ 1100\ \ 1011\ .\ 1010\ \ 1101)_2$$
$$=(F\ \ C\ \ B\ .\ A\ \ D)_{16}$$
$$\therefore (111111001011\ .\ 10101101)_2 = (FCB.AD)_{16}$$

অকট্যাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর (Octal to Hexadecimal Conversion)

অকট্যাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে।

যথা: অকট্যাল → দশমিক → হেক্সাডেসিমাল।

অকট্যাল → বাইনারি → হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিটি তুলনামূলক সহজ ও সুবিধাজনক বলে নিম্নে উক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

i. কোনো অকট্যাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হলে প্রথমে সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে।

ii. অতঃপর বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের জন্য চারটি করে বাইনারি ডিজিট দিয়ে একটি করে হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক/ ডিজিট গঠন করতে হয়।

উদাহরণ: $(375\ .\ 246)_8$ এর হেক্সাডেসিমাল মান নির্ণয় কর।

$$(3\ \ 7\ \ 5\ .\ 2\ \ 4\ \ 6)_8$$
$$=(011\ \ 111\ \ 101\ .\ 010\ \ 100\ \ 110)_2$$
$$=(0000\ 1111\ 1101\ .\ 0101\ 0011\ 0000)_2$$
$$=(0\ \ F\ \ D\ .\ 5\ \ 3\ \ 0)_{16}$$
$$\therefore (375\ .\ 246)_8 = (F\ D\ .\ 530)_{16}$$

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অকটালে রূপান্তর (Hexadecimal to Octal Conversion)

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হতে অকট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর অকট্যাল হতে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের বিপরীত প্রক্রিয়ায়। হেক্সাডেসিমাল $\rightarrow$ দশমিক $\rightarrow$ অকট্যাল; হেক্সাডেসিমাল $\rightarrow$ বাইনারি $\rightarrow$ অকট্যাল বাইনারি সংখ্যাকে অকটালে রূপান্তরের জন্য তিনটি করে বাইনারি ডিজিট দিয়ে একটি করে অকট্যাল সংখ্যা গঠন করতে হয়।

উদা-১: $(8B\ .\ FCD)_{16}$ এর অকট্যাল মান নির্ণয় কর।

$(8\quad B\ .\ F\quad C\quad D)_{16}$

$=(1000\ \ 1011\ .\ 1111\ \ 1100\ \ 1101)_2$

$=(010\ 001\ 011.\ 111\ 111\ 001\ 101)_2$

$=(2\quad 1\quad 3\ .\ 7\quad 7\quad 1\quad 5)_8$

$\therefore (8B\ .\ FCD)_{16} = (213\ .\ 7715)_8$

উদা-২: $(2FC\ .\ BD)_{16}$ এর অকট্যাল মান নির্ণয় কর।

$(2\quad F\quad C\ .\ B\quad D)_{16}$

$=(0010\ \ 1111\ \ 1100\ .\ 1011\ \ 1101)_2$

$=(001\ 011\ 111\ 100\ .\ 101\ 111\ 010)_2$

$=(1\quad 3\quad 7\quad 4\ .\ 5\quad 7\quad 2)_8$

$\therefore (2FC\ .\ BD)_{16} = (1374.572)_8$

> হেক্সাডেসিমেল থেকে অকট্যালে রূপান্ড়র করার জন্য সমতুল্য ৪ বিট করে বাইনারিতে রূপান্ড়র করতে হয়। বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য ৩ বিট করে নিয়ে অকট্যালে রূপান্ড়র করতে হয়।

উদা–১: $(35.\ 625)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর।

i) $(35.625)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করঃ

পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে,

```
2 | 35
2 | 17 - 1   (LSB)
2 | 8 - 1
2 | 4 - 0
2 | 2 - 0
2 | 1 - 0
    0 - 1 (MSB)
```

$\therefore (35)_{10} = (100011)_2$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

```
        .625
           2
MSB 1 | .250
           2
    0 | .500
           2
LSB 1 | .000
```

$\therefore (.625)_{10} = (.101)_2$

$\therefore (35.625)_{10} = (100011.101)_2$

ii) $(35.625)_{10}$ সংখ্যাটিকে অকট্যালে রূপান্তরঃ

পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে,

```
8 | 35
8 | 4 - 3    LSB
    0 - 4    MSB
```

$\therefore (35)_{10} = (43)_8$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

```
  | .625
  |    8
5 | .000
```

$\therefore (.625)_{10} = (.5)_8$

$\therefore (35\ .\ 625)_{10} = (43.5)_8$

iii) $(35.625)_{10}$ সংখ্যাটিকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরঃ

পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে,

```
16 | 35
16 | 2 - 3    LSB
     0 - 2    MSB
```

$\therefore (35)_{10} = (23)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

```
       | .625
       |   16
(A) 10 | .000
```

$\therefore (.625)_{10} = (.A)_{16}$

$\therefore (35.625)_{10} = (23.A)_{16}$

উদাহরণ–২: 3FC কোন ধরনের সংখ্যা? সংখ্যাটির সমকক্ষ বাইনারি, অকট্যাল ও দশমিক মান নির্ণয় কর।

সমাধান: 3FC একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা।

i) 3FC সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর:

$(3\ \ F\ \ C)_{16}$

$= (0011\ 1111\ 1100)_2$

$\therefore (3FC)_{16} = (1111111100)_2$

ii) 3FC সংখ্যাটিকে অকট্যালে রূপান্তর:

$(3\ \ F\ \ C)_{16}$

$= (0011\ \ 1111\ \ 1100)_2$

$= (001\ 111\ \ 111\ \ 100)_2$

$= (1\quad 7\quad 7\quad 4)_8$

$\therefore (3FC)_{16} = (1774)_8$

iii) 3FC সংখ্যাটিকে দশমিকে রূপান্তর:

$(3FC)_{16} = 3\times16^2 + F\times16^1 + C\times16^0$

$= 3\times256 + 15\times16 + 12\times1$

$= 768 + 240 + 12$

$= (1020)_{10}$

$\therefore (3FC)_{16} = (1020)_{10}$

কাজ: $(175.75)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি, অকট্যাল ও হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর কর।

বাইনারি গণিত (Binary Arithmetic): বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতির মধ্যে বাইনারি গণিত তুলনামূলক সহজ ও সরল। এ পদ্ধতিতে মাত্র দুটি ডিজিট বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়, যথা: 0 ও 1। শুধুমাত্র এ দুটি ডিজিট ব্যবহার করে যাবতীয় গাণিতিক প্রক্রিয়া ও হিসাব-নিকাস সম্পন্ন করা হয়। এ কারণে কম্পিউটারসহ যাবতীয় ডিজিটাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ডিজাইন এবং উহাদের গাণিতিক হিসাব-নিকাসের কাজ বাইনারি পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়। নিম্নে বাইনারি যোগ (Binary Addition) ও বাইনারি বিয়োগ (Binary Subtraction) নিয়ে আলোচনা করা হলো–

৩.৩ বাইনারি যোগ-বিয়োগ (Binary Addition-Subtraction)

বাইনারি যোগ (Binary Addition): বাইনারি যোগ দশমিক পদ্ধতির যোগের অনুরূপ। বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো প্রযোজ্য। যথা:

বাইনারি পদ্ধতিতে 1 হলো সর্বোচ্চ ডিজিট। এ কারণে যোগের সময় 1 এর বেশি হলে ক্যারি এক (Carry One) তৈরি হবে এবং এ যথানিয়মে পূর্বের (বামের) ডিজিটের সাথে যোগ হবে। যেমন- 1 + 1 = 10 (দশ) হবে না। বলতে হবে শূন্য এবং হাতে থাকে এক যা প্রকৃতঃপক্ষে দশমিক পদ্ধতির 2 (দুই) এর সমান।

বাইনারি সংখ্যা	যোগফল	ক্যারি
0 + 0 =	0	0
0 + 1 =	1	0
1+0 =	1	0
1+1 =	0	1
1+1+1 =	1	1

উদাহরণ:

১. $(1001110)_2$ ও $(110111)_2$ যোগ কর:

$(1001110)_2$

$\underline{(110111)_2}$

$(10000101)_2$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল = $(10000101)_2$

২. $(11011.101)_2$ ও $(10110.110)_2$ যোগ কর:

$(11011\ .\ 101)_2$

$\underline{(10110\ .\ 110)_2}$

$(110010\ .\ 011)_2$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল = $(110010\ .\ 011)_2$

বাইনারি বিয়োগ (Binary Subtraction): বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগের অনুরূপ। বাইনারি বিয়োগ চারটি নিয়ম মেনে চলে। যথা: দশমিক পদ্ধতিতে ছোট সংখ্যা হতে বড় সংখ্যা বিয়োগ করলে যেমন পূর্ববর্তী অঙ্ক হতে 10 ধার নিতে হয়, তেমনি বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে ছোট সংখ্যা হতে বড় সংখ্যা বিয়োগ করলে (0 হতে 1) হাতে (Borrow One) ধার করা এক থাকে।

বাইনারি সংখ্যা	বিয়োগফল	আর/ক্যারি
0 – 0 =	0	0
1 – 0 =	1	0
1 – 1 =	0	0
0 – 1 =	1	1

বর্তমান প্রজন্মের কম্পিউটারে সাধারণ নিয়মে বিয়োগ করা হয় না। অধিকতর সুবিধার কারণে আধুনিক কম্পিউটার সিস্টেমে বিয়োগের জন্য পরিপূরক নিয়ম (Complement Subtraction) ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণঃ ১. $(110101)_2$ হতে $(10110)_2$ বিয়োগ কর।

```
 110101
  10110
 ------
 011111
```

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(011111)_2$

উদাঃ ২. $(110101.101)_2$ থেকে $(10110.110)_2$ বিয়োগ কর।

```
 110101.101
  10110.110
 ----------
 011110.111
```

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(011110.111)_2$

৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number)

বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বাইনারি মেশিনগুলোতে অর্থাৎ কম্পিউটারে সংখ্যা আট বিটে বিন্যস্ত হয়। যখন কোনো সংখ্যা ছোট হয় অর্থাৎ 8 বিটের কম হয় তখন ডানদিক থেকে সংখ্যা বসে বামদিকের বাকি ঘর শূন্য (0) দিয়ে পূরণ করে। সংখ্যাটি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সাধারণত সংখ্যার প্রকৃত মানের আগে একটি অতিরিক্তি বিট (Bit) যোগ করা হয়। এ অতিরিক্ত বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) বলে। চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটি ধনাত্মক এবং চিহ্নবিট 1 হলে সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক ধরা হয়।

আর চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইনড নম্বর (Signed number) বলা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন-বিট ছাড়া বাকি অঙ্কটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে।

নিম্নে একটি 8 বিট রেজিস্টারের ব্লকচিত্র দেয়া হলোঃ

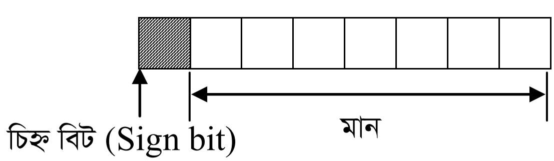

কোনো একটি সংখ্যা কত বিটের হবে তা নির্ভর করে রেজিস্টারটির শব্দ দৈর্ঘ্যের উপর। যেমন- 4 বিট, 8 বিট, 16 বিট, 32 বিট, 64 বিট, 128 বিট ইত্যাদি রেজিস্টার।

উদাহরণ স্বরূপঃ +25 ও –25 সংখ্যা দুটিকে যথাক্রমে 8 বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ দেখানো হলোঃ

+25	0	0	0	1	1	0	0	1

চিহ্ন বিট (Sign bit)

–25	1	0	0	1	1	0	0	1

চিহ্ন বিট (Sign bit)

ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা:

১. প্রকৃত মান গঠন (Signed magnitude form)
২. ১ এর পরিপূরক গঠন (1's Complement form)
৩. ২ এর পরিপূরক গঠন (2's Complement form)

প্রকৃত মান গঠন (Signed magnitude form)

প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে চিহ্ন প্রকাশের জন্য সাইন বিট (Sign Bit) ব্যবহার করা হয়। সংখ্যাটি ধনাত্মক হলে সাইন বিট 0 এবং ঋণাত্মক হলে সাইন বিট 1 হয়।

কিন্তু প্রকৃত মান গঠন সিস্টেমে ০ এর জন্য দুটি বাইনারি শব্দ (+ 0 ও – 0) ব্যবহৃত হয় যা বাস্তবে অসম্ভব। এ কারণে বর্তমানে এ পদ্ধতির কোনো প্রয়োগ নাই।

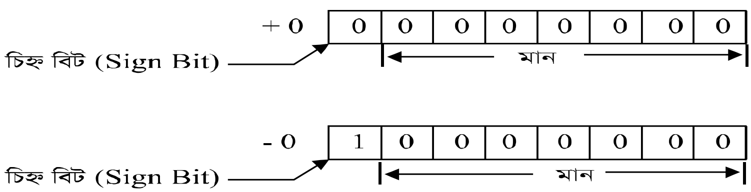

১ এর পরিপূরক গঠন (1's Complement form)

কোনো বাইনারি সংখ্যার ১ এর পরিপূরক বা 1's Complement বলতে ঐ সংখ্যার 1 এর স্থলে 0 এবং 0 এর স্থলে 1 দ্বারা প্রতিস্থাপন (Replacement) করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ–

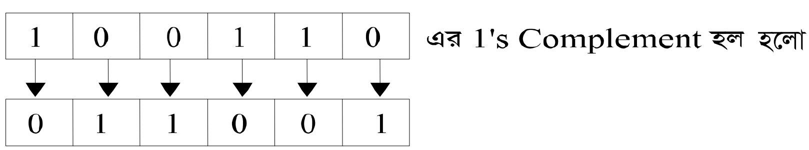

অর্থাৎ (100110) এর 1's Complement হলো = 011001

নিম্নে কয়েকটি সংখ্যার 1's Complement ৮ বিটবিশিষ্ট রেজিস্টারে দেখান হলো–

Binary Bit		1's Complement	
+17 (Sign Bit)	0 0 0 1 0 0 0 1	- 17 (Sign Bit)	1 1 1 0 1 1 1 0
+40 (Sign Bit)	0 0 1 0 1 0 0 0	- 40 (Sign Bit)	1 1 0 1 0 1 1 1
+94 (Sign Bit)	0 1 0 1 1 1 1 0	-94 (Sign Bit)	1 0 1 0 0 0 0 1

আধুনিক কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল সিস্টেমে 1's Complement এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩.৫ ২ এর পরিপূরক (2's Complement):

২ এর পরিপূরক গঠন (2's Complement Form)–

কোনো বাইনারি সংখ্যার ২ এর পরিপূরক বা 2's Complement বলতে ঐ সংখ্যার 1's Complement এর সাথে 1 যোগ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ গাণিতিকভাবে 2's Complement = 1's Complement + 1

উদাহরণস্বরূপঃ 110110 সংখ্যাটির 2’s Complement

001001 (1’s Complement)

+ 1

001010 (2’s Complement)

উদাহরণঃ $(+25)_{10}$ এর 8 বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে 2’s Complment নির্ণয় কর।

$(+25)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি মান = $(0\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1)_2$ (8 বিট রেজিস্টারে)

↓↓↓↓↓↓↓↓

1 1 1 0 0 1 1 0 (1’s Complement)

+1

1 1 1 0 0 1 1 1 (2’s Complement)

সুতরাং $(+25)_{10}$ এর 8 বিটবিশিষ্ট 2’s Complement = 11100111

২ এর পরিপূরকের গুরুত্ব

প্রকৃত মান, ১ এর পরিপূরক, ২ এর পরিপূরক গঠনে ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো তফাৎ নেই; সবক্ষেত্রে চিহ্ন-বিট ০ হয় ও সংখ্যাটির জন্য স্বাভাবিক বাইনারি গঠন ব্যবহার করা হয়। তবে ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গঠন; যেমন- প্রকৃত মান গঠন, ১ এর পরিপূরক গঠন ও ২ এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করা হয়।

২ এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

i) প্রকৃত-মান ও ১ এর পরিপূরক গঠনে ০ এর জন্য দুটি বাইনারি শব্দ (+০ ও –০) সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে +০ ও –০ বলতে কিছু নেই। বাস্তবে শুধু ০ আছে। ২ এর পরিপূরক গঠনে এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই।

ii) ২ এর পরিপূরক সংখ্যার জন্য গাণিতিক সরল বর্তনী প্রয়োজন। সরল বর্তনী দামে সস্তা এবং দ্রুত গতিতে কাজ করে।

iii) ২ এর পরিপূরক গঠনে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা এবং চিহ্নবিহীন সংখ্যা যোগ করার জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায়।

iv) ২ এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

বিপরীতকরণ/ নিগেশন (Negation)

বিপরীতকরণ বা নিগেশন বলতে কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক করাকে বোঝায়। বিপরীতকরণ বা নিগেশনের জন্য কোনো বাইনারি সংখ্যাকে 2’s Complment এ রূপান্তর করা হয়। বিপরীতকরণ করলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয়। যেমন- 8 বিটবিশিষ্ট + 27 ও – 27 এর বাইনারি মান যথাক্রমে + 27 = 00011011 এবং –27 = 10011011।

+ 27 এর নিগেশন + 27 = 00011011 এর 2’s Complement = 11100101= –27

+27 এর পুনঃনিগেশন = 00011011 = + 27

সুতরাং কোনো সংখ্যার পুনঃনিগেশন করলে সেটির মানও চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না।

2's Complement হতে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

যদি কোনো সংখ্যা 2's Complement বা 2 এর পরিপূরক অবস্থায় থাকে তবে তাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে প্রথমে সংখ্যাটিকে 1's Complement এ রূপান্তর করতে হবে। অতঃপর প্রাপ্ত সংখ্যাটির সাথে 1 যোগ করতে হবে। তাহলে সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কোনো সংখ্যার বাইনারি মান = সংখ্যাটির 1's Complement + 1

উদাহরণ: 01011011 সংখ্যাটি 2's Complement এ আছে। সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় কর।

সমাধান: 01011011সংখ্যাটি 1's Complement মান = 10100100

$$
\begin{array}{r}
10100100 \\
+1 \\
\hline
= 10100101
\end{array}
$$

সুতরাং 01011011 সংখ্যাটির বাইনারি মান = 10100101

2's Complement ব্যবহার করে যোগ (2's Complement Addition)

কম্পিউটারের মাধ্যমে গাণিতিক বিভিন্ন মৌলিক ক্রিয়া (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) সম্পাদনের ক্ষেত্রে 2's Complement একটি বহুল জনপ্রিয় পদ্ধতি।

২ এর পরিপূরক যোগ

২ এর পরিপূরক যোগের সময় বিটের সংখ্যা সমান হতে হয়। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলে–

১. সাধারণ বাইনারি যোগ করে।
২. ঋণাত্মক সংখ্যাকে ২ এর পরিপূরক করে যোগ করে।
৩. চিহ্ন বিটের পর ক্যারি বিট বাদ দেয়া হয়।
৪. ফলাফল ঋণাত্মক হলে (চিহ্ন বিট 1 হলে) তা 2-এর পরিপূরক আকারে হয়।

2 এর পরিপূরক যোগে এবং বিয়োগে সংখ্যার চিহ্ন-বিটকে পরিমাণ জ্ঞাপক অঙ্ক হতে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় না। উল্লেখ্য যে, গাণিতিক যোগ ও বিয়োগের সময় উভয় সংখ্যায় বিটের সংখ্যা সমান হতে হয়। নিম্নে 8 বিট সংখ্যার জন্য যোগের প্রক্রিয়া দেখানো হলো।

সমস্যা ও সমাধান: দুটি ধনাত্মক সংখ্যা:

নিম্নে 8 বিট রেজিস্টারের জন্য $(+25)_{10}$ ও $(+12)_{10}$ এর যোগফল নির্ণয় করা হলো।

$$
\begin{array}{lcl}
(+25)_{10} & : & (00011001)_2 \\
(+12)_{10} & : & (00001100)_2 \\
\hline
(+37)_{10} & : & (00100101)_2
\end{array}
$$

যেহেতু যোগফলের চিহ্নবিট 0, সেহেতু ফলাফল ধনাত্মক। সুতরাং যোগফল $(00100101)_2$ বা $(+37)_{10}$।

বড় ধনাত্মক ও ছোট ঋণাত্মক: নিম্নে 8 বিট রেজিস্টারের জন্য $(+25)_{10}$ ও $(-12)_{10}$ এর যোগফল নির্ণয় করা হলো।

$$
\begin{array}{lcl}
(+25)_{10} & : & (00011001)_2 \\
(-12)_{10} & : & (11110100) \\
\hline
(+13)_{10} & : & \boxed{1}(00001101)_2
\end{array}
$$

ক্যারি বিট চিহ্ন বিট

$$
\begin{array}{lll}
12 \rightarrow & (00001100)_2 & \\
 & 11110011 & \text{(1's complement)} \\
 & 1 & \\
\hline
(-12)_{10} \rightarrow & (11110100) & \text{(2's complement)}
\end{array}
$$

চিহ্ন বিট

অতিরিক্ত ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু sign Bit 0 সেহেতু ফলাফল ধনাত্মক।
সুতরাং যোগফল $(00001101)_2$ বা $(+13)_{10}$

বড় ঋণাত্মক ও ছোট ধনাত্মক: নিম্নে 8 বিট রেজিস্টারের জন্য $(-25)_{10}$ ও $(+12)_{10}$ এর যোগফল নির্ণয় করা হলো।

$$\begin{array}{lr} (-25)_{10} \rightarrow & (11100111) \\ (+12)_{10} \rightarrow & (00001100)_2 \\ \hline (-13)_{10} \rightarrow & (11110011) \end{array}$$

$$\begin{array}{llr} (+25)_{10} \rightarrow & (00011001)_2 & \\ & (11100110) & \text{(1's complement)} \\ & 1 & \\ \hline (-25)_{10} \rightarrow & (11100111) & \text{(2's Complement)} \end{array}$$

যেহেতু যোগফলের Sign bit 1 সেহেতু ফলাফল ঋণাত্মক। ঋণাত্মক ফলাফল সবসময় ২ এর পরিপূরক গঠন থাকে। অতএব ২ এর পরিপূরক করে প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাবে। অতএব 11110011 এর ২ এর পরিপূরক 00001101।

$\therefore$ নির্ণেয় ফলাফল $= (11110011)_2$ বা $(-13)_{10}$।

দুটি ঋণাত্মক সংখ্যা: নিম্নে 8 বিট রেজিস্টারের জন্য $(-25)_{10}$ ও $(-12)_{10}$ এর যোগফল নির্ণয় করা হলো।
+25 ও +12 এর ২ এর পরিপূরক যথাক্রমে 11100111 ও 11110100

$$\begin{array}{lr} (-25)_{10} \rightarrow & (11100111) \\ (-12)_{10} \rightarrow & (11110100) \\ \hline (-37)_{10} \rightarrow & \boxed{1}\ (11011011) \end{array}$$

অতিরিক্ত ক্যারিবিট বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু Sign Bit 1 সেহেতু ফলাফল ঋণাত্মক এবং 2 এর পরিপূরক গঠনে আছে। সুতরাং 11011011 এর 2 এর পরিপূরক 00100101 অর্থাৎ ফলাফল $(11011011)_2$ বা $(-37)_{10}$।

বিপরীত চিহ্নের সমান সংখ্যা:

$$\begin{array}{lr} (+25)_{10} \rightarrow & (00011001)_2 \\ (-25)_{10} \rightarrow & (11100111) \\ \hline 0 \rightarrow & \boxed{1}\ (00000000) \end{array}$$

অতিরিক্ত ক্যারিটি বিবেচনা করা হয় না। কাজেই ফলাফল 0 ।

2's Complement ব্যবহার করে বিয়োগ (2's Complement Subtraction)

১. দুয়ের পরিপূরকের বিয়োগ পদ্ধতি: (বড় থেকে ছোট)

i. যে সংখ্যা বিয়োগ করা হবে, তার বামদিকে শূন্য বসিয়ে, যেই সংখ্যা (যাহা) থেকে বিয়োগ করা হবে, সেই সংখ্যার সমান করতে হবে।

ii. যা বিয়োগ করা হবে, তার একের পূরক বের করতে হবে।

iii. একের পূরকের সাথে 1 যোগ করে দুয়ের পূরক বের করতে হবে।

iv. এ দুয়ের পূরক, যা থেকে বিয়োগ করা হবে, তার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

v. যদি carry থাকে (হাতে যদি 1 থাকে) তা নির্ণেয় যোগফল থেকে বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ দুয়ের পূরকে carry বাদ দিতে হবে।

উদাহরণ-১: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(+35)_{10}$ থেকে $(+17)_{10}$ বিয়োগ কর।

সমাধান: $(+35)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা = $(00100011)_2$ (8 বিট রেজিস্টারে)

$(+17)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা = $(00010001)_2$ (8 বিট রেজিস্টারে)

$(11101110)_2$ (1's Complement)

$+ 1$

$(-17)_{10} = (11101111)$ (2's Complement)

$$\begin{array}{lcl} (+35)_{10} & = & (00100011)_2 \\ (-17)_{10} & = & (11101111) \\ \hline (+18)_{10} & = & \boxed{1}\,(00010010)_2 \end{array}$$

অতিরিক্ত ক্যারিবিট বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু Sign bit শূন্য সেহেতু ফলাফল ধনাত্মক।

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00010010)_2$ বা $(+18)_{10}$

উদাহরণ-২: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(+17)_{10}$ থেকে $(+35)_{10}$ বিয়োগ কর।

সমাধান: $(+17)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা = $(00010001)_2$ (8 বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে)

$(+35)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা = $(00100011)_2$ (8 বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে)

(11011100) (1's Complement)

$+1$

$(-35)_{10} = (11011101)$ (2's Complement)

$$\begin{array}{l} (+17)_{10} = (00010001)_2 \\ (-35)_{10} = (11011101) \\ \hline (-18)_{10} = (11101110) \end{array}$$

যেহেতু Sign bit 1 সেহেতু ফলাফল ঋণাত্মক। অতএব ২ এর পরিপূরক করে প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাবে।

$(11101110)_2$

(00010001) (1's Complement)

$+ 1$

(00010010) (2's Complement)

∴ নির্ণেয় বিয়োগফল = (11101110) বা $(-18)_{10}$

উদাহরণ-৩: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(-80)_{10}$ থেকে $(-35)_{10}$ বিয়োগ কর।

$(+80)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা = $(01010000)_2$

$(+35)_{10}$ " " " " = $(00100011)_2$

10101111 (1's Complement)

$+1$

$(+80)_{10}$ এর 2 এর পরিপূরক = (10110000) (2's Complement)

00100011 এর Re-Complement = 00100011

$$
\begin{array}{l}
(-80)_{10} = (10110000) \\
(+35)_{10} = (00100011)_2 \\
\hline
(-45)_{10} = (11010011)
\end{array}
$$

যেহেতু Sign bit 1 সেহেতু ফলাফল ঋণাত্মক। অতএব ২ এর পরিপূরক করে প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাবে।

$$
\begin{array}{rl}
11010011 & \\
00101100 & \text{(1's Complement)} \\
1 & \\
\hline
00101101 & \text{(2's Complement)}
\end{array}
$$

$\therefore$ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(11010011)_2$ বা $(-45)_{10}$

উদাহরণ-৪: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(110101)_2$ থেকে $(10110)_2$ বিয়োগ কর (8 বিট রেজিস্টার সাপেক্ষে)।

সমাধান : 10110 = 0 0 0 1 0 1 1 0 আসল বাইনারি সংখ্যা (8 বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে)

$$
\begin{array}{rl}
\downarrow\downarrow\ \downarrow\downarrow\ \downarrow\ \downarrow\downarrow\ \downarrow & \\
1\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1 & \text{(1's Complement)} \\
+1 & \\
\hline
1\,1\,1\,0\,1\,0\,1\,0 & \text{(2's Complement)}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcll}
110101 & \rightarrow & 00110101 & \\
10110 & \rightarrow & \underline{11101010} & \text{(2's Complement)} \\
 & & \boxed{1}\ (00011111) &
\end{array}
$$

অতিরিক্ত ক্যারিবিট বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু Sign bit শূন্য সেহেতু ফলাফল ধনাত্মক।

$\therefore$ নির্ণেয় বিয়োগফল = $(00011111)_2$

কাজ: ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(+85)_{10}$ থেকে $(+40)_{10}$ বিয়োগ কর।

৩.৬ কোড (Code)

আমরা কম্পিউটারে যেসব ডেটা ও তথ্য ইনপুট করি কম্পিউটার তা সরাসরি বুঝতে পারে না। কারণ কম্পিউটারসহ সকল আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরীণ কাজ করা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর কারণ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির '0' এবং '1' কে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব। অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রতীকের সংখ্যা বেশি বলে তা প্রচলিত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি দিয়ে উপস্থাপন অনেকটা অসম্ভব। যেহেতু কম্পিউটার একটি আধুনিক ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র এবং এর অভ্যন্তরীণ কাজ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয়, ফলে কম্পিউটারে ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্ণ, অঙ্ক, সংখ্যা, চিহ্ন, প্রতীক ইত্যাদিকে বাইনারি পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয়।

বর্ণ, অঙ্ক, প্রতীক ও চিহ্নসমূহকে বাইনারিতে রূপান্তরের এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় এনকোডিং। অর্থাৎ "কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, অঙ্ক, সংখ্যা, প্রতীক বা বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে CPU কে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিটের (0 বা 1) বিভিন্ন বিন্যাসের অদ্বিতীয় (Unique) সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কোড (Code) বলা হয়। "কম্পিউটার এ কোডের সাহায্যে প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার পর

প্রাপ্ত ফলাফলকে মানুষের বোধগম্য করার লক্ষ্যে আবার বর্ণ, অঙ্ক, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নে রূপান্তর করা হয়। রূপান্তরের এ প্রক্রিয়াকে ডিকোডিং (Decoding) বলে। কম্পিউটারে এনকোডিং বিভিন্ন উপায়ে করা হয়ে থাকে।

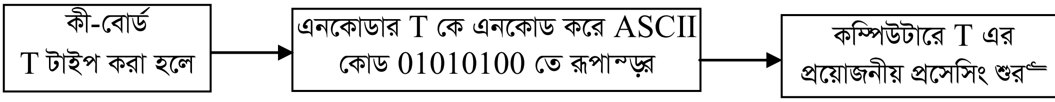

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির দুটি মৌলিক অঙ্ক '0' ও '1' এর মাধ্যমে বিভিন্ন অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। যেমন- ২, ৪, ৭ এবং ৮টি বিট দিয়ে সর্বোচ্চ ৪(= $২^{২}$), ১৬ (= $২^{৪}$), ১২৮ (= $২^{৭}$) এবং ২৫৬ (= $২^{৮}$) টি পৃথক অদ্বিতীয় সংকেত গঠন করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, কম্পিউটারের জন্য প্রতিটি অঙ্ক, বর্ণ বা বিশেষ চিহ্নকে এক একটি ক্যারেক্টার (Character) বা চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি ক্যারেক্টারের জন্য কয়টি বিট প্যাটার্নের প্রয়োজন তা নির্ভর করে কোন পদ্ধতির কোড ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর। প্রয়োগের ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের কোডের উদ্ভব হয়েছে। যেমন–

১. বিসিডি (BCD) কোড
২. ইবিসিডিক (EBCDIC) কোড
৩. আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric code)
৪. অ্যাসকি (ASCII) কোড
৫. ইউনিকোড (Unicode) ইত্যাদি।

নিম্নে বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কোড নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

বিসিডি (BCD) কোড

BCD এর পূর্ণ রূপ হলো Binary Coded Decimal। BCD কোড দ্বারা কেবলমাত্র দশমিক পদ্ধতির প্রতীকগুলোকে কোড করা হয়। বর্ণমালার বর্ণ বা অন্য কিছুর জন্যে BCD কোড নেই বা ব্যবহার হয় না। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে (0 থেকে 9) পর্যন্ত এর সমতুল্য ৪ (চার) বিট বাইনারি ডিজিট দ্বারা প্রতিস্থাপন করাকে BCD কোড বলে। ৪ বিট ব্যবহারের কারণে BCD কোডের মাধ্যমে $২^{৪}$ বা ১৬টি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করা যায়। অন্যকথায় BCD কোড একটি ৪ (চার) বিট বাইনারিভিত্তিক কোড। এ চার বিটের সমন্বয়ে অনেক প্রকার BCD কোড তৈরি করা যায়। নিম্নে কয়েক ধরনের BCD কোডের নাম দেয়া হলো।

BCD 8421 কোড
BCD 5421 কোড
BCD 2421 কোড
BCD 7421 কোড
BCD 6423 কোড ইত্যাদি।

দশমিক প্রতীক	বিসিডি 8421	দশমিক প্রতীক	বিসিডি 8421
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

চিত্রঃ দশমিক প্রতীক ও সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা।

তবে BCD 8421 কোড বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য এবং বহুল ব্যবহৃত কোড।

এখানে BCD 8421 কোড Natural Binary Coded Decimal (NBCD) কোড আলোচনা করা হলো।

1010, 1011, 1100, 1101 এবং 1111 কোডগুলো অব্যবহৃত থাকে বলে বিসিডিতে এদের ব্যবহার অবৈধ।

বিসিডিতে প্রকাশিত (রূপান্তরিত নয়) কোনো দশমিক সংখ্যা প্রকৃতঃপক্ষে একটি উপস্থাপন মাত্র, এটি কোনো সংখ্যা নির্দেশ করে না। সে কারণে যে কোনো সংখ্যার সর্ববামের শূন্য যেমন অর্থহীন এবং বাদ দেয়া যায়, বিসিডিতে প্রকাশিত কোনো সংখ্যার বেলায় তা করা যাবে না।

উদাহরণ-১: 253_{10} কে বিসিডিতে প্রকাশ কর।

সমাধান:

2	5	3
0010	0101	0011

$\therefore (253)_{10} = (001001010011)_{BCD}$

উদাহরণ-২: 100101110010_{BCD} কে দশমিকে প্রকাশ কর।

সমাধান:

1001	0111	0010
9	7	2

$\therefore (100101110010)_{BCD} = (972)_{10}$

কাজঃ বিসিডি (BCD) কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

ইবিসিডিআইসি (EBCDIC) কোড

EBCDIC কোডের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি একটি 8 বিটের কোড। একে এক্সটেনডেন্ট ইবসিডিআইসি কোডও বলা হয়। এ কোড দ্বারা 2^8 "অর্থাৎ 256 টি অঙ্ক, অক্ষর এবং বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করা যায়। এ কোড প্রাথমিকভাবে আইবিএম 360 এবং 370 সিরিজের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো। এ কোডে 0 থেকে 9 সংখ্যার জন্য 1111, A থেকে Z বর্ণের জন্য 1100, 1101 ও 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0101, 0110 ও 0111 জোন বিট ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যাগুলোকে 8421 কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রত্যেক সংখ্যার সাথে 1111 জোন বিট যোগ করে ইবিসিডিআইসি কোড প্রকাশ করা হয়। মনে করি 5, কে ইবিসিডিআইসি কোডে প্রকাশ করতে হবে। তাহলে 5 এর বিসিডি 8421 কোডে মান হবে 0101। সুতরাং, 5 এর ইবিসিডিআইসি কোডে মান হবে 11110101।

আলফানিউমেরিক কোড

কম্পিউটারে সংখ্যাসূচক চিহ্নের পাশাপাশি অন্যান্য বর্ণ বা চিহ্নও ব্যবহৃত হয়। এসব সংখ্যা, চিহ্ন বা বর্ণের জন্য যে কোড ব্যবহৃত হয় তাকে আলফানিউমেরিক কোড বলে। একটি সম্পূর্ণ আলফানিউমেরিক কোডে ২৬টি ছোট অক্ষর (a–z), ২৬টি বড় অক্ষর (A–Z), দশটি অঙ্ক (0–9) সাতটি বিরাম চিহ্ন (কমা, সেমিকোলন) ইত্যাদি, গাণিতিক চিহ্নসহ (+, −, ×, ÷) ও অন্যান্য চিহ্ন (!, @, #, $, %, *, /) ইত্যাদি রয়েছে। এ কারণেই আলফানিউমেরিক কোডের উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া আলফানিউমেরিক কোড ডেটা কমিউনিকেশন ও ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও আনয়ন করেছে।

কতকগুলো জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোড হলো–

- অ্যাসকি (ASCII) কোড
- ইবিসিডিকে EBCDIC কোড ও
- ইউনিকোড (Unicode) ইত্যাদি।

কাজঃ আলফানিউমেরিক কোড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অ্যাসকি (ASCII) কোড

অ্যাসকি আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত কোড। এর প্রকাশক আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্সস্টিটিউট (ANSI)। ASCII-এর পূর্ণ নাম American Standard Code For Inofrmation Interchange. ১৯৬৫ সালে রবার্ট বিমার ৭ বিটের অ্যাসকি কোড উদ্ভাবন করেন। মিনি ও মাইক্রো কম্পিউটারে এ কোডের বহুল প্রচলন রয়েছে। কম্পিউটার এবং ইনপুট/আউটপুট সরঞ্জামের মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের জন্য এ কোড ব্যবহৃত হয়। অ্যাসকি কোড দুধরনের হয়ে থাকে। যথা: অ্যাসকি-৭ ও অ্যাসকি-৮। অ্যাসকি-৭ এর ৭ বিট দ্বারা মোট $২^{৭}$= ১২৮ টি অদ্বিতীয় (Unique) চিহ্ন নির্দিষ্ট করা যায়। এ অ্যাসকি কোডের বামদিকের তিনটি বিটকে জোন (Zone) বিট এবং ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক (Numeric) বিট বলে। যেমন–

A=							
	1	0	0	0	0	0	1
	← Zone bit →			← Numeric bit →			

অ্যাসকি-৭ কোডের বামে একটি অতিরিক্ত বিট যুক্ত করে অ্যাসকি-৮ তৈরি করা হয়েছে। এ অতিরিক্ত বিটটি প্যারিটি বিট নামে পরিচিত। অ্যাসকি-৮ এর ৮ বিট দ্বারা মোট $২^{৮}$ = ২৫৬ অদ্বিতীয় (Unique) চিহ্ন নির্দিষ্ট করা যায়। এ অ্যাসকি কোডের বামদিকের তিনটি বিটকে জোন (Zone) বিট এবং ডান দিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক (Numeric) বিট বলে। বর্তমানে অ্যাসকি কোড বলতে ৮ বিট বিশিষ্ট অ্যাসকি-৮কেই বুঝানো হয়। যেমন–

A=							
0	1	0	0	0	0	0	
Parity Bit	← Zone bit →			← Numeric bit →			

নিচের অ্যাসকি সারণিতে 0 থেকে 31 পর্যন্ত ক্যারেক্টারের জোন বিট '000', এবং এ ক্যারেক্টারগুলোসহ 127 কে নিয়ন্ত্রণ ক্যারেক্টার বলে, 32 থেকে 64 হচ্ছে বিশেষ ক্যারেক্টার, 65 থেকে 96 হচ্ছে বড় হাতের অক্ষর ও কিছু চিহ্ন, 97 থেকে 127 হচ্ছে ছোট হাতের অক্ষর ও কিছু চিহ্ন।

সারণি: কিছু ASCII কোডের তালিকা

ASCII Code	Decimal Equivalent	Character	ASCII Code	Decimal Equivalent	Character
0000 0000 থেকে 0000 0000	0 থেকে 31	বিভিন্ন ধরনের কমান্ড যা বিশেষ করে প্রিন্টার কিংবা ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা হয়।	01001110	78	N
			01001111	79	O
			01010000	80	P
			01010001	81	Q
00100000	32	Blank Space	01010010	82	R
00100001	33	!	01010011	83	S
00100010	34	æ	01010100	84	T
00100011	35	#	01010101	85	U
00100100	36	$	01010110	86	V
00100101	37	%	01010111	87	W
00100110	38	&	01011000	88	X
00100111	39	'	01011001	89	Y
00101000	40	(	01011010	90	Z
00101001	41	)	01011011	91	[

00101010	42	*	01011100	92	\
00101011	43	+	01011101	93	]
00101100	44	,	01011110	94	^
00101101	45	-	01011111	95	_
00101110	46	.	01100000	96	`
00101111	47	/	01100001	97	a
00110000	48	0	01100010	98	b
00110001	49	1	01100011	99	c
00110010	50	2	01100100	100	d
00110011	51	3	01100101	101	e
00110100	52	4	01100110	102	f
00110101	53	5	01100111	103	g
00110110	54	6	01101000	104	h
00110111	55	7	01101001	105	i
00111000	56	8	01101010	106	j
00111001	57	9	01101011	107	k
00111010	58	t	01101100	108	l
00111011	59	;	01101101	109	m
00111100	60	<	01101110	110	n
00111101	61	=	01101110	111	o
00111110	62	>	01101111	112	p
00111111	63	?	01110000	113	q
01000000	64	@	01110010	114	r
01000001	65	A	01110011	115	s
01000010	66	B	01110100	116	t
01000011	67	C	01110101	117	u
01000100	68	D	01110110	118	v
01000101	69	E	01110111	119	w
01000110	70	F	01111000	120	x
01000111	71	G	01111001	121	y
01001000	72	H	01111010	122	z
01001001	73	I	01111011	123	{
01001010	74	J	01111100	124	|
01001011	75	K	01111101	125	}
01001100	76	L	01111110	126	~
01001101	77	M	01111111	127	Delete

ইউনিকোড (Unicode): পৃথিবীতে কেবল ইংরেজি-বাংলাই নয় আরো অনেক ভাষা রয়েছে। এসব ভাষায় আবার বর্ণের সংখ্যাও অনেক। যেমন- চীনা ভাষায় প্রায় ৮৫ হাজার বর্ণ রয়েছে। Unicode এর পূর্ণনাম হলো Universal Code বা সার্বজনীন কোড। বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছেন যাকে ইউনিকোড বলা হয়। ১৯৯১ সালে Apple Computer Corporation এবং Xerox Corporation এর যৌথ একদল প্রকৌশলী ইউনিকোড উদ্ভাবন করেন। ইউনিকোড মূলত 2 বাইট বা 16 বিটের কোড। এ কোডের মাধ্যমে 65,536 বা 2^{16} টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। ফলে যেসব ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য 8 বিট অপর্যাপ্ত ছিল (যেমন- চায়নিজ, কোরিয়ান, জাপানিজ ইত্যাদি) সেসব ভাষার সকল চিহ্নকে সহজেই কোডভুক্ত করা সহজতর হলো। বর্তমানে এ কোডের প্রচলন শুরু হয়েছে।

শুরু থেকেই ইউনিকোডকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে Unicode Consortium কাজ করে যাচ্ছেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে ইউনিকোড ভার্সন ৩ বেরিয়েছে। অনেক পরে হলেও বাংলা ভাষাকে ইউনিকোডভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার Unicode Consortium এর সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা:

১. এটি ১৬ বিটবিশিষ্ট কোড। ফলে ৬৫৫৩৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
২. বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করা যায়।
৩. ক্যারেক্টারকে কোড করার জন্য ১৬ বিটই ব্যবহার করা যায়।
৪. ইউনিকোড থেকে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড কোডে পরিবর্তন করা যায়।

৩.৭ বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার উদ্ভাবক হলেন ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুলি (George Boole)। ১৮৫৪ সালে জর্জ বুলি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, গণিত ও যুক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। গণিত ও যুক্তির যোগসূত্র প্রমাণের জন্য গেইট ও যুক্তি বর্তনী ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: জর্জ বুলি

জর্জ বুলি æMathematics of logic” নামে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গবেষণা গ্রন্থে যুক্তির যে ধারণা পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো নতুন অ্যালজেবরা। তাঁর নাম অনুসারে এ অ্যালজেবরাকে নামকরণ করা হয় বুলিয়ান অ্যালজেবরা। এটি যুক্তি অ্যালজেবরা বা বুলিয়ান বীজগণিত নামেও পরিচিত। বুলিয়ান অ্যালজেবরা মূলত লজিকের সত্য অথবা মিথ্যা- এ দুটি স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বুলিয়ান অ্যালজেবরার এ দুটি অবস্থার (State) জন্য পরবর্তী সময়ে যখন কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হয়, তখন বুলিয়ান অ্যালজেবরার সত্য ও মিথ্যাকে বাইনারির "1" এবং “0” দ্বারা পরিবর্তন করে নিতেই কম্পিউটারের সমস্ত গাণিতিক সমস্যা বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে করা সম্ভব হয়।

কোনো সার্কিটে বিদ্যুতের উপস্থিতিকে 1 ধরা হয় এবং বিদ্যুতের অনুপস্থিতিকে 0 ধরা হয়। ডিজিটাল সিস্টেমে ভোল্টেজ লেভেল 0 থেকে .8 ভোল্টকে লজিক 0 ধরা হয় এবং ভোল্টেজ লেভেল 2 থেকে 5 ভোল্টকে লজিক 1 ধরা হয়। ডিজিটাল সিস্টেমে +0.8 ভোল্ট থেকে +2 ভোল্ট লেভেল সংজ্ঞায়িত নয় বিধায় ব্যবহার করা হয় না।

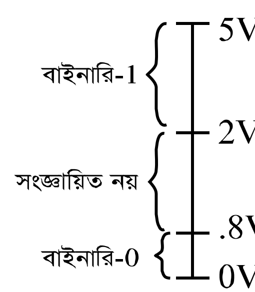

বুলিয়ান চলকের দুটি মান থাকায় বুলিয়ান অ্যালজেবরা দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় অনেক সহজ পদ্ধতি। বুলিয়ান অ্যালজেবরার কোনো ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় না।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার তিন ধরনের মৌলিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। ক্রিয়াগুলো হলো–

১. অর অপারেশন (OR Operation) বা যৌক্তিক যোগ (Logical Addition)
২. অ্যান্ড অপারেশন (AND Operation) বা যৌক্তিক গুণ (Logical Multiplication)
৩. নট অপারেশন (NOT Operation) বা যৌক্তিক উল্টানো (Logical Inversion)

এ তিনটি মৌলিক ক্রিয়ার জন্য তিন ধরনের লজিক বর্তনী ব্যবহার করা হয়। এ লজিক বর্তনীগুলো হলো অর (OR), অ্যান্ড (AND) এবং নট (NOT)। এসব লজিক বর্তনীগুলো মৌলিক লজিক গেইট নামে পরিচিত।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Boolean Algebra)

১. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মাত্র দুটি অঙ্ক '0' এবং '1' ব্যবহৃত হয়।
২. বুলিয়ান চলকের দুটি মান থাকায় বুলিয়ান অ্যালজেবরা দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় অনেক সহজ পদ্ধতি।
৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোনো ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না।
৪. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র যোগ ও গুণের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা যায়।
৫. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোনো ধরনের জ্যামিতিক বা ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না।

বুলিয়ান চলক ও ধ্রুবক (Boolean Variable and Constant)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় দুটি বাইনারি অঙ্ক 0 এবং 1 ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সংকেতকে দুটি পৃথক বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। অর্থাৎ ডিজিটাল বর্তনীর কোনো স্থানের প্রবাহিত বিদ্যুৎ বা ভোল্টেজের পরিমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্থানটি উচ্চ স্তরে প্রবাহিত হচ্ছে অথবা নিম্ন স্তরের ভোল্টেজ প্রবাহিত হচ্ছে। এ দুটি স্তরকে নির্দিষ্ট করা হয় যথাক্রমে '1' এবং '0' দ্বারা। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যার মান সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলে। যেমন- $A = 0 + 1$, এখানে 0 এবং 1 হচ্ছে বুলিয়ান ধ্রুবক। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যার মান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে বুলিয়ান চলক বলে। যেমন- $C = A + B$, এখানে A ও B হচ্ছে বুলিয়ান চলক। ধ্রুবকের মান সব সময় অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু চলকের মান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীর ইনপুট ও আউটপুটের লজিক অবস্থা নির্দিষ্ট করার জন্য বুলিয়ান চলক ও ধ্রুবক ব্যবহার করা হয়।

বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Boolean Postulates)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয় যৌক্তিক যোগ এবং যৌক্তিক গুণের সাহায্যে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের নিয়মগুলোকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলে। বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. যোগের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Boolean Postulates of OR)
২. গুণের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Boolean Postulates of AND)

যোগের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Boolean Postulates of OR)

যোগের সময় বুলিয়ান অ্যালজেবরা যেসব নিয়ম মেনে চলে তাকে যোগের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলে। যোগের সময় বুলিয়ান চলকগুলোর মানের মধ্যে যে যোগ চিহ্ন (+) ব্যবহার করা হয় তা প্রচলিত যোগের চিহ্ন নয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় এ যোগ চিহ্নকে লজিক্যাল যোগ বা (Logical OR) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যোগের চারটি নিয়ম প্রচলিত। যথা–

(1) $0 + 0 = 0$
(2) $0 + 1 = 1$
(3) $1 + 0 = 1$
(4) $1 + 1 = 1$

প্রথম তিনটি সমীকরণ সাধারণ বীজগণিতের নিয়ম মেনে চলছে কিন্তু 4নং সমীকরণ $1+1=1$ এর সাথে সাধারণ বীজগণিতের কোনো মিল নেই। সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগ (+) চিহ্ন এবং সাধারণ

+ চিহ্নকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগকে বলা হয় লজিক্যাল অ্যাডিশন (Logical Addition) অথবা লজিক্যাল অর অপারেশন (Logical OR Operation)।

উপরের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ থেকে বলা যায় যে, বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যোগের (OR) ক্ষেত্রে যেকোনো একটির মান 1 হলে যোগফল 1 হবে, অন্যথায় 0 হবে।

গুণের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Boolean Postulates of AND)

গুণের সময় বুলিয়ান অ্যালজেবরা যেসব নিয়ম মেনে চলে তাকে গুণের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলে। গুণের সময় বুলিয়ান চলকগুলোর মানের মধ্যে গুণ চিহ্ন (.) ব্যবহার করা হয়। লজিক গুণের চারটি নিয়ম প্রচলিত। যথা:

(1) $0 . 0 = 0$
(2) $0 . 1 = 0$
(3) $1 . 0 = 0$
(4) $1 . 1 = 1$

উপরের বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় যে বুলিয়ান অ্যালজেবরায় গুণের (AND) ক্ষেত্রে যেকোনো একটির মান 0 হলে গুণফল 0 হবে, অন্যথায় 1 হবে। বুলিয়ান গুণকে লজিক্যাল মাল্টিপ্লিকেশন (Logical Multiplication) অথবা লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেশন (Logical AND Operation) বলা হয়।

বুলিয়ান পূরক (Boolean Complement)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যেকোনো চলকের মান 0 অথবা 1 হয়। এ 0 এবং 1 কে একটি অপরটির বুলিয়ান পূরক বলা হয়। বুলিয়ান পূরকে ‘ – ’ বা ‘ ' ’ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন: 0 এর বুলিয়ান পূরক 1 এবং 1 এর বুলিয়ান পূরক 0। গণিতের ভাষায় লেখা হয়

A এর পূরক $\overline{A}$ বা A'

যদি A এর মান 0 হয় তবে $\overline{A} = 1$

যদি A এর মান 1 হয় তবে $\overline{A} = 0$

বুলিয়ান বীজগণিতে পূরকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুলিয়ান বীজগণিতে অঙ্ক করতে গেলে প্রায়ই পূরক নির্ণয় করতে হয়।

বুলিয়ান পূরকের সূত্র:

1. $\overline{0} = 1$
2. $\overline{1} = 0$
3. $\overline{\overline{A}} = A$

বুলিয়ান দ্বৈত নীতি (Boolean Duality Principle)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ যে দুটি নিয়ম মেনে একটি বৈধ সমীকরণ থেকে আর একটি বৈধ সমীকরণ নির্ণয় করা যায় তাকে বুলিয়ান দ্বৈত নীতি বলে। অর্থাৎ বুলিয়ান অ্যালজেবরায় অর (OR) এবং অ্যান্ড (AND) সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ দ্বৈত নীতি মেনে চলে। এ নিয়ম দুটি হলো–

১. 0 এবং 1 পরস্পর বিনিময় করে অর্থাৎ 0 এর পরিবর্তে 1 এবং 1 এর পরিবর্তে 0 ব্যবহার করে।

২. অর (+) এবং অ্যান্ড (.) পরস্পর বিনিময় করে অর্থাৎ অর (+) এর পরিবর্তে অ্যান্ড (.) এবং অ্যান্ড (.) এর পরিবর্তে অর (+) ব্যবহার করে।

উদাহরণ: $1 + 1 = 1$ সমীকরণে

1 এর পরিবর্তে 0 এবং (+) এর পরিবর্তে (.) বসিয়ে পাই

$0.0 = 0$ এটাও একটি বৈধ সমীকরণ।

আবার, $0.1 = 0$ সমীকরণে 0 এর পরিবর্তে 1 ও 1এর পরিবর্তে 0 এবং (.) এর পরিবর্তে (+) বসিয়ে পাই $1 + 0 =1$ এটাও একটি বৈধ সমীকরণ।

৩.৭.১ বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorems)

বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে যুক্তি রাশিমালার সরলীকরণ বা রাশিমালার গঠন পরিবর্তন সাধন করা যায়। বুলিয়ান চলকের মান '1' অথবা '0' দিয়ে এসব উপপাদ্যগুলো সহজেই প্রমাণ করা যায়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বুলিয়ান উপপাদ্য দেয়া হলো–

মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorems)

১. i) $A+1=1$ ii) $A.1=A$

২. i) $A+0=A$ ii) $A.0=0$

৩. i) $A+\overline{A}=1$ ii) $A.\overline{A}=0$

৪. i) $A+A=A$ ii) $A.A=A$

৫. সহায়ক উপপাদ্য (Auxiliary Theorems):

i) $A+\overline{A}B=A+B$

ii) $\overline{A}+AB=\overline{A}+B$

iii) $\overline{A}+A\overline{B}=\overline{A}+\overline{B}$

iv) $A+\overline{A}\overline{B}=A+\overline{B}$

৬. বিনিময় উপপাদ্য (Commulative Theorems)

i) $A+\overline{B}=\overline{B}+A$ ii) $A.\overline{B}=\overline{B}.A$

৭. অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorems)

i) $A+(B+C)=(A+B)+C$ ii) $A.(B.C)=(A.B).C$

৮. বিভাজন উপপাদ্য (Distributed Theorems)

i) $A(B+C)=AB+AC$ ii) $(A+B)(A+C)=A+BC$

৯. ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De-Morgan's Theorems)

i) $\overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}$ ii) $\overline{A.B}=\overline{A}+\overline{B}$

১০. সহায়ক উপপাদ্য (Secondary Theorems)

i) $A+AB=A$ ii) $A(A+B)=A$

১১. $\overline{\overline{A}}=A$

উপরিউক্ত উপপাদ্যসমূহকে চলকের মান 0 বা 1 ধরে যেকোনো উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়।

উদাহরণ-১: প্রমাণ কর, $A+1=1$

প্রমাণ: যদি $A=1$ হয় তবে

বামপক্ষ $= A+1$
$= 1+1$
$= 1$
= ডানপক্ষ

যদি $A=0$ হয় তবে

বামপক্ষ $= A+1$
$= 0+1$
$= 1$ = ডানপক্ষ

∴ বুলিয়ান চলক A এর যেকোনো মানের জন্য $A+1=1$ (প্রমাণিত)

উদাহরণ-২: প্রমাণ কর, $A+\overline{A}=1$

প্রমাণ: যদি $A=1$ হয় তবে $\overline{A}=0$

বামপক্ষ $= A+\overline{A}$
$= 1+0$
$= 1$
= ডানপক্ষ

যদি $A=0$ হয় তবে $\overline{A}=1$

বামপক্ষ $= A+\overline{A}$
$= 0+1$
$= 1$ = ডানপক্ষ

∴ বুলিয়ান চলক A এর যেকোনো মানের জন্য $A+\overline{A}=1$ (প্রমাণিত)

উদাহরণ-৩: প্রমাণ কর, $A.\overline{A}=0$

প্রমাণ: যদি $A=1$ হয় তবে $\overline{A}=0$

বামপক্ষ $= A.\overline{A}$

$= 1.0$

$= 0$

= ডানপক্ষ

যদি $A=0$ হয় তবে $\overline{A}=1$

বামপক্ষ $= A.\overline{A}$

$= 0.1$

$= 0$

= ডানপক্ষ

$\therefore$ বুলিয়ান চলক A এর যেকোনো মানের জন্য $A.\overline{A}=0$ (প্রমাণিত)

উদাহরণ-৪: প্রমাণ কর, A + BC = (A + B) (A + C)

ডানপক্ষ = (A + B) (A + C)

= A.A + A.C + A.B + BC

= A + AC + AB + BC [$\because$ A.A = A]

= A(1 + C) + AB + BC

= A.1 + AB + BC

= A + AB + BC [$\because$ 1 + A = A]

= A (1 + B) + BC

= A.1 + BC

= A + BC

= বামপক্ষ

$\therefore$ ডানপক্ষ = বামপক্ষ (প্রমাণিত)

৩.৭.২ ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De-Morgan's Theorems)

ডি-মরগ্যান ছিলেন একজন নামকরা ফরাসি গণিতবিদ। তিনি বুলিয়ান অ্যালজেবরার ক্ষেত্রে দুটি বিশেষ সূত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর নামানুসারে এ বিশেষ সূত্র দুটি ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য নামে পরিচিত।

চিত্র: ডি-মরগ্যান

A ও B দুটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি নিম্নরূপ–

প্রথম উপপাদ্য: $\overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}$

দ্বিতীয় উপপাদ্য: $\overline{A.B}=\overline{A}+\overline{B}$

প্রথম উপপাদ্য: $\overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}$

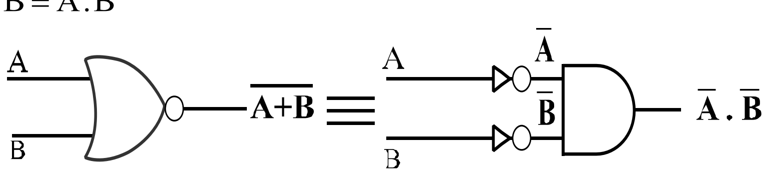

চিত্র: ডি-মরগ্যানের প্রথম উপপাদ্যের লজিক চিত্র।

প্রথম উপপাদ্য অনুসারে, A ও B গ্রহণ সংকেতের জন্য একটি নর গেইটের আউটপুট সংকেত যা হয়, তাহলো $\overline{A}$ ও $\overline{B}$ গ্রহণ সংকেতের জন্য একটি অ্যান্ড গেইটের আউটপুট সংকেতের সমান।

দ্বিতীয় উপপাদ্য: $\overline{A\,.\,B} = \overline{A} + \overline{B}$

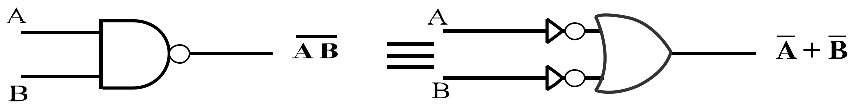

চিত্র: ডি-মরগ্যানের দ্বিতীয় উপপাদ্যের লজিক চিত্র।

দ্বিতীয় উপপাদ্য অনুসারে, A ও B গ্রহণ সংকেতের জন্য একটি ন্যান্ড গেইটের আউটপুট সংকেত যা হয় তাহলো $\overline{A}$ ও $\overline{B}$ গ্রহণ সংকেতের জন্য একটি অর গেইটের আউটপুট সংকেতের সমান।

ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ: সত্যক সারণির সহায়তায় অতি সহজে উপাপাদ্য দুটি প্রমাণ করা যায়। বড় বড় লজিক রাশিমালা সরলীকরণের জন্য উপপাদ্য দুটি বিশেষ সহায়ক। এ পদ্ধতিতে প্রমাণের জন্য সূত্রের বাম দিক ও ডান দিকের চলকসমূহের সম্ভাব্য মান সত্যক সারণিতে লেখা হয়। চলকসমূহের সকল মানের জন্য সূত্রের বাম দিক ও ডান দিকের মান একরূপ হলে সূত্রটি প্রমাণিত হয়। নিম্নে দুটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি প্রমাণ করা হলো।

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}.\overline{B}$	A.B	$\overline{A.B}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

টেবিল: দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের সত্যক সারণি

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, A ও B এর সকল মানের জন্য–

১ম উপপাদ্য: $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$

২য় উপপাদ্য: $\overline{AB} = \overline{A}+\overline{B}$

সুতরাং দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি প্রমাণিত হলো।

তিনটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য:

প্রথম উপপাদ্য: $\overline{A+B+C} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$

দ্বিতীয় উপপাদ্য: $\overline{A.B.C} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

(১) $\overline{A+B+C} = \overline{A}\,.\,\overline{B}.\,\overline{C}$

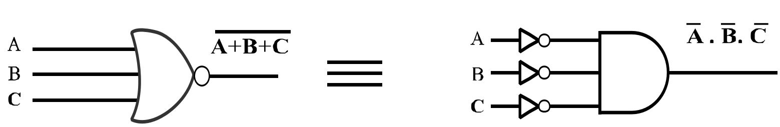

(২) $\overline{A.\,B.\,C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

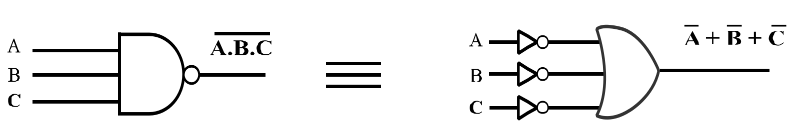

চিত্র: ডি-মরগ্যান উপপাদ্যের লজিক চিত্র।

সত্যক সারণির সহায়তায় অতি সহজে উপপাদ্য দুটি প্রমাণ করা সম্ভব। তিনটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য নিম্নে একটি সত্যক সারণি তৈরি করা হলো:

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	A+B+C	$\overline{A+B+C}$	$\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

টেবিল: তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের সত্যক সারণি।

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, A, B এবং C তিনটি চলকের যেকোনো মানের জন্য

১ম উপপাদ্য: $\overline{A+B+C} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$

২য় উপপাদ্য: $\overline{ABC} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

সুতরাং তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি প্রমাণিত হলো।

উপপাদ্য দুটি n সংখ্যক চলকের জন্যে প্রযোজ্য। n সংখ্যক চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি নিম্নরূপ:

$$\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + A_n} = \overline{A}_1 .\, \overline{A}_2 . \overline{A}_3 \ldots\ldots\ldots \overline{A}_n$$

$$\overline{A_1 .\, A_2 .\, A_3 .\ \ldots\ldots\ldots\ldots .\ A_n} = \overline{A}_1 + \overline{A}_2 + \overline{A}_3 \ldots\ldots\ldots + \overline{A}_n$$

৩.৭.৩ সত্যক সারণি (Truth Table)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় লজিক সার্কিটে এক বা একাধিক ইনপুট এবং আউটপুট থাকে। এই ইনপুটগুলোর উপর লজিক সার্কিটের আউটপুট নির্ভর করে। সুতরাং যে সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন ইনপুটের উপর ভিত্তি কোনো লজিক সার্কিটের আউটপুট প্রদর্শন করে তাকে সত্যক সারণি (Truth Table) বলে। প্রতিটি লজিক গেইটের সত্যক সারণি ভিন্ন।

যদি সত্যক সারণিতে n সংখ্যক চলক থাকে তবে ইনপুট এর অবস্থা হবে 2^n সংখ্যক। যেমন কোনো লজিক বর্তনীতে দুটি ইনপুট চলক A ও B হলে এর ইনপুটের অবস্থা হবে $2^2 = 4$টি। প্রতিটি ইনপুটের মান 0 বা 1 হতে পারে।

নিম্নে সারণিতে ইনপুট চলক A ও B এর সম্ভাব্য মান দেয়া হলো এবং আউটপুট Y এর মান ইনপুটের উপর নির্ভর করে।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

চিত্র: দুই ইনপুটের সত্যক সারণি

ইনপুট		আউটপুট
A	B	Y =A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র: দুই ইনপুটের অর গেইটের সত্যক সারণি

লজিক গেইট (Logic gate): বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মৌলিক কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য যে ইলেকট্রনিক বর্তনী ব্যবহার করা হয় তাই লজিক গেইট। অর্থাৎ লজিক গেইট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যা এক বা একাধিক ইনপুট গ্রহণ করে এবং শুধু একটি আউটপুট প্রদান করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যেসব ডিজিটাল সার্কিট যুক্তিমূলক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেসব সার্কিটকেই লজিক গেইট বলে।

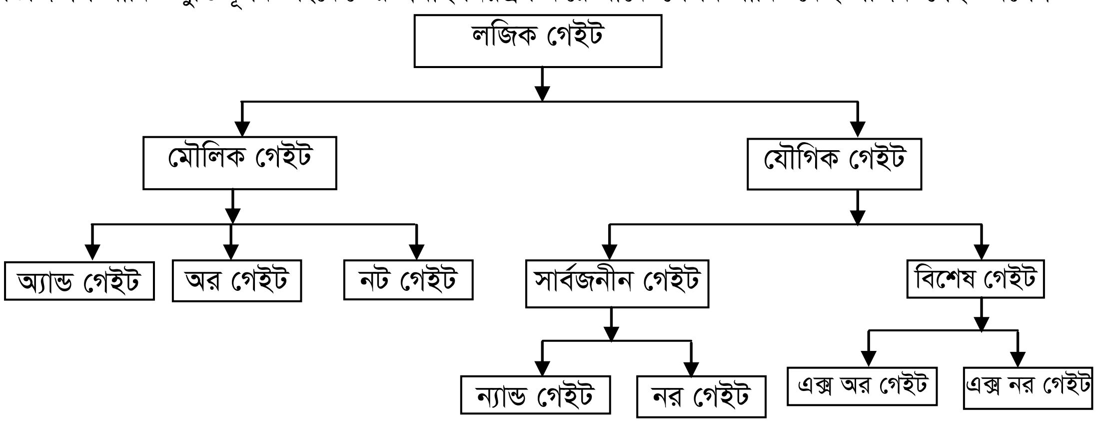

চিত্র: লজিক গেইটের শ্রেণিবিভাগ

মৌলিক লজিক গেইট: যেসব গেইট অন্য কোনো গেইটের সাহায্য ছাড়া তৈরি করা যায় তাদেরকে মৌলিক লজিক গেইট বলা হয়। মৌলিক লজিক গেইট তিনটি। যথা–

১. অর গেইট (OR gate)
২. অ্যান্ড গেইট (AND gate)
৩. নট গেইট (NOT gate)

যৌগিক গেইট: যেসব লজিক গেইট মৌলিক গেইটের সাহায্যে তৈরি করা হয় তাদেরকে যৌগিক লজিক গেইট বলা হয়। তিনটি মৌলিক গেইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যৌগিক গেইট তৈরি করা যায়। প্রধান চার ধরনের যৌগিক গেইট–

১. ন্যান্ড গেইট (NAND gate)
২. নর গেইট (NOR gate)
৩. এক্স-অর গেইট (X-OR gate)
৪. এক্স-নর গেইট (X-NOR gate)

৩.৭.৪ মৌলিক গেইট (Basic gate)

আগেই বলা হয়েছে, কম্পিউটারসহ যেকোনো ডিজিটাল সিস্টেমের মূলে রয়েছে তিন ধরনের মৌলিক গেইট। নিচে মৌলিক গেইটগুলোর কার্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো–

১. অর গেইট (OR gate):

অর গেইট হচ্ছে যৌক্তিক যোগের গেইট। অর গেইটের দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। আউটপুটটি ইনপুটগুলোর যৌক্তিক যোগফলের সমান। এ গেইটের ক্ষেত্রে যেকোনো একটি ইনপুটের মান 1 হলে আউটপুট 1 হবে। যখন সবগুলো ইনপুটের মান 0 হবে তখন আউটপুট 0 হবে। মনে করি, একটি অর গেইটের জন্য দুটি ইনপুট সংকেত A ও B এবং তাদের আউটপুট সংকেত Y। A ও B এর বুলিয়ান চলকের মানের জন্য পৃথক চারটি ($২^২$ = ৪) অবস্থান হতে পারে।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	Y= A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র: দুই ইনপুটের অর গেইটের সত্যক সারণি

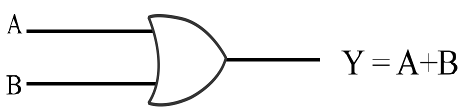

চিত্র: দুই ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইটের প্রতীক

A ও B এর বুলিয়ান চলকের বিভিন্ন মানের জন্য আউটপুট সংকেত Y হবে, A ও B এর যৌক্তিক যোগের সমান। এক্ষেত্রে বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression) হবে–

$$Y = A \text{ OR } B$$
$$= A + B$$

এখানে '+' চিহ্নটি সাধারণ দশমিক অ্যালজেবরার যোগ চিহ্ন নয়। '+' চিহ্নটি দ্বারা লজিক যোগকে বুঝানো হয়েছে।

সুইচ বর্তনী (Switch Circuit)

অর গেইটকে একটি সমান্তরাল সুইচ (Parallel switch) বর্তনীর মাধ্যমে দেখানো যায়, যা অর গেইটের সত্যক সারণির সত্যতা প্রমাণ করে। চিত্রে বর্তনীটির A ও B সুইচ দুটির যেকোনো একটি বন্ধ থাকলে বাতিটি জ্বলে উঠবে। বর্তনী তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো ইনপুট বিশিষ্ট অর গেইট তৈরি করা যায়।

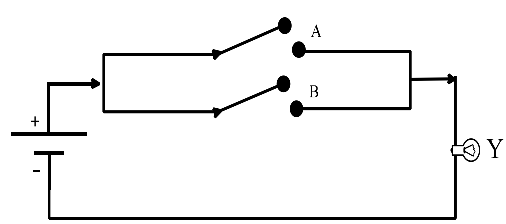

চিত্র: সামন্ড্রাল সুইচ বর্তনী

নিম্নের তিনটি ইনপুট বিশিষ্ট অর গেইটের প্রতীক ও বুলিয়ান সমীকরণ দেয়া হলো–

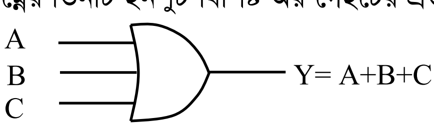

প্রতীক (Symbol)

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): Y = A+B+C

২. অ্যান্ড গেইট (AND Gate)

অ্যান্ড গেইট হচ্ছে যৌক্তিক গুণের গেইট। অ্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। আউটপুটটি ইনপুটগুলোর যৌক্তিক গুণফলের সমান। এ গেইটের ক্ষেত্রে যেকোনো একটি ইনপুটের মান 0 হলে আউটপুট 0 হবে। যখন সবগুলো ইনপুটের মান 1 তখন আউটপুট 1 হবে। মনে করি, একটি অ্যান্ড গেইটের জন্য দুটি ইনপুট সংকেত A ও B এবং তাদের আউটপুট সংকেত Y। A ও B এর বুলিয়ান চলকের মানের জন্য পৃথক পৃথক চারটি ($2^2=4$) অবস্থান হতে পারে।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	Y= A .B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র: দুই ইনপুটের AND Gate এর সত্যক সারণি।

এধরনের লজিক গুণকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় যাকে বলা হয় অ্যান্ড এর বুলিয়ান সমীকরণ।

এক্ষেত্রে সমীরকণটি হবে–

$$Y = A \text{ AND } B$$
$$= A . B$$
$$= A B$$

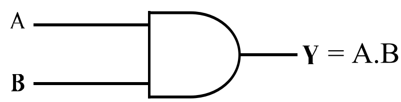

চিত্র: দুই ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর প্রতীক

এখানে ' . ' চিহ্নটি সাধারণ দশমিক অ্যালজেবরার গুণ চিহ্ন নয়। ' . ' চিহ্নটি দ্বারা লজিক গুণ বুঝানো হয়েছে।

সুইচ বর্তনী (Switch Circuit)

অ্যান্ড গেইটকে একটি ক্রমিক সুইচ (Serial switch) বর্তনীর মাধ্যমে দেখানো যায়, যা অ্যান্ড গেইটের সত্যক সারণির সত্যতা প্রমাণ করে। চিত্রে বর্তনীটির A ও B সুইচ দুটির যেকোনো একটি খোলা থাকলে বাতিটি বন্ধ থাকবে। তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইট তৈরি করা যায়। নিম্নে তিন ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইটের প্রতীক, বুলিয়ান সমীকরণ দেয়া হলো:

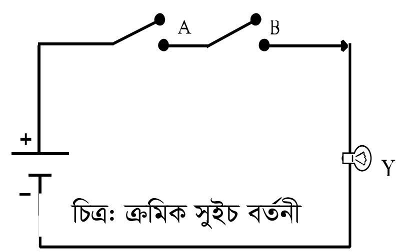

চিত্র: ক্রমিক সুইচ বর্তনী

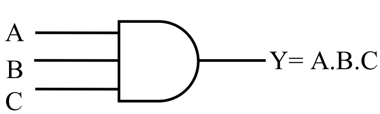

চিত্র: তিন ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইটের প্রতীক

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y = A .B .C$

৩. নট গেইট (NOT Gate)

বুলিয়ান বীজগণিতের নট অপারেশন বাস্তবায়নের জন্য নট গেইট ব্যবহৃত হয়। এ গেইটে একটি মাত্র ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। আউটপুট হবে ইনপুটের বিপরীত। অর্থাৎ ইনপুট সংকেত '1' হলে আউটপুট সংকেত '0' হবে অথবা ইনপুট সংকেত '0' হলে আউটপুট সংকেত '1'।

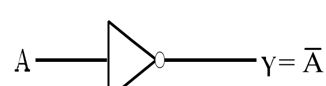

চিত্র: নট গেইটের প্রতীক

এজন্য এ গেইটকে ইনভার্টার (Inverter) বলা হয়। মনে করি, একটি নট গেইটের ইনপুট সংকেত A এবং আউটপুট সংকেত Y। বুলিয়ান চলক A এর মানের জন্য পৃথক পৃথক দুটি ($2^1 = 2$) অবস্থান হতে পারে। এক্ষেত্রে বুলিয়ান সমীকরণ হবে:

$$Y = NOT\,(A)$$
$$= \overline{A}$$ (অর্থাৎ $\overline{A}$ এর মান A এর উল্টো)

ইনপুট	আউটপুট
A	$Y = \overline{A}$
0	1
1	0

সত্যক সারণী (Truth table)

কাজ: ৩ ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইট, অর গেইট ও নট গেইটের সত্যক সারণি লেখ।

যৌগিক গেইট: দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সাহায্যে যে গেইট তৈরি করা হয় তাকে যৌগিক গেইট বলে। যেমন-AND ও NOT গেইটের সাহায্যে NAND গেইট, OR ও NOT গেইটের সাহায্যে NOR গেইট তৈরি করা যায়। NAND ও NOR গেইটকে যৌগিক গেইট বলা হয়।

নর গেইট (NOR Gate): NOR গেইট হলো OR গেইট ও NOT গেইটের সমন্বয়ে গঠিত। OR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইট দিয়ে প্রবাহিত করলে NOR গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ OR Gate + NOT Gate = NOR Gate. যদি A ও B ইনপুট হয় তবে আউটপুট $Y = \overline{A + B}$। NOR গেইটের ক্ষেত্রে যেকোনো একটি ইনপুটের মান 1 হলে আউটপুট 0 হবে।

অর্থাৎ নর গেইটের আউটপুট সংকেত অর গেইটের আউটপুট সংকেতের বিপরীত হয়। নর গেইটের মাধ্যমে লজিক বর্তনী তৈরির জন্য এই গেইটটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে দুটি ইনপুট বিশিষ্ট নর গেইটের প্রতীক, সমকক্ষ বর্তনী, বুলিয়ান সমীকরণ এবং সত্যক সারণি দেখানো হলো–

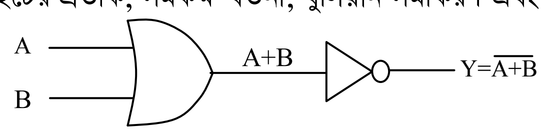

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইট এর প্রতীক

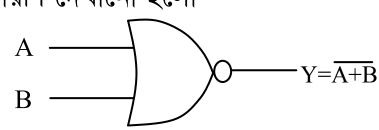

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইট এর সমকক্ষ বর্তনী

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y=\overline{A + B}$

ইনপুট			আউটপুট
A	B	A + B	$Y=\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র: সত্যক সারণি

তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো ইনপুট বিশিষ্ট নর গেইট তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে তিনটি ইনপুট বিশিষ্ট নর গেইটের প্রতীক, সমকক্ষ বর্তনী, বুলিয়ান সমীকরণ দেয়া হলো:

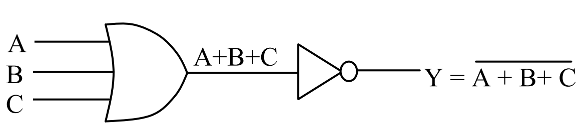

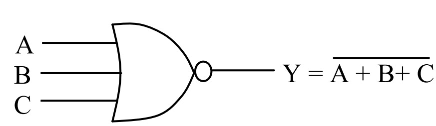

চিত্র: ৩ ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইট এর প্রতীক

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y = \overline{A+B+C}$

ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)

NAND Gate হলো AND গেইট ও NOT গেইটের সমন্বয়ে গঠিত। AND গেইটের আউটপুটকে NOT গেইট দিয়ে প্রবাহিত করলে NAND গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ AND Gate +NOT Gate = NAND Gate। যদি A এবং B দুটি ইনপুট হয় তাহলে ন্যান্ড গেইটের আউটপুট $Y = \overline{AB}$। ন্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে যেকোনো একটি ইনপুটের মান 0 হলে আউটপুট 1 হবে। ন্যান্ড গেইটের আউটপুট সংকেত অ্যান্ড গেইটের আউটপুট সংকেতের বিপরীত।

অ্যান্ড গেইটের আউটপুট ⇓ ন্যান্ড গেইটের আউটপুট ⇓

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	$Y = \overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইট এর সত্যক সারণি

এক্ষেত্রে দুটি ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড গেইটের প্রতীক, সমকক্ষ বর্তনী, বুলিয়ান সমীকরণ এবং সত্যক সারণি দেখানো হলো–

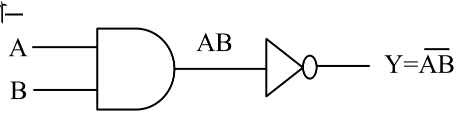

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইট এর প্রতীক

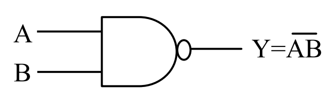

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y = \overline{A.B}$

তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড গেইট তৈরি করা যায়। নিচে তিনটি ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড গেইটের প্রতীক এবং বুলিয়ান সমীকরণ দেখানো হলো–

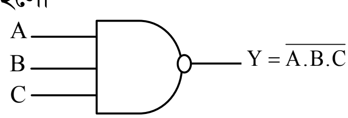

চিত্র: ৩ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইট এর প্রতীক

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y = \overline{A.B.C}$

৩.৭.৫ ন্যান্ড ও নর গেইটের সার্বজনীনতা (Universality of NAND & NOR gate)

যে গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসহ (AND gate, OR gate ও NOT gate) অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট বলে। NAND gate ও NOR gate কে সার্বজনীন গেইট বলা হয়। কারণ ন্যান্ড গেইট ও নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসহ যেকোনো লজিক গেইট বাস্তবায়ন করা যায়।

অর, অ্যান্ড এবং নট এ তিনটি মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে যেকোনো লজিক সার্কিট তৈরি করা সম্ভব। তবে শুধু ন্যান্ড গেইট দিয়েও যেকোনো লজিক সার্কিট তৈরি সম্ভব। এর কারণ ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর, অ্যান্ড এবং নট গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব। তেমনটি শুধু নর গেইট দিয়েও যেকোনো লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন সম্ভব। এটি ন্যান্ড ও নর গেইটের সার্বজনীনতা নামে পরিচিত।

ন্যান্ড গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন:

চিত্রের দুটি ইনপুট (A) সমান। সুতরাং,

$$Y = \overline{A.A}$$
$$= A$$

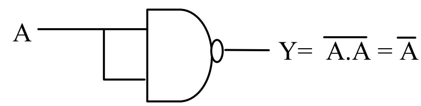

চিত্রঃ NAND gate দিয়ে NOT gate বাস্ড়বায়ন

ফলে ন্যান্ড গেইটটি একটি নট গেইট হিসেবে কাজ করে।

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

চিত্রে দুটি ন্যান্ড গেইটের সংযোগে একটি অ্যান্ড গেইট তৈরি করা হয়েছে। অ্যান্ড গেইটের আউটপুট সংকেত Y হলে-

$$Y = \overline{\overline{AB}.\overline{AB}}$$
$$= \overline{\overline{A.B}}$$
$$= AB$$

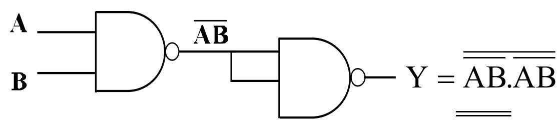

চিত্রঃ NAND gate দিয়ে AND gate বাস্ড়বায়ন।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ধাপের গেইটটি একটি নট গেইট হিসেবে কাজ করে।

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

চিত্রে ন্যান্ড দিয়ে অর গেইটের বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বামের ন্যান্ড গেইট দুটি নট গেইট হিসেবে কাজ করে। এখানে,

$$Y = \overline{\overline{A}.\overline{B}}$$
$$= \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} \quad \text{[ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুযায়ী]}$$
$$= A + B$$

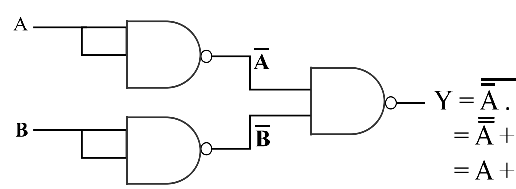

চিত্রঃ NAND gate দিয়ে OR gate বাস্তবায়ন

সুতরাং চিত্রের সার্কিটটি একটি অর গেইট হিসেবে কাজ করে।

ন্যান্ড গেইট দিয়ে ৩টি মৌলিক গেইট (অ্যান্ড গেইট, অর গেইট এবং নট গেইট) বাস্তবায়ন করা হলো। অতএব ন্যান্ড গেইটের সার্বজনীনতা প্রমাণিত হলো।

নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন–

চিত্রে নর গেইটের দুটি ইনপুট (A) সমান। সুতরাং,

$$Y = \overline{A + A}$$
$$= \overline{A}$$

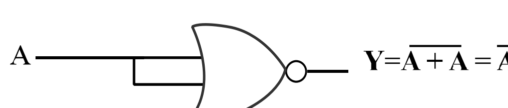

চিত্রঃ NOR gate দিয়ে NOT gate বাস্ড়বায়ন

ফলে নর গেইটটি একটি নট গেইট হিসেবে কাজ করে।

নর গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

চিত্রে দুটি নর গেইটের সংযোগে একটি অর গেইট তৈরি করা হয়েছে।

এখানে আউটপুট,

$$Y = \overline{\overline{A+B}+\overline{A+B}}$$

$$= \overline{\overline{A+B}}$$

$$= A+B$$

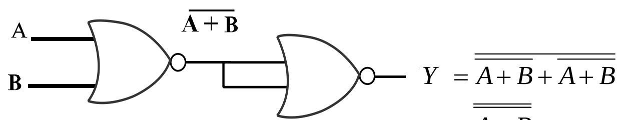

চিত্রঃ NOR gate দিয়ে OR gate বাস্তবায়ন

উল্লেখ্য যে, পরের নর গেইটটি একটি নট গেইট হিসেবে কাজ করে।

নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

চিত্রে নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইটের বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম স্তরের নর গেইট দুটি নট গেইট হিসেবে কাজ করে। এখানে,

$$Y = \overline{\overline{A}+\overline{B}}$$

$$= \overline{\overline{A}}.\overline{\overline{B}}$$ [ডি মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]

$$= A.B$$

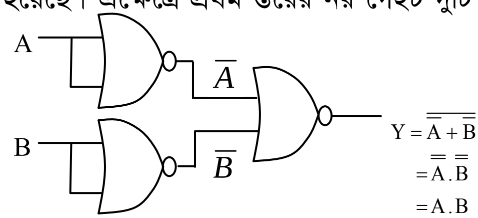

চিত্রঃ NOR gate দিয়ে AND gate বাস্ড়বায়ন

নর গেইট দিয়ে ৩টি মৌলিক গেইট (অ্যান্ড গেইট, অর গেইট এবং নট গেইট) বাস্তবায়ন করা হলো। অতএব নর গেইটের সার্বজনীনতা প্রমাণিত হলো।

৩.৭.৬ বিশেষ গেইট

এক্স-অর গেইট (X-OR gate) –

Exclusive OR গেইটকে সংক্ষেপে X-OR গেইট বলা হয়। এ গেইট কোনো বেসিক গেইট নয় কারণ এটি অ্যান্ড, অর ও নট ইত্যাদি গেইটের সাহায্যে তৈরি করা হয়। আবার এটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) বা একীভূত সার্কিট আকারেও পাওয়া যায়। এ গেইটের ইনপুটগুলো অসমান হলে আউটপুট 1 হয়। অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। X-OR গেইটের দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্রঃ X–OR gate এর সত্যক সারণী

এ গেইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনপুট বিট তুলনা করে আউটপুট সংকেত পাওয়া যায়। একটি এক্স অর গেইটের ইনপুট সংকেত A ও B এবং আউটপুট সংকেত Y হলে বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression) হবে–

$$Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

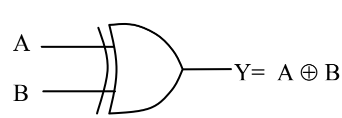

চিত্রঃ X–OR gate এর প্রতীক

এখানে “ $\oplus$ ” দ্বারা এক্স OR এর কাজকে বুঝানো হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো ইনপুট বিশিষ্ট এক্স-অর তৈরি করা যায়। নিচে তিন ইনপুট বিশিষ্ট এক্স-অর গেইটের প্রতীক ও বুলিয়ান সমীকরণ দেখানো হলো–

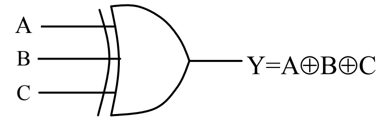

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y=A\oplus B\oplus C$

শুধু মৌলিক গেইট দিয়ে X-OR গেইট এর লজিক চিত্র বাস্তবায়ন:

দুটি ইনপুট A ও B এর ক্ষেত্রে X-OR গেইটের আউটপুট সমীকরণ–

$$Y = A \oplus B$$
$$= \bar{A}B + A\bar{B}$$

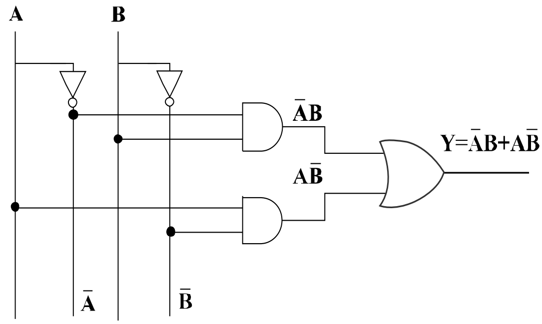

চিত্র: মৌলিক গেইট দিয়ে **X-OR** গেইট বাস্ড়বায়ন।

শুধু ন্যান্ড গেইট দ্বারা X-OR গেইটের বাস্তবায়ন

এক্স-অর গেইটের ক্ষেত্রে আমরা জানি,

$$Y = A \oplus B$$
$$= \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$= \overline{\overline{\bar{A}B + A\bar{B}}}$$
$$= \overline{(\overline{\bar{A}B}).(\overline{A\bar{B}})}$$

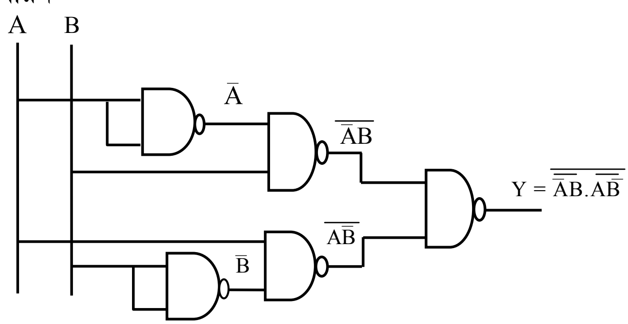

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে X-OR গেইট বাস্ড়বায়ন।

এক্স-অর ফাংশনটি পর্যবেক্ষণ করে শুধু ন্যান্ড গেইট দ্বারা উপরের এক্স-অর গেইটের লজিক সার্কিট তৈরি করা হলো।

শুধু NOR গেইট দিয়ে X-OR গেইট এর লজিক চিত্র বাস্তবায়ন:

দুটি ইনপুট A ও B এর ক্ষেত্রে X-OR গেইটের আউটপুট

$$Y = \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$= \overline{\overline{\bar{A}B + A\bar{B}}}$$
$$= \overline{(\overline{\bar{A}B})\ (\overline{A\bar{B}})}$$
$$= \overline{(\bar{\bar{A}} + \bar{B}) . (\bar{A} + \bar{\bar{B}})}$$
$$= \overline{(A + \bar{B}).(\bar{A} + B)}$$
$$= \overline{(A + \bar{B})} + \overline{(\bar{A} + B)}$$

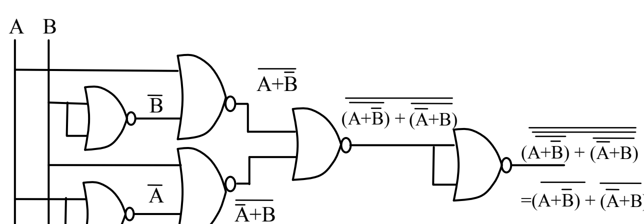

চিত্র : NOR গেইট দিয়ে X-OR গেইট বাস্ড়বায়ন

এক্স-নর গেইট (X-NOR gate)

Exclusive NOR গেইটকে সংক্ষেপে X-NOR গেইট বলা হয়। X-OR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইট দিয়ে প্রবাহিত করলে X-NOR গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ X-OR Gate + NOT Gate = X-NOR Gate। X-NOR গেইটের দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। ইনপুট দুটি সমান হলে আউটপুট 1 হবে। আবার বিভিন্ন বিট তুলনা করে আউটপুট সংকেত পাওয়া যায় অর্থাৎ এ গেইটের ইনপুট সংকেতের মান বিজোড় সংখ্যক '1' হলে আউটপুট সংকেত '0' হয়। অন্যথায় আউটপুট সংকেত '1' হবে। অর্থাৎ এক্স অর গেইটের আউটপুট সংকেত একটি নট গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে এক্স নর গেইটের আউটপুট সংকেত পাওয়া যায়।

X-OR গেইটের আউটপুট → $A \oplus B$; X-NOR গেইটের আউটপুট → $Y = \overline{A \oplus B}$

ইনপুট			আউটপুট
A	B	$A \oplus B$	$Y = \overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট X-NORএর সত্যক সারণি

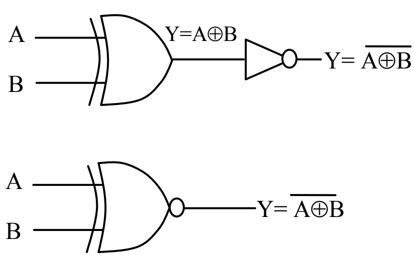

চিত্র: ২ ইনপুট বিশিষ্ট X-NORএর প্রতীক

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression):

একটি এক্স নর গেইটের ইনপুট সংকেত A ও B এবং আউটপুট সংকেত Y হলে বুলিয়ান সমীকরণ হবে–

$$Y = \overline{A \oplus B}$$
$$= AB + \overline{A}\ \overline{B}$$

তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো ইনপুট বিশিষ্ট এক্স-নর গেইট তৈরি করা যায়। নিচে তিন ইনপুট বিশিষ্ট এক্স-নর গেইটের প্রতীক ও বুলিয়ান সমীকরণ দেখানো হলো–

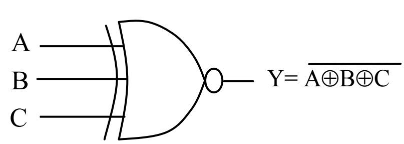

চিত্র: তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-NOR গেইটের প্রতীক

বুলিয়ান সমীকরণ (Boolean expression): $Y = \overline{A \oplus B \oplus C}$

শুধু মৌলিক গেইট দিয়ে X-NOR গেইট এর লজিক চিত্র বাস্তবায়ন–

দুটি ইনপুট A ও B এর ক্ষেত্রে X-NOR গেইটের আউটপুট সমীকরণ

$$Y = \overline{A \oplus B}$$
$$= AB + \bar{A}\bar{B}$$

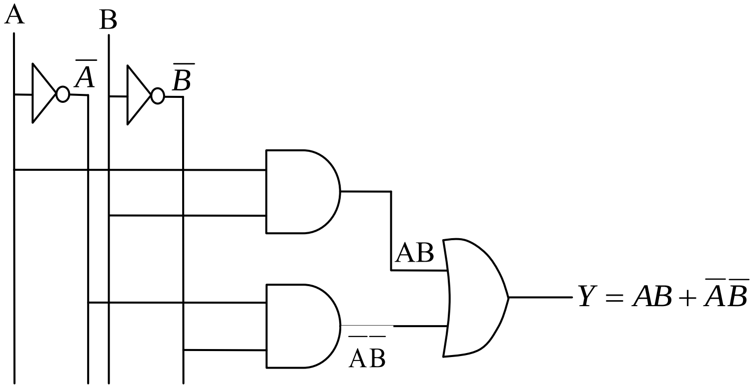

চিত্র: মৌলিক গেইট দিয়ে X-NOR গেইট বাস্ড়বায়ন

শুধু ন্যান্ড গেইট দ্বারা X-NOR গেইটের বাস্তবায়ন–

এক্স-নর গেইটের ক্ষেত্রে আমরা জানি,

$$Y = \overline{A \oplus B}$$
$$= AB + \bar{A}\bar{B}$$
$$= \overline{\overline{AB + \bar{A}\bar{B}}}$$
$$= \overline{(\overline{AB}).(\overline{\bar{A}\bar{B}})}$$

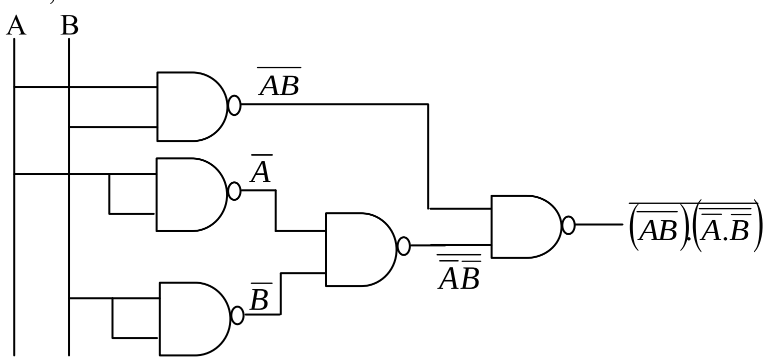

চিত্র: শুধু ন্যান্ড গেইট দ্বারা X-NOR গেইট বাস্ড়বায়ন

উপরের এক্স-নর ফাংশনটি পর্যবেক্ষণ করে শুধু ন্যান্ড গেইট দ্বারা এক্স-নর গেইটের লজিক সার্কিট তৈরি করা হলো।

শুধু NOR গেইট দিয়ে X-NOR গেইট এর লজিক চিত্র বাস্তবায়ন:

দুটি ইনপুট A ও B এর ক্ষেত্রে X-NOR গেইটের আউটপুট সমীকরণ–

$$Y = \overline{A \oplus B}$$
$$Y = AB + \bar{A}\bar{B}$$
$$= \overline{\overline{AB + \bar{A}\bar{B}}}$$
$$= \overline{(\overline{AB}) \,.\, (\overline{\bar{A}\bar{B}})}$$
$$= \overline{(\bar{A} + \bar{B}) \,.\, (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}})}$$
$$= \overline{(\bar{A} + \bar{B}) \,.\, (A + B)}$$
$$= \overline{(\bar{A} + \bar{B})} + \overline{(A + B)}$$

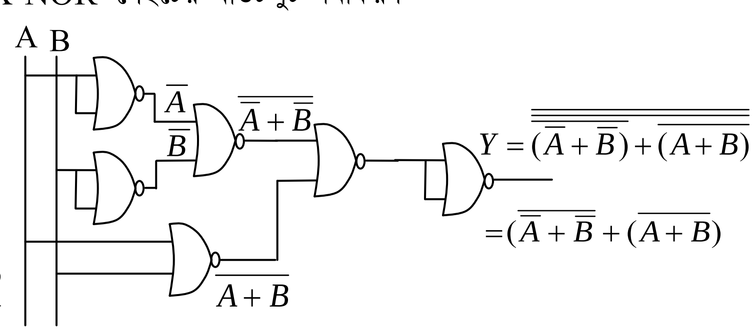

চিত্র: NOR গেইট দিয়ে X-NOR গেইট বাস্ড়বায়ন

৩.৭.৭ এনকোডার (Encoder)

এনকোডার এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী যার কাজ হলো ব্যবহারকারীর ব্যবহৃত ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করা। এ বর্তনীর সর্বাধিক 2^n টি ইনপুট থেকে n-টি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। যেকোনো মুহূর্তে একটি মাত্র ইনপুট ১ এবং বাকি সব ইনপুট ০ থাকে। অর্থাৎ $2^3 = 8$টি ইনপুট লাইন থেকে তিনটি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। কম্পিউটারে যে ভাষায় ইনপুট প্রদান করা হয় সে ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। তাই এনকোডার ব্যবহারকারীর দেয়া আলফানিউমেরিক ও নিউমেরিক বর্ণকে BCD, ASCII এবং EBCDIC কোডে রূপান্তরিত করে থাকে। এনকোডার সাধারণত ইনপুট ডিভাইস অর্থাৎ কী-বোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে।

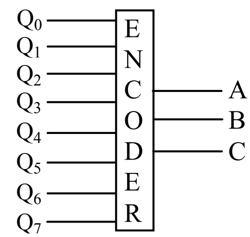

চিত্র: 8 to 3 লাইন এনকোডারের ব- কচিত্র

নিম্নে ৮টি ইনপুট লাইন থেকে ৩টি আউটপুট লাইন এনকোডারের ব্লকচিত্র বা সত্যক সারণি দেয়া হলো:

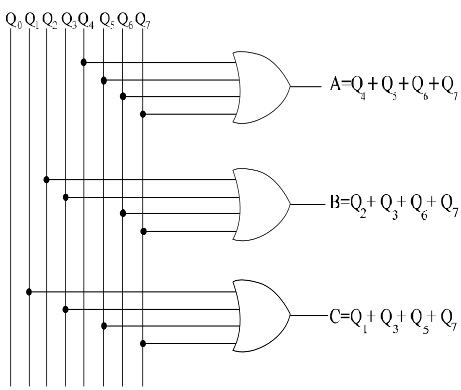

চিত্র: 8 to 3 line এনকোডারের লজিক সার্কিট

Input								Output		
Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	A	B	C
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

চিত্র: 8 to 3 line এনকোডারের সত্যক সারণি

এনকোডারের ব্যবহার:

i. এনকোডার আলফানিউমেরিক কোডকে ASCII ও EBCDIC কোডে রূপান্তর করে।
ii. দশমিক সংখ্যাকে বিভিন্ন কোডে রূপান্তর করে।
iii. এনকোডারের সাহায্যে দশমিক সংখ্যাকে সমতুল্য বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করে।

৩.৭.৮ ডিকোডার (Decoder)

ডিকোড শব্দের অর্থ হলো কোডমুক্ত করা। ডিকোডার হলো এমন একটি সমবায় সার্কিট যার সাহায্যে nটি ইনপুট থেকে 2^n টি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। তিনটি ইনপুট লাইন থেকে সর্বাধিক ৮টি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। যে কোনো একটি আউটপুট লাইনের মান 1 হলে বাকি সবকটি আউটপুট লাইনের মান 0 হবে। কখন কোনো আউটপুট লাইনের মান 1 হবে তা নির্ভর করে ইনপুটগুলোর মানের উপর।

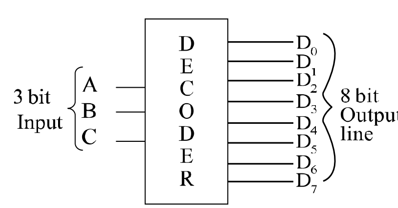

চিত্র: 3 to 8 লাইন ডিকোডারের বণ্ঢক

ডিকোডারের সাহায্যে কোড ভাষায় (যেমন- BCD) লেখা সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করা, জটিল কোডকে সহজ কোডে পরিণত করা বা কোড ভাষায় লেখা বর্ণকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা (যেমন-অ্যাস্কি কোডের 100000 কে A তে রূপান্তরিত করা) যায়।

কম্পিউটারের আউটপুট ইউনিটে কোড ভাষায় লেখা তথ্যকে সাধারণ আকারে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হয় ডিকোডারের। ডিকোডারের কাজ হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা।

Input			Output							
A	B	C	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

চিত্র: 3 to 8 লাইন ডিকোডারের সত্যক সারণি

মেশিন ভাষা → ডিকোডার → মানুষের বোধগম্য ভাষা

ডিকোডারে logic সার্কিট বাস্তবায়িত করতে আমাদের আটটি AND gate (3-input) এবং ৩টি নট গেইট লাগবে।

ডিকোডারের ব্যবহার:

i. কম্পিউটারে ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে।
ii. জটিল কোডকে সহজ কোডে রূপান্তর করে।
iii. ASCII ও EBCDIC কোডকে আলফানিউমেরিক কোডে রূপান্তর করে।
iv. ডিকোডার ব্যবহৃত হয় ডিসপ্লে ইউনিটে।
v. ডিকোডারের সাহায্যে বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করে।

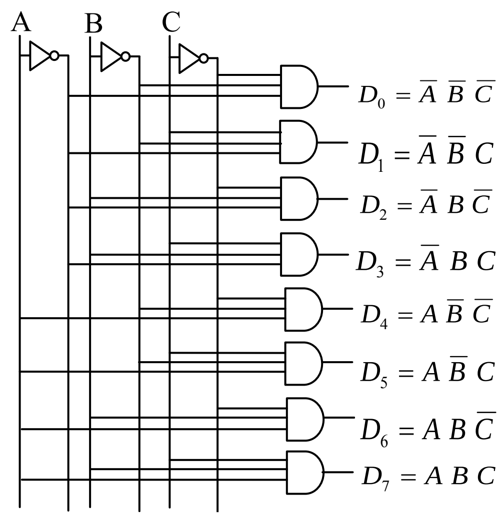

চিত্র: 3 to 8 line ডিকোডারের লজিক সার্কিট

৩.৭.৯ অ্যাডার (Adder) বা যোগের বর্তনী

অ্যাডার (Adder) শব্দের অর্থ যোগ করা। কম্পিউটারের সকল গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। একারণেই কম্পিউটার বিজ্ঞানে বাইনারি যোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। অ্যাডার হলো লজিক গেইট দ্বারা তৈরি এমন একটি ডিজিটাল কম্বিনেশনাল (Combinational) ইলেকট্রনিক সার্কিট যার মাধ্যমে যোগের কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা যায়। গুণ হলো বার বার যোগ করা এবং ভাগ হলো বার বার বিয়োগ করা। আবার পূরক পদ্ধতিতে বাইনারি যোগের মাধ্যমেই বিয়োগ করা যায়। কাজেই যোগ করতে পারার মানেই হলো গুণ, বিয়োগ এবং ভাগ করতে পারা।

যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগ করা যায় তাকে বলে অ্যাডার। ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে দুধরনের অ্যাডার আছে। যথা:

১. হাফ-অ্যাডার (Half Adder) বা অর্ধযোগের বর্তনী
২. ফুল-অ্যাডার (Full Adder) বা পূর্ণ যোগের বর্তনী

হাফ-অ্যাডার (Half Adder) বা অর্ধ যোগের বর্তনী

দুটি বাইনারি বিট যোগ করার জন্য ব্যবহৃত বর্তনীকে অর্ধ-যোগের বর্তনী বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে অ্যাডার দুটো বিট যোগ করে যোগফল (Sum) ও হাতে থাকে সংখ্যা বা ক্যারি (Carry) বের করতে পারে তাকে হাফ অ্যাডার বলে। অর্ধযোগ বা হাফ অ্যাডার দিয়ে দুটি সংখ্যা যোগ করার সময় চারটি ভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষিত হয়। নিম্নে চারটি ভিন্ন অবস্থা দেখানো হলো:

০	০	১	১
০	১	০	১
০	১	১	১০

ক্যারি

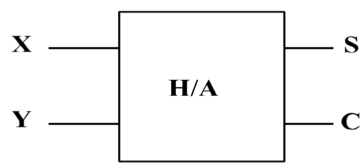

হাফ অ্যাডারের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট		আউটপুট	
X	Y	S	C
০	০	০	০
০	১	১	০
১	০	১	০
১	১	০	১

চিত্র: হাফ অ্যাডারের সত্যক সারণি।

উল্লেখ্য, বুলীয় যোগ ও সাধারণ যোগ এক নয়। বুলীয় যোগে 1+1=1। সুতরাং অর গেট দ্বারা বুলীয় যোগ করা গেলেও সাধারণ যোগ করা যায় না। অজেন্ড X, অ্যাডেন্ড Y, যোগফল S ও ক্যারি C হলে হাফ-অ্যাডারের সত র ১ X ঃ Y াওয়া যায়।

$$S = \overline{X}Y + X\overline{Y}$$
$$= X \oplus Y$$
$$C = XY$$

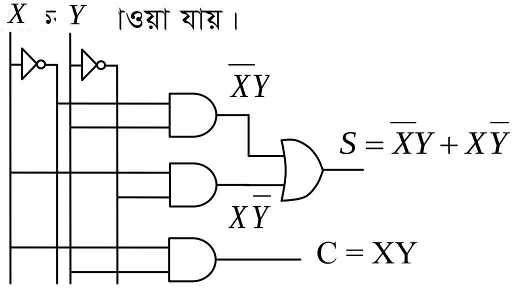

চিত্র: শুধু মৌলিক গেইট দিয়ে H/A বাস্ড়

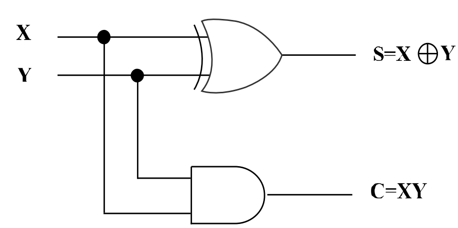

চিত্র: হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট

ফুল-অ্যাডার (Full Adder) বা পূর্ণ যোগের বর্তনী

ফুল অ্যাডার হলো এমন এক ধরনের লজিক্যাল সার্কিট যা তিনটি বাইনারি বিট যোগ করতে পারে। যে বর্তনীর মাধ্যমে তিনটি বাইনারি বিট (দুটি ইনপুট বিট ও একটি পূর্বের ক্যারি বিট) যোগ করে একটি যোগফল এবং বর্তমান ক্যারিবিট পাওয়া যায় তাকে ফুল অ্যাডার (Full Adder) বা পূর্ণ যোগের বর্তনী বলে। ক্যারিসহ অপর দুটি বিট যোগ করার জন্য ফুল-অ্যাডার ব্যবহার হয়। দুটো হাফ-অ্যাডার দ্বারা একটি ফুল-অ্যাডারের কাজ করা যায়। ফুল অ্যাডারের ইনপুট X, Y এবং আগের (Carry In) ক্যারি C_i যোগফল S ও বর্তমান (Carry Out) ক্যারি C_0 হলে ফুল অ্যাডারের সত্যক সারণি থেকে দেখা যায়–

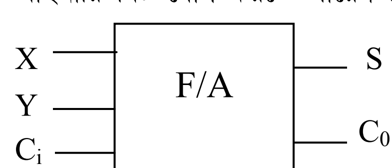

চিত্র: ফুল অ্যাডারের সাংকেতিক চিহ্ন।

আউটপুট সমীকরণ:

$$S = \overline{X}\,\overline{Y}C_i + \overline{X}Y\overline{C}_i + X\overline{Y}\,\overline{C}_i + XYC_i$$

$$C_0 = \overline{X}YC_i + X\overline{Y}C_i + XY\overline{C}_i + XYC_i$$

ইনপুট			আউটপুট	
X	Y	C_i	S	C_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

চিত্র: ফুল অ্যাডারের সত্যক সারণি।

ফুল অ্যাডারের যোগফলকে (S) নিম্নলিখিতভাবে সরলীকরণ করা যায়।

$$S = \overline{X}\,\overline{Y}C_i + \overline{X}Y\overline{C}_i + X\overline{Y}\,\overline{C}_i + XYC_i$$

$$= \overline{X}(\overline{Y}C_i + Y\overline{C}_i) + X(\overline{Y}\,\overline{C}_i + YC_i)$$

$$= \overline{X}(Y \oplus C_i) + X(\overline{Y \oplus C_i})$$

$= \overline{X}P \oplus X\overline{P}$ ধরি, $P = Y \oplus C_i$

$= X \oplus P$ [P এর মান বসিয়ে]

$= X \oplus Y \oplus C_i$

ফুল অ্যাডারের আউটপুট ক্যারি (C_0) নিম্নলিখিতভাবে সরলীকরণ করা যায়–

$$C_0 = \overline{X}YC_i + X\overline{Y}C_i + XY\overline{C}_i + XYC_i$$

$$= \overline{X}YC_i + XYC_i + X\overline{Y}C_i + XYC_i + XY\overline{C}_i + XYC_i$$

$$= YC_i(\overline{X} + X) + XC_i(\overline{Y} + Y) + XY(\overline{C}_i + C_i) \quad [\because A + \overline{A} = 1]$$

$$= YC_i.1 + XC_i.1 + XY.1 = YC_i + XC_i + XY$$

ফুল অ্যাডারের যোগফল S এবং আউটপুট ক্যারি C_0 কে সরলীকরণ করা হলে নিম্নলিখিত সমীকরণ পাওয়া যায়।

$$S = X \oplus Y \oplus C_i$$

$$C_o = XY + YC_i + XC_i$$

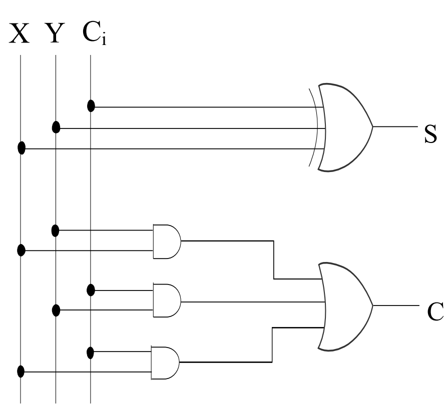

চিত্র: ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট

ফুল অ্যাডারের যোগফল

$$S = \overline{X}\,\overline{Y}C_i + \overline{X}Y\overline{C}_i + X\overline{Y}\,\overline{C}_i + XYC_i$$

এবং আউটপুট ক্যারি $C_o = XY + YC_i + XC_i$ দিয়ে ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট তৈরি করা হল।

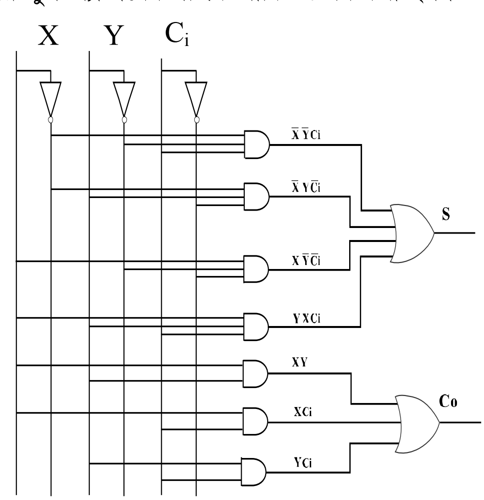

চিত্র: শুধু মৌলিক গেইট দিয়ে ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট

হাফ-অ্যাডারের সাহায্যে ফুল-অ্যাডারে বাস্তবায়ন

হাফ-অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল-অ্যাডার তৈরির জন্য দুটি হাফ-অ্যাডার ও একটি অর গেইট লাগে। প্রথম হাফ-অ্যাডারের ইনপুট X ও Y থেকে যোগফল S_1 ও ক্যারি C_1 পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হাফ-অ্যাডারের ইনপুট S_1 এবং C_i থেকে যোগফল S_2 ও ক্যারি C_2 পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হাফ অ্যাডারের যোগফলই হবে ফুল অ্যাডারের যোগফল। ১ম ও ২য় হাফ অ্যাডারের ক্যারি যোগ করে পাওয়া যাবে ফুল অ্যাডারের ক্যারি।

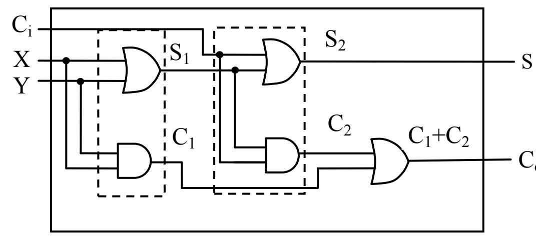

চিত্রঃ হাফ অ্যাডারের সাহায্যে ফুল অ্যাডার বাস্ড়বায়নের লজিক সার্কিট

প্রথম হাফ-অ্যাডারের ক্ষেত্রে- $S_1 = X \oplus Y$ এবং $C_1 = XY$

দ্বিতীয় হাফ-অ্যাডারের ক্ষেত্রে–

$S_2 = S_1 \oplus C_i$ এবং $C_2 = S_1C_i$

ফুল-অ্যাডারের ক্ষেত্রে ইনপুট X, Y, C_i এবং আউটপুট যোগফল S ও ক্যারি C_o হলে–

$$S = X \oplus Y \oplus C_i$$
$$= S_1 \oplus C_i$$
$$= S_2$$

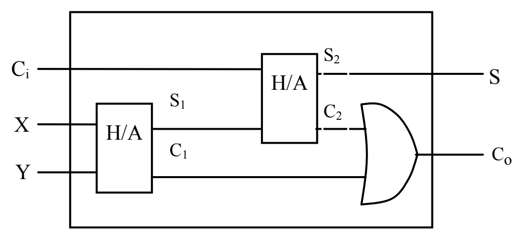

চিত্রঃ হাফ অ্যাডারের সাহায্যে ফুল অ্যাডার বাস্ড়বায়নের ব- ক ডায়াগ্রাম

আবার, $C_o = \overline{X}YC_i + X\overline{Y}C_i + XY\overline{C}_i + XYC_i$

$$= C_i(\overline{X}Y + X\overline{Y}) + XY(\overline{C}_i + C_i)$$
$$= C_i(X \oplus Y) + XY.1$$
$$= S_1C_i + C_1$$
$$= C_2 + C_1$$

সুতরাং Full Adder এর আউটপুট যোগফল $S = S_2$ এবং ক্যারি $C_o = C_2 + C_1$

$\therefore$ দুটি হাফ অ্যাডার ও একটি অর গেইট ব্যবহার করে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা হলো।

৩.৭.১০ রেজিস্টার (Register)

রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট যা অস্থায়ী মেমরি হিসেবে কাজ করে। এর প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় উপাত্ত অস্থায়ীভাবে জমা রাখার জন্য রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। ফ্লিপ-ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারে কম্বিনেশনাল (Combinational) গেইট থাকতে পারে যা কোনো ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ করতে পারে। ব্যাপক অর্থে রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এবং গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট।

n বিটের একটি বাইনারি তথ্য ধারণের জন্য n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপবিশিষ্ট একটি রেজিস্টার প্রয়োজন। কোনো একটি রেজিস্টার কী পরিমাণ তথ্য ধারণ করবে তা নির্ভর করে রেজিস্টারের দৈর্ঘ্যের উপর, যেমন 8- বিট রেজিস্টার, 16- বিট রেজিস্টার, 32-বিট রেজিস্টার ইত্যাদি- যারা যথাক্রমে 8, 16, 32 বিট তথ্য ধারণ করতে পারবে। ফলে কম্পিউটারের গতি এবং তথ্য প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা অনেকটা রেজিস্টারের উপর নির্ভরশীল। রেজিস্টারে নতুন তথ্য রাখাকে লোডিং বলে।

রেজিস্টারের ব্যবহার (Uses of Register)

রেজিস্টার হলো CPU-র অন্তর্গত সঞ্চয় ব্যবস্থা। এতে তথ্য বা নির্দেশ সাময়িকভাবে সঞ্চিত রাখা যায়। রেজিস্টারে প্রোগ্রামার কোনো কিছু জমা রাখতে পারে না, একমাত্র CPU-ই গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোনো কিছু সঞ্চিত রাখতে পারে। রেজিস্টারের গঠন প্রধান মেমরির অনুরূপ। বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টারে রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়, কী-বোর্ড বাফারে ব্যবহৃত হয়।

রেজিস্টারের প্রকারভেদ (Types of Register)

গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা:

১. প্যারালাল লোড রেজিস্টার (Parallel Load Register)
২. শিফ্ট রেজিস্টার (Shift Register)

কাজের প্রকৃতি অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা:

১. অ্যাকিউমুলেটর রেজিস্টার (Aucumulator Register)
২. সাধারণ রেজিস্টার (General Register)
৩. বিশেষ রেজিস্টার (Special Register)

রেজিস্টারের গঠন (Structure of Register)

কাজের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হয়। তবে সরল ও সাধারণ রেজিস্টারগুলো শুধুমাত্র ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দ্বারা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় না। নিম্নের চিত্রটি একটি সরলতম 4-বিট রেজিস্টারের গঠন দেখানো হয়েছে। এটি শুধু D-ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এটি 4 বিটের বাইনারি সংখ্যা ধারণ ও সংরক্ষণ করতে পারে।

রেজিস্টারটির কমন ক্লক ইনপুটে (Common Clock) পালস্ (Pulse) দিলে I_0, I_1, I_2, I_3 ইনপুটের ডেটা রেজিস্টারে স্থানান্তরিত হয়। রেজিস্টারের ডেটা তার আউটপুট A_0, A_1, A_2, A_3 হতে যে কোনো সময় গ্রহণ করে। যখন প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপের Clear (C) 0 হয় তখন ফ্লিপ-ফ্লপটি রিসেট (Reset) হয়। তবে নরমাল (Normal) অপারেশনের সময় Clear input অবশ্যই 1 রাখতে হয়। রেজিস্টারে নতুন তথ্য সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় রেজিস্টার লোডিং। রেজিস্টারের তথ্য অপরিবর্তিত রাখতে হলে সার্কিটের ক্লক পাল্স অফ/বন্ধ করতে হবে।

প্যারালাল লোড রেজিস্টার (Parallel Load Register)

নিচে একটি সাধারণ সরলতম প্যারালাল লোড রেজিস্টার বা বাফার রেজিস্টারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো। এটি ৪ বিটের বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। প্যারালাল লোড রেজিস্টার হলো এমন এক ধরনের রেজিস্টার যেখানে একটি কমন পালস্ সিস্টেম থাকে। কমন পালসের যেকোনো একটি টার্মিনাল পাল্স পাবার সাথে সাথে সবগুলো রেজিস্টার সক্রিয় হয় এবং তথ্য ধারণ করে।

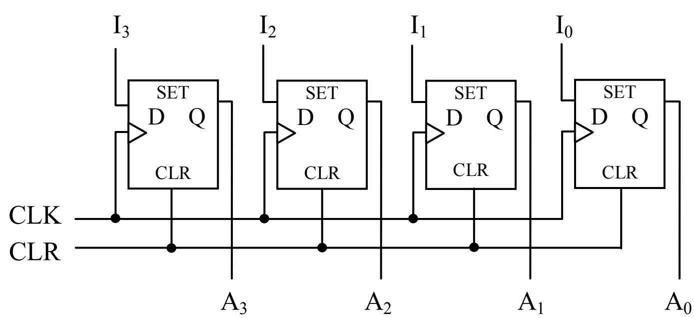

চিত্র: একটি 4-বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টার

শিফ্‌ট রেজিস্টার (Shift Register)

যে রেজিস্টার বাইনারি বিট ধারণের পাশাপাশি ধারনকৃত বিটকে ডানদিকে বা বামদিকে বা উভয় দিকে সরাতে পারে তাকে শিফ্‌ট রেজিস্টার বলে। শিফট রেজিস্টার মূলত একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা তৈরি। ফ্লিফ-ফ্লপগুলো চেইন আকারে একটির আউটপুট আরেকটির ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি কমন পাল্‌সের মাধ্যমে সব ফ্লিপ-ফ্লপ ইনপুট গ্রহণ করে এক স্টেট হতে অপর স্টেটে ডেটা শিফটিং এর কাজ করে। একটি সরল 4-বিট শিফ্‌ট রেজিস্টারের ব্লক চিত্র দেখানো হলো। এটি শুধুমাত্র D ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এখানে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। সকল ফ্লিপ-ফ্লপের সাথে একটি কমন পাল্‌স সিস্টেম যুক্ত হয়েছে। ফলে এক একটি পাল্‌স এক একটি বিট স্থানান্তরের কাজ করে।

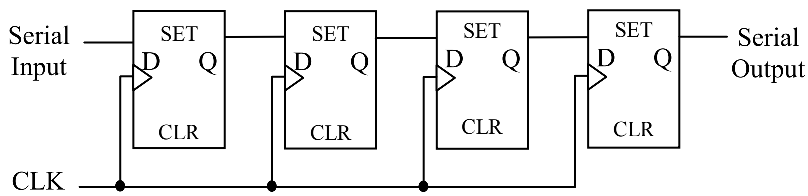

চিত্র: একটি 4-বিট শিফ্‌ট রেজিস্টার

৩.৭.১১ কাউন্টার (Counter)

কাউন্টার শব্দটি এসেছে কাউন্ট থেকে যা গণনা করা বুঝায়। কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট যা তাতে দেয়া ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। কাউন্টার এক ধরনের রেজিস্টার যা বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাউন্টার ফ্লিপ-ফ্লপ এবং লজিক গেইট দিয়ে গঠিত। যে কাউন্টার বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে। একটি কাউন্টার কত থেকে কত গণনা করবে তা কাউন্টার এর ডিজাইনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার o থেকে $2^n - 1$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক গুণতে পারে এবং এটা n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠন করা হয়। উদাহরণ হিসেবে 3 বিটের একটি বাইনারি কাউন্টারের গণনা চক্র দেখানো হলো। বাইনারি গণনার ধাপ 000 থেকে 111 গণনার পর পরবর্তীতে 000 ধাপে চলে আসে। অন্য আরেক প্রকার BCD কাউন্টার পাওয়া যায় সর্বাধিক ধাপ 10টি। এটি 000 থেকে 1001 পর্যন্ত গণনা করা যায়।

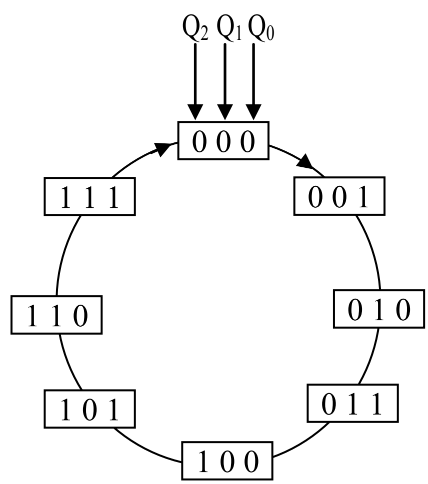

চিত্র: ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম

মোড নাম্বার (Mode Number)

কাউন্টারের মোড নাম্বার বা মডিউলাস হলো কাউন্টারটি সর্বোচ্চ কত সংখ্যা গুণতে পারে। যদি কোনো একটি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয় তবে এটি nটি ফ্লিপ-ফ্লপ নিয়ে তৈরি হবে এবং তা সিকুয়েন্সিয়াল বা ধারাবাহিকভাবে 0 হতে $2^n - 1$ সংখ্যক সংখ্যা গণনা করতে পারবে।

অর্থাৎ n-বিট কাউন্টারের মডিউলাস সংখ্যা হচ্ছে 2^n। তবে কাউন্টারের ফ্লিপ-ফ্লপের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে মডিউলাসের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

কাউন্টারের প্রকারভেদ (Classification of Counter)

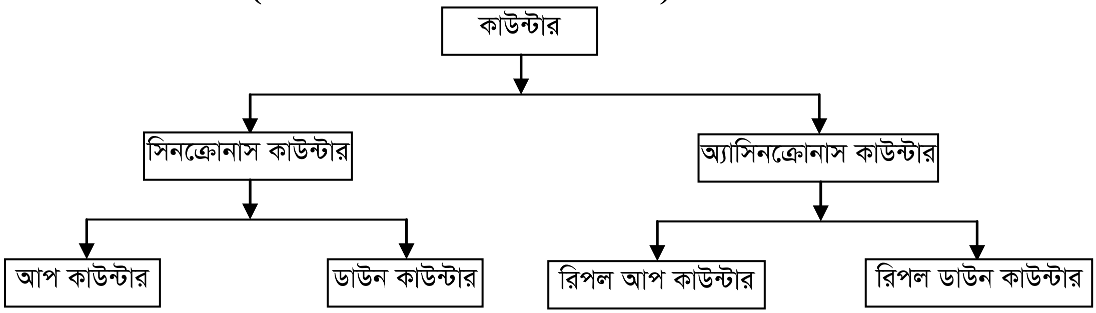

সিনক্রোনাস কাউন্টার:

যে কাউন্টারে একটি মাত্র ক্লক পালস্ সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে। যেমন-রিং কাউন্টার, MOD-10 কাউন্টার ইত্যাদি।

অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার:

যে কাউন্টারে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট অন্যটির ক্লক পালস হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার বলে। যেমন-রিপল কাউন্টার। অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার দুপ্রকার। যথা:

রিপল আপ কাউন্টার: যে কাউন্টারে ছোট নম্বর থেকে বড় নম্বরের দিকে পর্যায়ক্রমিক গণনা করা হয় তাকে রিপল আপ কাউন্টার বলে। যেমন: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ---------

রিপল ডাউন কাউন্টার: যে কাউন্টারে বড় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচের দিকে গণনা করা হয় তাকে রিপল ডাউন কাউন্টার বলে। যেমন: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

কাউন্টারের গঠন (Structure of Counter)

সবচেয়ে সহজ ও সরল কাউন্টার হলো বাইনারি রিপল কাউন্টার। রিপল কাউন্টার হলো অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ তার আউটপুট দ্বারা তার পাশের ফ্লিপ-ফ্লপকে ট্রিগার (Triggering) করতে সাহায্য করে। রিপল কাউন্টার টোগল ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা তৈরি করা যায় যা সব সময় টোগল মোডে কাজ করবে। T টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ একটি টোগল ফ্লিপ-ফ্লপ।

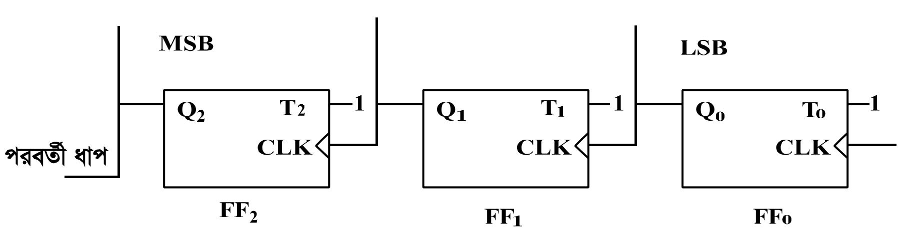

চিত্র: 3 বিট রিপল কাউন্টার

FF_0 ফ্লিপ-ফ্লপে ক্লক পাল্‌স দিলে ফ্লিপ-ফ্লপ টোগল করবে অর্থাৎ ফ্লিপ-ফ্লপটির আউটপুট প্রতি বার 0 থেকে 1 বা 1 থেকে 0 হবে। Q_0 কে FF_1 এর ক্লকের সাহায্যে সংযুক্ত করার Q_0 যখন 1 হবে তখন FF_1 টোগল করবে। অর্থাৎ প্রতি দুবার অন্তর FF_1 টোগল করবে। অনুরূপভাবে Q_1 কে FF_2 ক্লকের সাথে সংযুক্ত করায় Q_1 যখন 1 হবে তখন FF_2 টোগল করবে। অর্থাৎ FF_2 প্রতি চার বার অন্তর টোগল করবে।

কাউন্টারের পদ্ধতি (System of Counter)

বাইনারি সংখ্যা কীভাবে গণনা করা হয় তা দশমিক ও বাইনারি সংখ্যার তুলনা করে কাউন্টারের কাজ দেখানো হলো।

ক্লক পাল্‌সের সংখ্যা	আউটপুট		
	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
	প্রতি চার বার পরপর টোগল করে	প্রতি দুবার পরপর টোগল করে	প্রতিবার টোগল করে

চিত্র: 3- বিট অ্যাসিনক্রোনাস (3- বিট রিপল কাউন্টার) কাউন্টারের সত্যক সারণি

কাউন্টারের ব্যবহার (Uses of Counter):

১. ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার জন্য
২. টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের জন্য
৩. ডিজিটাল কম্পিউটারে
৪. ডিজিটাল ঘড়িতে
৫. বৈদ্যুতিক স্পন্দন গণনার ক্ষেত্রে
৬. প্যারালাল ডেটাকে সিরিয়াল ডেটায় রূপান্তর করতে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। চিত্রটি লক্ষ্য কর—

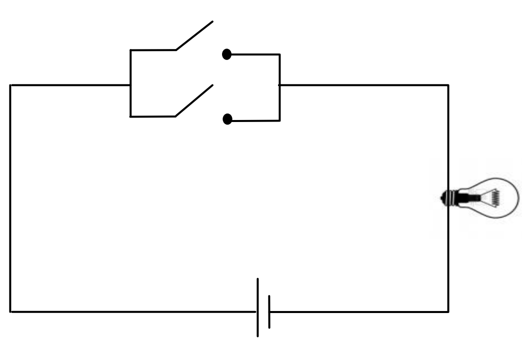

ক. উপরিউক্ত চিত্রটি কোন মৌলিক গেটকে নির্দেশ করে?
খ. সার্কিটটির সত্যক সারণি নির্ণয় কর।
গ. $Y = AX + BX$ এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
ঘ. লজিক সার্কিটের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। দুইটি বাইনারি বিট যোগ করার জন্য হাফ অ্যাডার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তিনটি বিট যোগ করার জন্য ফুল অ্যাডারের প্রয়োজন হয়। আবার হাফ অ্যাডার দিয়েও ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা যায়।

ক. মৌলিক গেইট কয়টি?

খ. অ্যাডার কি? বর্ণনা কর।

গ. হাফ অ্যাডারের সত্যক সারণি তৈরি কর।

ঘ. হাফ অ্যাডারের সাহায্যে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। আমাদের বাসায় বেড সুইস কোন গেইটের শর্ত মেনে চলে?

ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. X-OR

২। $(১৫)_{১০}$ এর সমকক্ষ বিসিডি কোড কোনটি?

ক. ০০০০১১১১ খ. ০০০০১১০১ গ. ০০০১০১০১ ঘ. ০০০০১০০১

নিচের সারণিটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

Input		Output	
A	B	S	C
০	০	০	০
০	১	১	০
১	০	১	০
১	১	০	১

৩। সত্যক সারণিটি কোন লজিক সার্কিটকে নির্দেশ করে?

ক. ন্যান্ড গেইট খ. এক্স অর

গ. হাফ অ্যাডার ঘ. অর গেইট

৪। সত্যক সারণিটি কোন বুলিয়ান সমীকরণদ্বয়কে নির্দেশ করে?

ক. $S = A, C = B$

খ. $S = A + B, C = AB$

গ. $S = A \oplus B, C = AB$

ঘ. $S = AB, C = B$

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল

INTRODUCTION TO WEB DESIGN AND HTML

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। www তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী একসাথে গাঁথা। এর মাধ্যমে আমরা বিশাল তথ্য ভাণ্ডারের সাথে যুক্ত হতে পারি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের ব্রাউজ করার জন্য বিভিন্ন ওয়েব সার্ভারে রাখা ফাইলকে ওয়েব পেজ বলে । এ পেজ সাধারণত HTML দ্বারা লেখা হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারিরা যাতে খুব সহজে কাঙ্ক্ষিত তথ্য খুঁজে পায় এ জন্য বাস্তবসম্মত এবং ব্যালেন্সড ওয়েব সাইট ডিজাইন করতে হয়। সুতরাং ওয়েব ডিজাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যবহারকারিদের আকৃষ্ট করার জন্য।

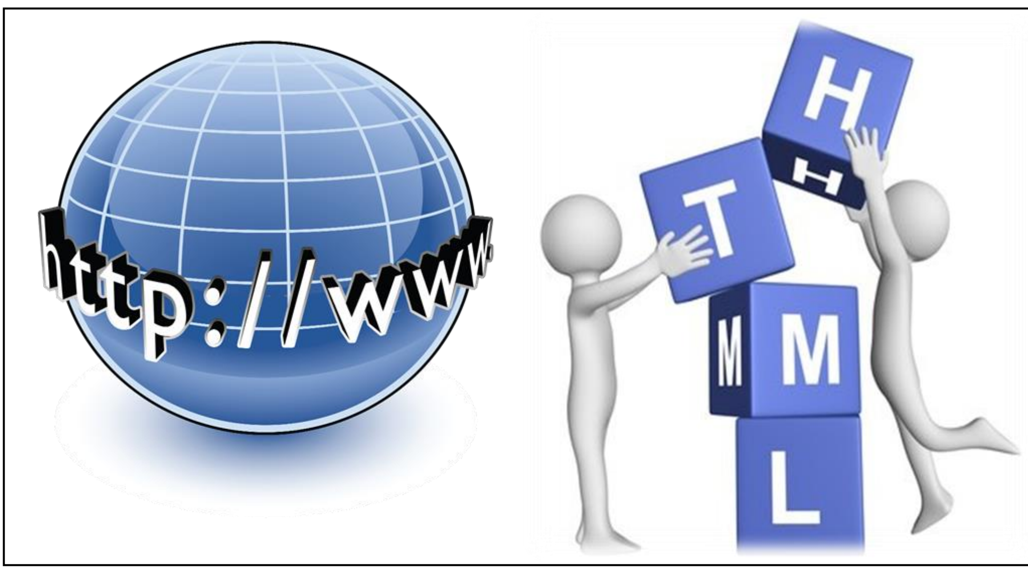

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- ওয়েব ডিজাইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ওয়েব সাইটের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে।
- এইচটিএমএল এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ব্যবহারিক:

- এইচটিএমএল ব্যবহার করে ওয়েব পেইজ ডিজাইন করতে পারবে।
- ওয়েব সাইট পাবলিশ করতে পারবে।

৪.১ ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের ব্রাউজ করার জন্য বিভিন্ন ওয়েব সার্ভারে রাখা ফাইলকে ওয়েব পেজ বলে। পরস্পর সংযুক্ত বা লিংক করা কতকগুলো ওয়েব পেজের সমন্বয়ে ওয়েব সাইট গঠিত। গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে ওয়েব সাইটকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক। যেসব ওয়েব সাইটের ডেটার মান ওয়েব পেজ লোডিং হওয়ার পর পরিবর্তন করা যায় না তাকে স্ট্যাটিক ওয়েব সাইট বলে । HTML দ্বারা এটি তৈরি করা যায়। যেসব ওয়েব সাইটের ডেটার মান ওয়েব পেজ লোডিং হওয়ার পর পরিবর্তন করা যায় তাকে ডায়নামিক ওয়েব সাইট বলে। এ ওয়েব সাইট তৈরির জন্য HTML এর সাথে পিএইচপি অথবা এএসপি প্রয়োজন।

৪.১.১ ওয়েব সাইটের কাঠামো

কোনো ওয়েব সাইটের কাঠামো বা স্ট্রাকচার বলতে সাধারণত ওয়েব সাইটের কোথায় কোনো তথ্য (Information) রাখা আছে তার সংগঠনকে বুঝায়। ওয়েব সাইটের কাঠামো তার নেটওয়ার্ক লিংক বজায় রাখতে সাহায্য করে। ওয়েব সাইটের কন্টেন্টগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য এর কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ওয়েব সাইট ব্যবহারবান্ধব করে তোলে।

ওয়েব সাইটের কাঠামো কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সেকশনের সমন্বয়ে গঠিত। সেকশনগুলোতে সহজে বিচরণের (Navigation) ব্যবস্থা থাকে। একটি ওয়েব সাইট প্রধানত তিনটি পরস্পর সংযুক্ত (Linked) সেকশন নিয়ে গঠিত-

১. হোম পেজ (Home Page)
২. মেইন সেকশন (Main section)
৩. সাব-সেকশন (Sub-section)

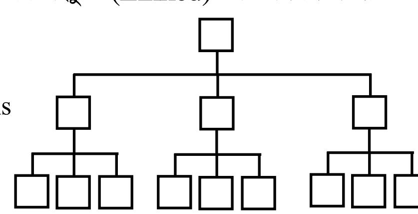

চিত্র: বেসিক ওয়েব সাইট কাঠামো।

ওয়েব সাইট নেটওয়ার্ক :

একটি ওয়েব সাইটের কাঠামো অনেকটা একটা বিল্ডিংয়ের কাঠামোর মতো। বিল্ডিং তৈরির সময় যেমন ভিন্ন ভিন্ন অংশ যথাস্থানে পরস্পরের সাথে সংযোগের ফলে সুন্দর, আকর্ষণীয় বাসযোগ্য বিল্ডিং তৈরি হয় তেমনি একটি ওয়েব সাইটের বিভিন্ন সেকশন, সাব-সেকশন ও পেজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুন্দর ফর্মে ও বিভিন্ন ফাংশন যুক্ত হয়ে ব্যবহারকারির সামনে উপস্থাপিত হয়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে একটি ওয়েব সাইটের লে-আউট দেখানো হলো।

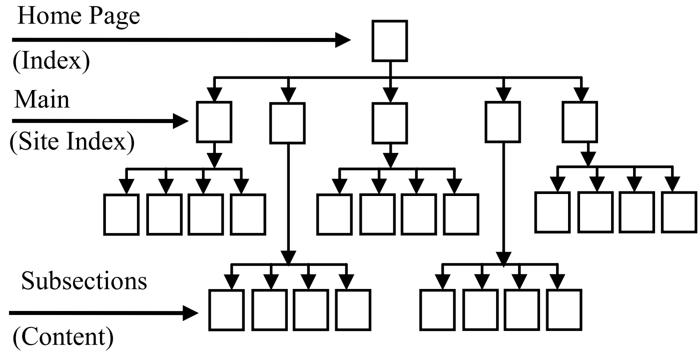

চিত্র: ওয়েব সাইট গঠন।

নেভিগেশন (Navigation):

একটি ওয়েব সাইট তখনই সার্থক হয় যখন ব্যবহারকারি তাতে খুব সহজে বিচরণ (Navigation) করতে পারে এবং তার প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করতে পারে। একটি ব্যবহারকারি বান্ধব ওয়েব সাইটে অবশ্যই পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ থাকা উচিৎ। একটি সাধারণ নিয়ম হলো ব্যবহারকারি তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে অবশ্যই দুবারের বেশি ক্লিক করতে হবে না।

টু ক্লিক নেভিগেশন:

উপরের চিত্রে তথ্যের তিনটি স্তর ব্যবহার করা হয়েছে (Three Tier of Content) এখানে হোম পেজ থেকে মেইন সেকশনে (প্রথম ক্লিক) এবং এর পর সাব-সেকশনে (দ্বিতীয় ক্লিক) যা খুব সহজ। তবে আরো একটি স্তর সংযুক্ত করা যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের ডেটার জন্য। এর বেশি স্তরবিশিষ্ট ওয়েব সাইট ব্যবহারকারিকে দ্বিধাগ্রস্ত করে এবং বিরক্তির কারণ হয়। তাছাড়া অধিক স্তরবিশিষ্ট ওয়েব সাইট বিচরণ (Navigation) সার্চ ইঞ্জিনের জন্যও জটিল।

হোম পেজ (Home Page):

কথায় আছে, মানুষের মুখ মনের কথা বলে। তেমনি কোনো ওয়েব সাইটের বিষয়, কন্টেন্ট, তথ্যের প্রাচুর্যতা ইত্যাদির ধারণা ব্যবহারকারিরা হোমপেজ থেকে পেয়ে থাকে। এটি সাইটের বিভিন্ন সেকশন ও লিংক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। এখানে শুধুমাত্র মেইন সেকশনের লিংক থাকা উচিৎ। হোমপেজে একটি সাইড ম্যাপ থাকতে হবে যাতে ব্যবহারকারীরা খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে। ব্যবহারকারীরা যখন অতি অল্প সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পায় তখন ওয়েব সাইট ভিজিট তাদের জন্য হয়ে উঠে আনন্দময়।

সীমিত টেক্সট এবং লিংক:

হোমপেজে খুব বেশি লেখা/ টেক্সট থাকা উচিৎ নয়। এতে পেজ তার সৌন্দর্য হারায় এবং ব্যবহারকারীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। সাধারণত কোনো হোমপেজে ৪০০ (চারশত) শব্দের বেশি থাকা উচিৎ নয়। অনেক ব্যবহারকারী আছে যারা খুব অল্প সময় নিয়ে ওয়েব সাইট ব্রাউজ করে, তাদের পক্ষে বেশি লেখা থাকলে তা পড়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া হোমপেজে অধিক লেখা থাকলে সার্চ ইঞ্জিনের কাজও জটিল হয়। সুতরাং সার্চ ইঞ্জিন এবং ব্যবহারকারী উভয়ের জন্যই আমাদের উচিৎ হোমপেজে যথাসম্ভব কম টেক্সট ব্যবহার করা।

তাছাড়া ব্যবহারকারীরা সাধারণত হোমপেজে স্ক্রলবার টেনে পড়তে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। সুতরাং এক পেজে যতটুকু লেখা সম্ভব ততটুকুই লিখা উচিৎ।

৪.২ HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ

HTML হলো একটি স্ক্রিপটিং ভাষা। মূলত বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ ব্যবহার করে কোড লিখতে হয়। সুতরাং HTML দ্বারা ওয়েব পেজ তৈরির জন্য কিছু মৌলিক বিষয়–কাঠামো, বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ, হাইপার লিংক, চিত্র, টেবিল ইত্যাদি সংযোজনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৪.২.১ HTML এর ধারণা

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ব্রাউজ করার জন্য বিভিন্ন ওয়েব সার্ভারে রাখা ফাইলকে ওয়েব পেজ বলে। আর এ ওয়েব পেজগুলো ইন্টরনেটের মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেখা যায়। ইন্টারনেটে ব্যবহারযোগ্য এসব ওয়েব পেজকে সাধারণত HTML দ্বারা লেখা হয়। HTML এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Hyper Text Markup Language. Markup Language এক সেট markup ট্যাগের সমন্বয়ে গঠিত। একটা ওয়েব পেজের বিভিন্ন অংশ ব্রাউজারের মাধ্যমে কীভাবে প্রদর্শিত হবে তা HTML এ markup ট্যাগসমূহ ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়।

চিত্র: টিম বার্নাস-লী।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য, উপাত্ত দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে **টিম বার্নাস-লী** HTML বা Hyper Text Markup Language তৈরি করেন। ১৯৯০ সালের দিকে মোজাইক ব্রাউজারের মাধ্যমে HTML পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৭ সালে WC3 কর্তৃক HTML3.2 প্রকাশিত হয় এবং একই বছর HTML 4.2 প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালে প্রচলিত HTML এর সর্বশেষ ভার্সন HTML 5 পরিচিতি লাভ করে।

৪.২.২ HTML এর সুবিধা

HTML ব্যবহার করতে এবং বুঝতে অত্যন্ত সহজ। এটি সকল ব্রাউজার সাপোর্ট করে। অন্য যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষার তুলনায় HTML বেশির ভাগ ব্রাউজার সাপোর্ট করে। এর ফলে যখন আমরা HTML দ্বারা ওয়েব পেজ তৈরি করি পৃথিবীর প্রায় সকল ব্রাউজারে এটি প্রদর্শিত হয়। HTML বেজড ওয়েব পেজ অপটিমাইজ করা অত্যন্ত সহজ। HTML এবং XML এর গঠন একই রকম, বর্তমানে ডেটা সংরক্ষণের জন্য XML ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। HTML এবং XML এর গঠন/ সিনটেক্স একইরকম হওয়ার কারণে এ দুটি প্লাটফর্মে কাজ করা সহজ হয়।

HTML এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে এটি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। এর জন্য কোনো প্রকার সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম কিনতে হয়না। শুধুমাত্র নোটপেড ব্যবহার করে HTML কোড লিখলেই প্রোগ্রামটি নির্বাহ করে। কোনো নির্দিষ্ট কমান্ড ভুল হলে শুধু ঐ নির্দেশ কাজ করে না বাকি নির্দেশ যথাযথভাবে কাজ করে। এ কারণে এ ভাষায় কোড লেখা যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে সহজ। এর ফলে ওয়েব সাইট তৈরিতে অনেক সাশ্রয় হয়। সকল ডেভেলপমেন্ট টুলস্ HTML কে সাপোর্ট করে- যেহেতু এটি একটি ফ্রন্টপেজ, অন্যান্য ওয়েব সাইট উন্নয়ন টুলস্ দ্বারা এবং প্রোগ্রামিং ভাষা দ্বারা সাপোর্ট করে। এটি সকল সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি ,সকল ওয়েব প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে HTML সকল সার্চ ইঞ্জিনের কাছে সবচেয়ে বেশি ফ্রেন্ডলি। সকল সার্চ ইঞ্জিনের জন্য HTML পড়া এবং এক্সেস করা সহজ। ফলে এক্সেস টাইম বা ওয়েভ পেজ লোড হতে সময় কম লাগে। এর ফলে সার্চিং এ ভালো ফলাফল পওয়া যায়।

৪.২.৩ HTML ট্যাগ ও সিনটেক্স পরিচিতি

HTML এ প্রোগ্রাম লিখার সময় <> এবং </> চিহ্ন ও এর মধ্যে কীওয়ার্ড যেমন- html, head, title, body ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। <> এবং </> চিহ্ন সহ মাঝখানের কীওয়ার্ডকে একত্রে ট্যাগ বলা হয়। HTML এ শুরু <> এবং শেষ </> ট্যাগ এর মাঝখানের অংশকে HTML ইলিমেন্ট বলা হয়।

যেমন: *<h1> This is Element</h1>*

এখানে *œThis is Element”* একটি ইলিমেন্ট।

নিচে HTML এ ব্যবহৃত কিছু সাধারণ ট্যাগ এবং এদের ব্যবহার বর্ণনা করা হলো-

ট্যাগসমূহ	বর্ণনা
<html> ……….. </html>	HTML ডকুমেন্ট নির্দেশ করে
<head> ………..</head>	প্রোগ্রামের Head নির্দেশ করে
<title> ………..</title>	পেজ টাইটেল নির্দেশ করে
<body> ………..</body>	মূল Content অংশ নির্দেশ করে
<a> ………..	Anchor ট্যাগ
<abbr> ………..</abbr>	Abbriviation ট্যাগ
 ………..	কোনো টেক্সট bold করতে ব্যবহৃত হয়
<i> ………..</i>	কোনো টেক্সট *italic* করতে ব্যবহৃত হয়
<big> ………..</big>	কোনো টেক্সট স্বাভাবিকের চেয়ে বড় করতে ব্যবহৃত হয়
 ………..	কোনো টেক্সট bold/strong করতে ব্যবহৃত হয়
_{………..}	Subscripted টেক্সট নির্দেশ করে
^{………..}	Superscripted টেক্সট নির্দেশ করে
<blockquote> ………..</blockquote>	কোনো উদ্বৃতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়
<table> ………..</table>	টেবিল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়
<col> ………..</col>	টেবিলের কলাম তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়
<td> ………..</td>	টেবিলের সেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়
<th> ………..</th>	টেবিলের শিরোনাম লিখতে ব্যবহৃত হয়
<tr> ………..</tr>	টেবিলের সারি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়
<form> ………..</form>	ফরম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<input> ………..</input>	ফরমের ইনপুট ফিল্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
………..	লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
………..	অর্ডারড লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
………..	আন-অর্ডারড লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
………..	প্যারাগ্রাফ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

টেবিল: ৪.১

HTML এট্রিবিউটস: HTML ট্যাগ এর কার্যক্ষমতাকে বর্ধিত করার জন্য এট্রিবিউটস ব্যবহার করা হয়। HTML এট্রিবিউটস ইলিমেন্টের প্রাসঙ্গিক তথ্য অর্থাৎ ইলিমেন্টের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যেমন- … ট্যাগের এট্রিবিউট হিসেবে ফ্রন্টের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়। নিচের উদাহরণে ফ্রন্টের size, face, color নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে: ILove my Country

ট্যাগ	এট্রিবিউটস
<font>	Size = ” ” face = ” ” color = ” ”
<h1> …...<h6>, <p>	Align center/ left/ right
<img>, <table>	Height = ” ” width = ” ” border = ” ”
<frameset>	border = ” ” frameborder = ” ” framespacing = ” ”
<frame>	noresize scrolling = æyes/no/auto”

৪.২.৪ HTML নকশা ও কাঠামো

ওয়েব পেজ তৈরির সময় সম্পূর্ণ কোড/ প্রোগ্রামকে কয়েকটি অংশে/ সেকশনে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন ট্যাগ বিভিন্ন অংশে লিখতে হয় যেমন- Head, body ইত্যাদি। কোড বা ট্যাগ লেখার পূর্বে আমাদের জানতে হবে কোনো অংশে কোনো ট্যাগ লিখতে হয়।

HTML প্রোগ্রামের মৌলিক অংশসমূহ:

```
<html>
        <head>
                <title> My first web page</title>
        </head>

        <body>
                This is my first web page. I am learning now HTML.
        </body>
</html>
```

<html> বা html ট্যাগ:

<html> এবং </html> ট্যাগ এর মধ্যে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম লিখতে হয় অর্থাৎ <html> এবং </html> ট্যাগ যথাক্রমে ওয়েব পেজ এর শুরু এবং শেষ নির্দেশ করে।

<head> বা head ট্যাগ:

এ অংশে বিভিন্ন ধরনের হেডার ইলিমেন্ট থাকে । এগুলো ওয়েব পেজ বা ডকুমেন্টের নাম, স্টাইল, লিংক, ডেটার তথ্য ইত্যাদি বর্ণনা থাকে। এ অংশে নিম্ন লিখিত ট্যাগগুলো সংযুক্ত করা যায়, তবে উপরের প্রোগ্রামে শুধু title ট্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছে-

<title>, <style>, < meta>, <link>, < script>, <noscript>, and <base>. এগুলোর মাধ্যমে ব্রাউজারে পেজ সম্পর্কিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

<body> বা body ট্যাগ:

<body> বা body ট্যাগ কোনো প্রোগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি ওয়েব পেজের মূল Content সমূহ body ট্যাগের মধ্যে অবস্থান করে। ওয়েব পেজের যে অংশ আমরা দেখতে পাই / প্রদর্শিত হয় তার জন্য সকল ট্যাগ এ অংশে লিখা হয়।

HTML এ প্রোগ্রাম লিখার পদ্ধতি:

যেকোনো প্রোগ্রাম লেখার জন্য কোনো এডিটর ব্যবহার করে কোডিং করতে হয়। HTML এ প্রোগ্রাম লেখার জন্য প্রাথমিকভাবে নোটপেড ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য Adobe Dreamweaver, Micresoft Expression Web, Coffee Cup HTML Editor ব্যবহার করা যায়।

নিচে একটি এইচটিএমএল HTML প্রোগ্রাম লেখার ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো–

ধাপ-১: প্রথমে Start → All Program → Accessoriesy → Noteped এ ক্লিক করে নোটপেড ওপেন করতে হবে।

ধাপ-২: নোটপেডে প্রয়োজনীয় HTML কোড লেখতে হবে

ধাপ-৩: ফাইল মেনু থেকে Save as এ ক্লিক করতে হবে। ফাইলের একটি নাম দিয়ে .html এক্সটেনশন করে Save করতে হবে।

ধাপ-৫: Save হয়ে গেলে ফাইলের উপর ডাবল ক্লিক করলেই যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার দ্বারা ওয়েব পেজটি প্রদর্শিত হবে।

৪.২.৫ ফরম্যাটিং (Formating)

আমরা যখন কোনো প্যারাগ্রাফ লিখি তখন তথ্য বা বর্ণনাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফরমেটিং টুলস ব্যবহার করি। যেমন- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর ক্ষেত্রে-Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Subscript, Superscript ইত্যাদি।

HTML এর বিভিন্ন ধরনের ফরমেটিং ট্যাগ রয়েছে। যখন যে ট্যাগ ব্যবহার করা হয় তখন ট্যাগের মধ্যবর্তী লেখা বা টেক্সট ঐ ট্যাগ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

ট্যাগ	বর্ণনা
<abbr> ………..</abbr>	Abbriviation ট্যাগ
 ………..	কোনো টেক্সট bold করতে ব্যবহৃত হয়
<i> ………..</i>	কোনো টেক্সট *italic* করতে ব্যবহৃত হয়
<big> ………..</big>	কোনো টেক্সট স্বাভাবিকের চেয়ে বড় করতে ব্যবহৃত হয়
 ………..	কোনো টেক্সট bold/strong করতে ব্যবহৃত হয়
_{………..}	Subscripted টেক্সট নির্দেশ করে
^{………..}	Superscripted টেক্সট নির্দেশ করে
<u> …………………. </u>	আন্ডার লাইন করার জন্য
<strike>(Strike) </strike>	Strike করার জন্য ব্যবহৃত হয়

HTML হেডিং: আমরা যখন কোনো প্যারাগ্রাফ লিখি তখন সেই প্যারাগ্রাফের একটি সুন্দর শিরোনাম দিয়ে থাকি। প্যারাগ্রাফের শিরোনাম দেয়ার জন্য **<h> …</h>** ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এ শিরোনাম লেখার জন্য ৬ ধরনের ট্যাগ রয়েছে। এগুলো হলো- **<h1> …</h1>, <h2> …</h2>, <h3> …</h3>, <h4> …</h4>, <h5> …</h5>, <h6> …</h6>**।

<h1> …</h1> সবচেয়ে বড় শিরোনাম লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ট্যাগগুলো ক্রমান্বয়ে ছোট আকারের শিরোনাম দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

```
< h1>This is a heading</h1>
< h2>This is a heading</h2>
< h3>This is a heading</h3>
```

HTML প্যারাগ্রাফ: ওয়েব পেজে কোনো তথ্য বা বর্ণনা সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য একাধিক প্যারাগ্রাফ আকারে লেখা হয়। HTML এ প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য <p> </p> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রত্যেক প্যারা এক্সেস করার জন্য প্রত্যেক প্যারাশেষে
 ট্যাগ দিতে হয়।
 ট্যাগ নতুন লাইন শুরু করে। প্যারাগ্রাফের মধ্যেও আমরা
 ট্যাগ ব্যবহার করে লাইন ব্রেক তৈরি করতে পারি।

উদাহরণ:

```
<p>
 This is a paragraph.
This is a paragraph.
This is a paragraph.
This is a paragraph.
</p>
<p>
This is a paragraph.<br />
This is a paragraph.<br />
This is a paragraph.<br />
This is a paragraph.<br />
</p>
```

HTML Lines:

ওয়েব পেজে অনুভূমিক রেখা তৈরি করার জন্য <hr> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

কাজ: একটি HTML পেজ তৈরি করে তোমার কলেজ সম্পর্কে তিনটি প্যারা (প্রত্যেক প্যারায় কমপক্ষে চার লাইন থাকবে) লিখ।

HTML <body> bgcolor Attribute:

কোনো HTML ডকুমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড এর রং কী হবে তা নির্দেশ করার জন্য এ ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

```
<html>
<body bgcolor="#E6E6FA">
<h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>
```

ওয়েব পেজে কালার ব্যবহারের জন্য কালার কোড ব্যবহার করা হয়। এ কালার কোড আবার তিনভাবে লেখা যায়-

- সরাসরি কালারের নাম লিখে। যেমন- æred”
- কালারের হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহার করে। যেমন- æ#ff0000”
- কালারের আরজিবি (rgb) কোড ব্যবহার করে। যেমন- ærgb (255,0,0)”

তবে ওয়েব পেজকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কালারের ব্যবহার করা হয়। এ কালার হতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা লেখাতে। কালার ব্যবহারের জন্য হেক্সাডেসিমাল কোড ব্যবহার করা সহজ। তবে সব কালার ওয়েব পেজের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই ওয়েব পেজের জন্য কালার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

নিচে কতকগুলো কালারের কোড দেয়া হলো। কোডের নম্বরগুলো পরিবর্তন করলে কালারও পরিবর্তন হয়। সুতরাং ইচ্ছামতো কালার কোড তৈরি করা যায়।

Color Name	Color Code	Color Name	Color Code
Red	#FF0000	White	#FFFFFF
Cyan	#00FFFF	Silver	#C0C0C0
Blue	#0000FF	Grey	#808080
DarkBlue	#0000A0	Black	#000000
LightBlue	#ADD8E6	Orange	#FFA500
Purple	#800080	Brown	#A52A2A
Yellow	#FFFF00	Maroon	#800000
Lime	#00FF00	Green	#008000
Fuchsia	#FF00FF	Olive	#808000

Color Name	Color Code	Color Name	Color Code
Red	#FF0000	White	#FFFFFF
Cyan	#00FFFF	Silver	#C0C0C0
Blue	#0000FF	Grey	#808080
DarkBlue	#0000A0	Black	#000000
LightBlue	#ADD8E6	Orange	#FFA500
Purple	#800080	Brown	#A52A2A
Yellow	#FFFF00	Maroon	#800000
Lime	#00FF00	Green	#008000
Fuchsia	#FF00FF	Olive	#808000

Marquee ট্যাগ:

ওয়েব পেজে কোনো টেক্সট বা ছবিকে ডানে, বামে, উপরে, নিচে চলমান করার জন্য <marquee> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়-

উদাহরণ: <marquee> I Love My Country</marquee>

এখানে, ”I Love My Country” লেখাটি ওয়েব পেজে চলমান হবে। এখানে ডানে, বামে, উপরে, নিচে কোনো দিকে চলমান হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। যেমন-

<marquee direction= ænleft”> I Love My Country</marquee>

এখানে, direction= ænleft” দেয়া হয়েছে, left এর পরিবর্তে right, up, down ইত্যাদি দেয়া যায়।

Marquee ট্যাগে ইমেজ ব্যাবহার: <marquee> ট্যাগ ব্যবহার করে ইমেজ বা ছবিকেও চলমান করা যায়-

উদাহরণ: <marquee> <img scr = æimage.jpg”</marquee>

এখানে, ওয়েব পেজে image.jpg ইমেজটি চলমান হবে। ছবি ও ইমেজের ক্ষেত্রে ট্যাগের মধ্যে নিম্নলিখিত এট্রিবিউটগুলো ব্যবহার করা যায়-Width, height, direction, behavior, scrolldelay, scrollamount, loop, bgcolor, hspace, vspace.

৪.২.৬ হাইপারলিঙ্ক

হাইপারলিঙ্ক এর মাধ্যমে একটি ওয়েব পেজের সাথে অন্য একটি ওয়েব পেজ / ডকুমেন্টের সংযোগ করা হয়। ওয়েব পেজকে ব্যবহার বান্ধব করার জন্য হাইপারলিংক একটি গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাইপারলিংক হচ্ছে একটি শব্দ/শব্দগুচ্ছ/ছবি যার উপর ক্লিক করলে অন্য একটি ওয়েব পেজ / ডকুমেন্ট ওপেন হয়। ওয়েব পেজ ব্রাউজ করার সময় আমরা যখন হাইপারলিংক শব্দ / শব্দগুচ্ছ / ছবি এর উপর মাউস কার্সর নেই তখন কার্সর এর আকৃতি পরিবর্তন হয়। HTML এ <a> ট্যাগ ব্যবহার করে হাইপারলিংক করা হয়।

গঠন: <a href= æurl”> link text<a/>

এখানে, æurl” দ্বারা যে ওয়েব পেজ/ ডকুমেন্টটি ওপেন করতে চাই তাকে বুঝানো হয়েছে, এবং link text হল হাইপারলিংক শব্দ যার উপর ক্লিক করলে কাঙ্খিত পেজ/ ডকুমেন্ট ওপেন হবে। হাইপারলিংক হিসাবে শুধু শব্দ নয়, ছবি বা অন্য কোনো এইচটিএমএল (HTML) ইলিমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ: <a href= æhttp://www.dhakaeducationboard.gov.bd”> Dhaka Board<a/>

উপরের কোড লিখা ওয়েব পেজটি ওপেন করলে, পেজে **Dhaka Board** টেক্সটি দেখা যাবে এবং এর উপর ক্লিক করলে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটটি ওপেন হবে।

হাইপারলিংক (টারগেট এট্রিবিউট):

টারগেট এট্রিবিউট লিংক করা পেজ/ ডকুমেন্টটি কোথায় ওপেন হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়।

উদাহরণ: <a href= æhttp://www.dhakaeducationboard.gov.bd ” target = æ_blank”> Dhaka Board<a/>

উপরের উদাহরণ দ্বারা ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটটি একটি নতুন উইন্ডো বা ট্যাব এ ওপেন হবে। একই ডকুমেন্টের বিভিন্ন জায়গায় জাম্প করার জন্য বা বুকমার্ক তৈরি করার জন্য আইডি এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়।

যেমন– ** Usefull Tips Section **

এখানে একই ডকুমেন্টের Usefull Tips Section নামের প্যারাগ্রাফে জাম্প করবে।

কাজ: একটি ওয়েব পেজে শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তোমার শিক্ষা বোর্ডের টপ লিস্টে স্থান

অর্জনকারি তিনটি কলেজের ওয়েব সাইটের লিংক তৈরি কর।

HTML এ <framset> ট্যাগঃ

একটি ওয়েব পেজকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করার জন্য এ ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে একটি ওয়েব পেজকে অনুভূমিক এবং উলম্বভাবে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করা যায় এবং বিভিন্ন ভাগে (অংশে) ভিন্ন ভিন্ন ওয়েব পেজ সংযুক্ত করা যায়। **<FRAMESET>** ট্যাগ **<body> ... </body>** ট্যাগের মধ্যে লিখতে হয়।

ছোট ছোট উদাহরণ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

উদাহরণ-১: ওয়েব পেজকে উপরে- নিচে সমান দুভাগে ভাগ করার জন্য নিচের কোড লিখতে হয়-

```
<FRAMESET rows="50%, 50%">
...the rest of the definition...
</FRAMESET>
```

এখানে ...the rest of the definition... স্থলে ওয়েব পেজের ভাগ করা অংশের কোনো অংশে কোনো পেজ/ চিত্র থাকবে তা লিখতে হয়।

উদাহরণ-২: ওয়েব পেজকে ডানে-বামে সমান দুভাগে ভাগ করার জন্য নিচের কোড লিখতে হয়-

```
<FRAMESET cols="50%, 50%">
...the rest of the definition...
</FRAMESET>
```

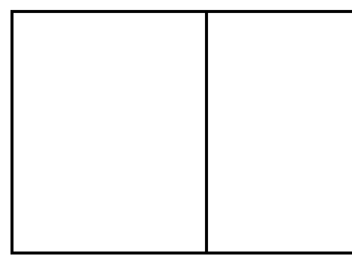

এখানে ...the rest of the definition... স্থলে ওয়েব পেজের ভাগ করা অংশের কোনো অংশে কোনো পেজ/ চিত্র থাকবে তা লিখতে হয়।

উদাহরণ-৩:

নিচের কোড ওয়েব পেজকে তিনটি কলামে ভাগ করবে যেখানে, ২য় কলাম ২৫০ প্রিক্সেল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, অবশিষ্ট অংশের ২৫% ১ম কলাম এবং ৭৫% ৩য় কলাম হবে ।

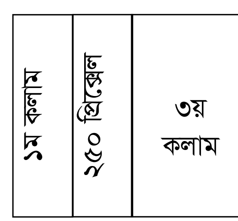


```
<FRAMESET cols="1*, 250, 3*">
...the rest of the definition...
</FRAMESET>
```

এখানে ...the rest of the definition... স্থলে ওয়েব পেজের ভাগ করা অংশের কোনো অংশে কোনো পেজ/ চিত্র থাকবে তা লিখতে হয়।

উদাহরণ-৪: নিচের কোড ওয়েব পেজকে ২ × ৩ গ্রিডে ভাগ করবে

```
<FRAMESET rows="30%, 70%" cols="33%,34%,33%">
...the rest of the definition...
</FRAMESET>
```

এখানে ...the rest of the definition...স্থলে ওয়েব পেজের ভাগ করা অংশের কোনো অংশে কোনো পেজ/ চিত্র থাকবে তা লিখতে হয়।

উদাহরণ-৫: নিচের কোড ওয়েব পেজকে সমান তিনটি কলামে ভাগ করবে, পরে ২য় (মাঝের) কলামকে আবার সমান দুভাগে ভাগ করবে-

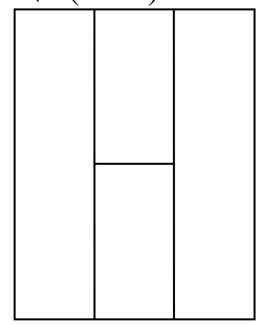

```
<FRAMESET cols = "33%, 33%, 34%">
   ...contents of first frame...
   <FRAMESET rows="50%, 50%">
     ...contents of second frame, first row...
     ...contents of second frame, second row...
   </FRAMESET>
   ...contents of third frame...
</FRAMESET>
```

উদাহরণ-৬

```
<frameset rows=”20%,* ”>
        <frame name=”top” src=”top.html”>
        <frameset cols=”20%,* ”>
                <frame name=”index” src=”index.html”>
                <frame name=”body” src=”body.html”>
        </frameset >
</frameset >
```

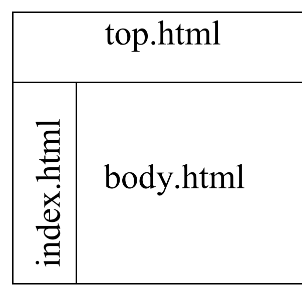

কাজ: top.thml এবং bot.html নামে দুটি ওয়েব পেজ তৈরি কর। অন্য একটি ওয়েব পেজকে উলম্বভাবে সমান দুভাগে ভাগ করে । top.thml এবং bot.html পেজ দুটি লিংক কর।

৪.২.৭ HTML এ চিত্র যোগ করা

আমরা ওয়েব পেজকে সুন্দর এবং সহজবোধ্য করার জন্য ওয়েব পেজে বিভিন্ন প্রকার চিত্র বা ছবি যুক্ত করি। HTML এ কোনো চিত্র বা ছবি যুক্ত করার জন্য <img> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এটা জানা অত্যন্ত জরুরি যে চিত্র ওয়েব পেজের কোনো টেকনিক্যাল অংশ নয়। এটি একটি আলাদা ফাইল, যখন কোনো ব্যবহারকারী পেজটি প্রদর্শনের জন্য ওপেন করে তখন চিত্র বা ছবি ঐ ওয়েব পেজের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এটি সহজে বুঝা যায় যে, একটি ছবিসহ ওয়েব পেজ মানে হলো দুটি ফাইল। একটি ওয়েব পেজ এবং অন্যটি ছবির জন্য। যখন

কোনো ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েব পেজ প্রদর্শিত হয় তখন এটি ছবির ফাইলকে অনুরোধ পাঠায় এবং নির্দিষ্ট জায়গায় সেট করে। এ কারণে **Src** একটি গুরুত্বপূর্ণ এট্রিবিউট যার অর্থ হলো **Source** যা ব্রাউজারকে বলে দেয় ছবির ফাইলটি কোথায় রয়েছে।

গঠন: <img src=”image file name with path”>

উদাহরণ: <img src=” z1.jpg”>

এখানে, **z1.jpg** হলো ফাইলের নাম, ছবি / চিত্রের ফাইলটি একই ফোল্ডারে থাকলে শুধু নাম লিখলেই চলে। অন্যথায় ফাইলের সম্পূর্ণ পাথ লিখতে হয়।

Size এট্রিবিউট: উপরের উদাহরণে ছবির জন্য শুধুমাত্র ফাইলের নাম লেখা হয়েছে, এর ফলে ছবি / চিত্রটি যে সাইজের আছে অবিকল সেই সাইজেরই প্রদর্শিত হবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ছবি ওয়েব পেজে যোগ করতে হয়, তাই ট্যাগের মধ্যে ছবির দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উল্লেখ করে দেয়া যায়। যেমন–

<img src=” z1.jpg” width=”200” height=”150”>

এখানে, দৈর্ঘ্য ২০০ প্রিক্সেল এবং উচ্চতা ১৫০ প্রিক্সেল উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ছবির আসল সাইজ যা-ই হোক উল্লেখিত সাইজেই ওয়েব পেজে প্রদর্শিত হবে।

Aling এট্রিবিউট: এ এট্রিবিউটস এর মাধ্যমে ছবি / চিত্রের অবস্থান নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ ছবিটির অবস্থান ওয়েব পেজের ডানে / বামে / উপরে/ নিচে/ মাঝখানে ইত্যাদি কোথায় অবস্থান করবে তা নির্দেশ করে।

উদাহরণ: <img src= æz1.jpg” width= æ200” height = æ150” align= æleft”>

এখানে চিত্রের অবস্থান left উল্লেখ করা হয়েছে। right, top, middle, bottom, absmiddle, absbottom, baseline. Texttop ইত্যাদি অপশনও ব্যবহার করা যায়।

Border এট্রিবিউট: আমরা যখন <img src= æimage file name with path”> ট্যাগ ব্যবহার করে ওয়েব পেজে কোনো ছবি যোগ করি তখন ছবি / চিত্রের কোনো বর্ডার থাকে না। বাইডিফল্ট বর্ডার শূন্য হিসাবে ধরা হয়। আমরা ইচ্ছা করলে ছবি/ চিত্রের বর্ডার যুক্ত করতে পারি তাও আবার ইচ্ছা মতো মোটা বা সরু করে।

উদাহরণ: <img src=” z1.jpg” width=”200” height=”150” border = ”1”>

এখানে, বর্ডার = ১ দেয়া হয়েছে। অপেক্ষাকৃত মোটা বর্ডারের জন্য ২/৩/৪ /... ... দিতে হবে।

ব্যানার যুক্ত করা: কোনো ওয়েব পেজে ব্যানার যুক্ত করতে নিম্নে উল্লেখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

ধাপ-১: প্রথমে যে ছবিটি ব্যানার হিসাবে ব্যবহার করা হবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। ধরি ফাইলটির নাম banner.jpg

ধাপ-২: ওয়েব পেজের HTML কোডে **<body></body>** ট্যাগে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে-

** <img src=”banner.jpg” width=”200” height=”95” border=”0” alt=” Dhaka Education Board”>**

এখানে banner.jpg চিত্রটি ব্যানার হিসাবে থাকবে। ব্যানারে ক্লিক করলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট ওপেন হবে।

৪.২.৮ HTML এ টেবিল

ওয়েব পেজ তৈরি করার সময় বিভিন্ন ডেটা এবং তথ্য সহজ, সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য টেবিলের প্রয়োজন হয়। টেবিল হলো কতকগুলো সারি (Row) এবং স্তম্ভ (Column) এর সমন্বয়ে গঠিত। একটি টেবিলের সকল উপাদানগুলো <TABLE> </TABLE> ট্যাগ এর মধ্যে থাকে। টেবিলের প্রত্যেক সারির শুরুতে <TR> এবং প্রত্যেক সারির শেষে </TR> ট্যাগ হয়।

Syn:

```
<TABLE>
<TR>
</TR>
</TABLE>
```

টেবিলে কলাম বা ডেটা/ অবজেক্ট যোগ করার জন্য <TD> </TD> জোড় ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

কোড	আউটপুট নিম্নরূপ দেখা যাবে-	কোডের ব্যখ্যা-
<table> <tr> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>500</td> <td>600</td> </tr> </table>	100 200 300 400 500 600	প্রথমে <table> ট্যাগ দ্বারা টেবিলের শুরু বুঝানো হয়েছে। <tr> দ্বারা রো বা সারির শুরু বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী ৩ লাইনে <td> ……</td> দ্বারা ৩ টি কলাম বুঝানো হয়েছে। …… এরমধ্যে ডেটা/ অবজেক্ট লেখা হয়েছে (100, 200, 300) </tr> দ্বারা রো বা সারির শেষ বুঝানো হয়েছে। ২য় সারির জন্য একই কোড আবার লিখা হয়েছে (ডেটা পরিবর্তন করে)

টেবিলে বর্ডার সংযুক্ত করা:

টেবিলে বর্ডার সংযুক্ত করতে ট্যাগের মধ্যে বর্ডার সাইজ উল্লেখ করতে হয়। নিচের উদাহরণে বর্ডার সাইজ ১ লেখা হয়েছে। এখানে ইচ্ছামতো বর্ডার সাইজ পরিবর্তন করা যায়।

কোড	আউটপুট নিম্নরূপ দেখা যাবে-

```
<table border="1">
<tr>
  <td>100</td>
  <td>200</td>
  <td>300</td>
</tr>
<tr>
  <td>400</td>
  <td>500</td>
  <td>600</td>
</tr>
</table>
```

100	200	300
400	500	600

টেবিলে শিরোনাম সংযুক্ত করা:

টেবিলে শিরোনাম সংযুক্ত করতে টেবিলের প্রথম সারিতে ডেটা সংযুক্ত করার সময় <td>এর পরিবর্তে <th> লিখতে হয়। একইভাবে ভার্টিক্যাল শিরোনামের জন্য প্রত্যেক সারির প্রথম কলামে ডেটা সংযুক্ত করার সময় <td>এর পরিবর্তে <th> লিখতে হয়।

কোড

```
<h4>Table headers:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>Name</th>
  <th>Telephone</th>
  <th>Telephone</th>
</tr>
<tr>
  <td>Bill Gates</td>
  <td>555 77 854</td>
  <td>555 77 855</td>
</tr>
          </table>
```

আউটপুট

Table headers:

Name	Telephone	Telephone
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

```
<h4>Vertical headers:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>First Name:</th>
  <td>Bill Gates</td>
</tr>
<tr>
  <th>Telephone:</th>
  <td>555 77 854</td>
</tr>
<tr>
  <th>Telephone:</th>
  <td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
```

Vertical headers:

First Name:	Bill Gates
Telephone:	555 77 854
Telephone:	555 77 855

টেবিলে ক্যাপশন দেওয়া:

কোনো টেবিলে ক্যাপশন সংযুক্ত করতে <table > ট্যাগের পর <caption> </caption> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়–

কোড	আউটপুট নিম্নরূপ দেখা যাবে–

```
<table border="1">
  <caption>Monthly
savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>Tk.100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td> Tk.50</td>
  </tr>
</table>
```

Monthly savings

Month	Savings
January	Tk.100
February	Tk.50

টেবিলের একাধিক রো অথবা কলাম মার্জ (একীভূত) করা:

একাধিক কলাম মার্জ করতে <th colspan="n">…..</th> এবং একাধিক রো মার্জ করতে <th rowspan = "n">…..</th> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এখানে n যেকোন পূর্ণ সংখ্যা।

কোড

```
<h4>Cell that spans two
columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>Name</th>
  <th colspan="2">Telephone</th>
</tr>
<tr>
  <td>Bill Gates</td>
  <td>555 77 854</td>
  <td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
```

আউটপুট

Cell that spans two columns:

Name	Telephone	
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

```
<h4>Cell that spans two rows:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>First Name:</th>
  <td>Bill Gates</td>
```

Cell that spans two rows:

First Name:	Bill Gates
Telephone:	555 77 854

```
</tr>
<tr>
 <th rowspan="2">Telephone:</th>
 <td>555 77 854</td>
</tr>
<tr>
 <td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
```

	555 77 855

উদাহরণ: টেবিলের ভিতর টেবিল তৈরি এবং লিস্ট ব্যবহার

কোড

```
<table border="1">
<tr>
 <td>
  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is another paragraph
</p>
 </td>
 <td>This cell contains a table:
  <table border="1">
  <tr>
   <td>A</td>
   <td>B</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>C</td>
   <td>D</td>
  </tr>
  </table>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td>This cell contains a list
  <ul>
   <li>apples</li>
   <li>bananas</li>
   <li>pineapples</li>
  </ul>
 </td>
 <td>HELLO</td>
</tr>
</table>
```

আউটপুট

This is a paragraph This is another paragraph	This cell contains a table: A B C D
This cell contains a list • apples • bananas • pineapples	HELLO

উদাহরণ: সেলের মধ্যবর্তী ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব। এবং কালারের ব্যবহার–

কোড

```
<h4>Without cellspacing:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <td>First</td>
  <td>Row</td>
</tr>
<tr>
  <td>Second</td>
  <td>Row</td>
</tr>
</table>
<h4>With cellspacing="0":</h4>
<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
  <td>First</td>
  <td>Row</td>
</tr>
<tr>
  <td>Second</td>
  <td>Row</td>
</tr>
</table>
<h4>With cellspacing="10":</h4>
<table border="1" cellspacing="10">
<tr>
  <td>First</td>
  <td>Row</td>
</tr>
<tr>
  <td>Second</td>
  <td>Row</td>
</tr>
</table>
```

আউটপুট

Without cellspacing:

First	Row
Second	Row

With cellspacing="0":

First	Row
Second	Row

With cellspacing="10":

First	Row
Second	Row

```
<table
style="width:180px;height:100px;background-
color:lightblue;">
<tr style="background-
color:blue;color:white;">
<th>Table header</th><th>Table header</th>
</tr>
<tr>
<td>Table cell 1</td><td style="background-
color:lightgreen;">Table cell 2</td>
</tr>
</table>
```

Table header	Table header
Table cell 1	Table cell 2

কাজ: রোল নং, নাম, জিপিএ শিরোনামবিশিষ্ট তিন কলামের একটি টেবিল তৈরি করে ৫ (পাঁচ) টি রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত কর।

টেবিলে ডেটার পরিবর্তে ছবি/ ইমেজ সংযুক্ত করা যায়–

কোড

```
<TABLE BORDER="7"
CELLPADDING="7"
CELLSPACING="10">
<TR BGCOLOR="#00FF00">
<TD><IMG SRC="rrose.gif"
ALT="rose"></TD>
<TD>Image is a transparent .gif.</TD>
</TR>
</TABLE>
```

আউটপুট

	Image is a transparent .gif.

৪.৪ ওয়েব পেইজ ডিজাইন করা

সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং অর্থপূর্ণ ওয়েব পেজ তৈরি করতে হলে আমাদের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে কাজ করতে হয়। নিম্নে ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ: ওয়েব পেজ ডিজাইন করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে

পরিকল্পনা: একটি ওয়েব সাইট তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ওয়েব সাইটের লক্ষ / উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য ব্যবহারকারির সংখ্যা, প্রদর্শিতব্য বিষয়বস্তু, ওয়েব সাইটের গুণগতমান ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

ডিজাইন:

আমরা যখন কোনো ওয়েব পেজ ডিজাইন করি তখন আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ/ কন্টেন্ট সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ পেজ তৈরি করতে টেক্সট, চিত্র ইত্যাদি। প্রথমেই সুন্দর ও অর্থবোধক একটি টাইটেল দিতে হবে যাতে ব্যবহারকারি সহজে বুঝতে পারে। হোম পেজে বড় আকারের বর্ণনা দেয়া ঠিক নয়, ছোট ছোট প্যারা আকারে দেয়া উচিৎ।

থিম (Them):

থিম হিসেবে সুন্দর, অর্থপূর্ণ, বৈশিষ্ট্য প্রকাশক কোনো টেক্সট/ ইলিমেন্ট ওয়েব সাইটের প্রত্যেক পেজে একই স্থানে প্রদর্শিত হয়। Navbar, Header, Footer ইত্যাদি প্রত্যেক পেজে একই জিনিস প্রদর্শিত হয়। গ্রুপ আইটেমগুলো একসাথে রাখা উচিৎ এবং যথা সম্ভব ফাঁকা স্থানে (White Space) রাখা উচিৎ যাতে ব্যবহারকারি সহজে বুঝতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ লিংকটেক্সটগুলো বোল্ড করা এবং ছবি ও টেক্সট ব্যাকগ্রউন্ড কালার থেকে আলাদা হওয়া উচিৎ যাতে সহজে ব্যবহারকারির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

অ্যালাইনমেন্ট (Alignment):

ওয়েব পেজ তৈরির সময় মেইন ইলিমেন্ট এর টেক্সট এর অ্যালাইনমেন্ট (Alignment) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে সম্পূর্ণ পেজে একই ধরনের অ্যালাইমেন্ট ব্যবহার করতে হবে এমনটি নয়। ওয়েব পেজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্লাইসিং:

ওয়েবের ইন্টারফেজ তৈরির আগে কাগজে- কলমে একটি খসড়া ডিজাইন করে নিলে মূল ডিজাইন তৈরির সময় উপকারে আসে। ইন্টারফেজের ব্যানার কোথায় কী মাপের হবে, বাটন, চিত্র কোথায় কী মাপের হবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। পেজকে একাধিক রো এবং কলামে বিভক্ত করা যায়। কয়টি অংশে বিভক্ত হবে কোনো অংশ কতটুকু বড় হবে এবং কোনো অংশে কী প্রদর্শিত হবে তা পূর্বেই ঠিক করে নিতে হবে।

ব্যালেন্সড ওয়েব পেজ:

পাশের চিত্রে একটি ব্যালেন্সড ওয়েব পেজ। প্রথমে লক্ষ করি পেজটিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগ সমান নয় বরং তাদের প্রয়োজন গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের আকার করা হয়েছে। সব সময় ছয় ভাগে ভাগ করতে হবে এমনটি ঠিক নয়, প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী যেকোনো সংখ্যক ভাগ করা যেতে পরে। পেজটিতে পর্যাপ্ত ফাঁকা স্থান রয়েছে, যার ফলে টেক্সটগুলো ব্যবহারকারির কাছে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় হয়েছে। লক্ষ রাখতে হবে, কন্টেন্টগুলো যেন পেজে সুবিন্যস্ত থাকে। টেক্সট বা লিংক যথা সম্ভব কম হওয়া ভালো। হোম পেজ থেকে সকল লিংক যেন মেইন সেকশনে থাকে। ব্যবহারকারি যেন সর্বোচ্চ দুই ক্লিকে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্য পায়।

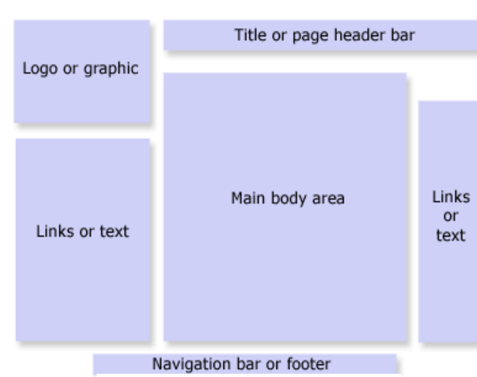

চিত্র: ব্যালেন্সড ওয়েবপেজ

কোড লেখা ও এডিট করা:

ওয়েব পেজের বেশির ভাগ কাজই HTML ব্যবহার করে করা যায়, তবে ডায়নামিক ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে চাইলে বিভিন্ন ধরনের ওয়েব প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করতে হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জাভাস্ক্রিপ্ট, পাইথন, এএসপি (ASP), জেএসপি (JSP) ইত্যাদি। HTML এ লেখা কোড যেকোনো এডিটর ব্যবহার করে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়।

ডেটাবেজ অন্তর্ভুক্ত করা:

ওয়েব পেজ থেকে ব্যবহারকারীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার জন্য ডেটাবেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার ব্যবহারকারীর কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জানা এবং সংরক্ষণ করার জন্যও ডেটাবেজ প্রয়োজন। এজন্য বর্তমানে ওয়েব ডিজাইন করতে গেলে ডেটাবেজ ব্যবহারের কথা মনে রাখতে হবে।

ওয়েব পেজ টেস্টিং:

ওয়েব পেজ ডিজাইনের পর কোডিং করা এবং ডেটাবেজ অন্তর্ভুক্ত করার পর এটি পরীক্ষা করতে হবে। এজন্য যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে পেজটি বার বার প্রদর্শন করে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে টেক্সট, ছবি, লিংক ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে।

দলীয় কাজ: তোমাদের কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম, বৈশিষ্ট্য, নোটিশ, ফটো গ্যালারি ইত্যাদি সংযুক্ত করে কমপক্ষে ১০ (দশ) টি ওয়েব পেজ তৈরি কর। তোমার শিক্ষা বোর্ড লিংক করে একটি ব্যানার সংযুক্ত কর। পেজগুলো লিংক করে একটি ওয়েব সাইট ডিজাইন করে তোমার শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

৪.৫ ওয়েব সাইট পাবলিশ করা:

আমরা ওয়েব সাইটের কাঠামো সম্পর্কে জানলাম। কতকগুলো ওয়েব পেজ নির্দিষ্ট নিয়মে পরস্পরের সাথে যুক্ত (লিংক) হয়ে ওয়েব সাইট তৈরি হয়। আমরা ওয়েব পেজ তৈরি করা, লিংক করা শিখলাম। সুতরাং আমরা ওয়েব সাইট তৈরি করতে পারি। শুধু তৈরি করলেই হবেনা এটি পাবলিশ করতে হবে। এখন আমরা জানব কীভাবে ওয়েব সাইট পাবলিশ করা হয়-

কোনো ওয়েব সাইট পাবলিশ করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হয়।

১। ডেমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে–

প্রথমে ওয়েব সাইটের একটি সুন্দর নাম ঠিক করে সেই নামের ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করে এমন অনেক কোম্পানি রয়েছে। কোম্পানিগুলোর নিজেস্ব কিছু নিয়মকানুন এবং ফি নির্ধারিত আছে। যে কেউ ফি পরিশোধ করে পছন্দ মতো নামে ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রি করতে পারে। রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে যেসব বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে–

- যে নামে রেজিস্ট্রি করতে ইচ্ছুক সে নাম অন্য কেউ ব্যবহার করে কিনা? একই নামে দুটি রেজিস্ট্রেশন হয় না।
- রেজিস্ট্রেশনটি নিজের নামে নাকি কোম্পানির নামে হবে।
- ডোমেইনের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা, বিল ইত্যাদি কার নামে হবে।
- কার মাধ্যমে ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করানো হবে।
- ডোমেইনের Primary এবং Secondary DNS কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
- বিলিং পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ।

ডোমেইন নেম এর দুটি অংশ থাকে, ডট এর পরের অংশকে টপলেভেল ডোমেইন বলা হয়। এটি দেখে প্রতিষ্ঠানের ধরন বুঝা যায়। যেমন–

টপলেভেল ডোমেইন	ডোমেইনের ধরন
com	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
mil	মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত
edu	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
net	নেটওয়ার্ক সার্ভিস
org	অর্গানাইজেশন
Int	আন্তর্জাতিক সংস্থা
gov	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

অনেক ডোমেইন নেম এর পর দু'অক্ষরবিশিষ্ট অতিরিক্ত কোড যুক্ত থাকে। এটি দ্বারা ডোমেইন নেইম টি কোন দেশের তা বুঝা যায়। যেমন: বাংলাদেশের জন্য .bd যুক্ত হয়।

২। **ওয়েব পেইজ ডিজাইন করতে হবে:**

এক্ষেত্রে সকল নিয়ম মেনে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ওয়েব পেজ তৈরি করতে হবে।

৩। **ওয়েব সার্ভারে পেজ হোস্টিং:**

ওয়েব পেজ ডিজাইন করার পর তা ওয়েব সার্ভারে হোস্ট করতে হয়। ডোমেইন নামটি রেজিস্ট্রেশন করার পর তা ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিতে স্থানান্তর করতে হয়। ওয়েব সার্ভার বলতে বিশেষ ধরনের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে বুঝায় যার সাহায্যে ঐ সার্ভারে রাখা কোনো উপাত্ত/তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক্সেস করা যায়।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়ে পরিপত্র জারি করেছেন। এর ফলে এম এম কলেজ তাদের নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় এ কাজের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন। তিনজন ওয়েব সাইট তৈরির প্রয়োজনীয় কাজগুলো ভাগ করে নিয়ে ওয়েব সাইট তৈরির কাজ শুরু করলেন।

ক. HTML ট্যাগ কী?

খ. HTML তৈরির উদ্দেশ্য কী ছিল?

গ. কলেজের ওয়েব সাইট তৈরির জন্য কী কী ধাপে কাজ করতে হবে তা বর্ণনা কর।

ঘ. কলেজের ওয়েব সাইট তৈরির ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে তা ব্যাখ্যা কর।

২। Markup language এক সেট Markup ট্যাগের সমন্বয়ে গঠিত। একটা ওয়েব পেজের বিভিন্ন অংশ ব্রাউজারের মাধ্যমে কীভাবে প্রদর্শিত হবে তা HTML এ Markup ট্যাগসমূহ ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়।

ক. HTML এটিবিউটস কি?

খ. HTML প্রোগ্রামের মৌলিক অংশগুলো কি কি?

গ. তোমার কলেজ সম্পর্কে একটি প্যারাগ্রাফ লেখ যেখানে কমপক্ষে ৫টি ফরমেটেড ট্যাগ ব্যবহৃত হয়।

ঘ. HTML ট্যাগের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। কোনো ওয়েব সাইটের হোম পেজে অধিক টেক্সট থাকলে–

i. পেজ সৌন্দর্য হারায়।

ii. ব্যবহারকারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

iii. সার্চ ইঞ্জিনের জন্য খোঁজা জটিল হয়।

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i , ii ও iii

২। হাইপারলিংক ট্যাগে টারগেট সেট না করলে–

i. একই উইন্ডোতে ওপেন হয়।

ii. নতুন উইন্ডোতে ওপেন হয়।

iii. হাইপারলিংক ট্যাগ কাজ করে না।

নিচের কোনোটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। টেবিলে সেল তৈরির জন্য কোনো ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?

ক. <th> খ. <td> গ. <td> ঘ. <col>

৪। কোনো ওয়েব পেজকে একাধিক ভাগে ভাগ করার জন্য কোনো ট্যাগ ব্যবহার করা হয়?

ক. <frame> খ. <frameset> গ. <form> ঘ. <framei>

পঞ্চম অধ্যায়

প্রোগ্রামিং ভাষা

PROGRAMMING LANGUAGE

বর্তমানে মানুষ প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মানুষের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের সাহায্যে প্রোগ্রাম রচনা করে। প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি প্রোগ্রামের সংকেত বা কোড। প্রোগ্রামার কম্পিউটারকে দিয়ে সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রোগ্রামের ভাষা, মেশিন ভাষা, অ্যাসেম্বলি ভাষা, উচ্চস্তরের ভাষা, অনুবাদক প্রোগ্রাম, প্রোগ্রামের সংগঠন, প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ, অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সি একটি জনপ্রিয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা। ১৯৭০ সালে আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস রিচি সি ভাষার উদ্ভাবন করেন। সি প্রোগ্রামিং ভাষা জানার জন্য এর প্রাথমিক ধারণা, বৈশিষ্ট্য, প্রোগ্রাম কম্পাইলিং, প্রোগ্রামের গঠন, ডেটা টাইপ, রাশিমালা, কী ওয়ার্ড, ইনপুট-আউটপুট স্টেটমেন্ট, কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট, লুপ স্টেটমেন্ট, অ্যারে ও ফাংশন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

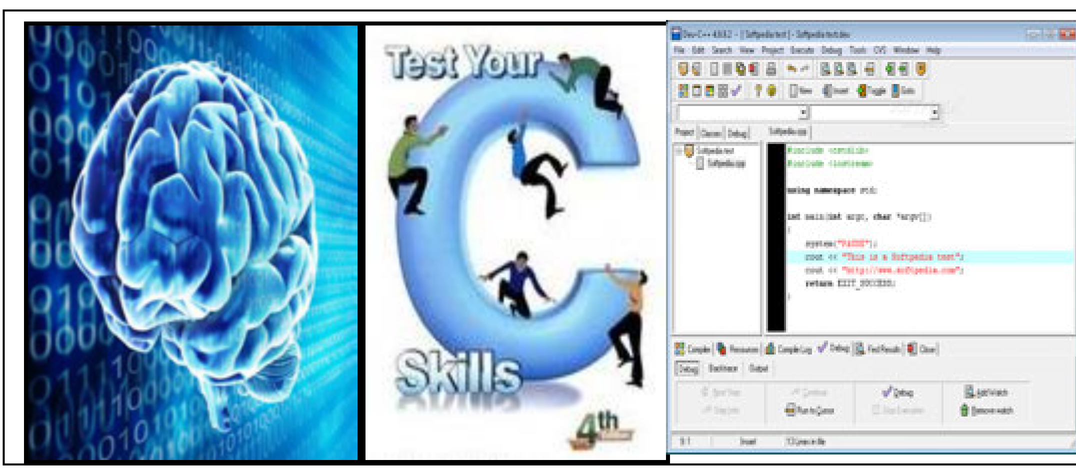

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবে।
- অনুবাদক প্রোগ্রাম বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রোগ্রামের সংগঠন প্রদর্শন করতে পারবে।
- প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করতে পারবে।
- প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল বর্ণনা করতে পারবে।
- ‘সি’ প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারবে।

৫.১ প্রোগ্রামের ধারণা (Concept of Program)

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অনেক রকমের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। কম্পিউটার এত সব ভাষার একটিও বোঝে না। কম্পিউটারকে তার নিজস্ব বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ প্রদান করতে হয়। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে লিখিত কতকগুলো কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয়। আর প্রোগ্রামের ভাষা বলতে আমরা বুঝি কিছু নির্দেশাবলি যা কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কম্পিউটার কী ধরনের কাজ করবে, কোথায় ডেটাসমূহ রাখবে, ফলাফল কী হবে প্রভৃতি নির্ধারণ করে।

কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটার মানুষের মতো বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন এসব কিছু বুঝতে পারে না। কম্পিউটারের ভাষা শুধু কম্পিউটারই বুঝে। কম্পিউটারের ভাষা জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। প্রকৃতপক্ষে 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া আর কিছুই বোঝে না এ যন্ত্রটি। ইলেকট্রনিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটারের ভাষা। এ ভাষাকে বাইনারি পদ্ধতির 0 এবং 1 দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কম্পিউটার কেবল ইলেকট্রনিক সংকেত অর্থাৎ সার্কিটে বিদ্যুৎ আছে কি নেই তা বোঝে। বাইনারি 1 দ্বারা বিদ্যুৎ আছে (ON) এবং 0 দ্বারা বিদ্যুৎ নেই (OFF) এর উপর ভিত্তি করেই কম্পিউটারের ভাষা তৈরি করা হয়েছে।

প্রোগ্রামের ভাষা (Programming Language)

কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করার জন্য শব্দ, বর্ণ, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়ম প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারকে আদেশ-নির্দেশ প্রদানের জন্য কম্পিউটার বুঝতে পারে এমন কিছু সংকেত এবং কতিপয় নিয়ম কানুন ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। প্রোগ্রাম তৈরির জন্য ব্যবহৃত এসব নিয়ম কানুন ও সংকেতগুলোকে একত্রে প্রোগ্রামের ভাষা বলে। কম্পিউটারের নির্দেশ প্রদানযোগ্য প্রোগ্রামের ভাষা সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভুল না হলে কম্পিউটার কোনো কাজ করে না। কম্পিউটারের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। এটি ইংরেজি, বাংলা, আরবি, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি কোনো ভাষাই বোঝে না। শুধু তার নিজের ভাষায় প্রোগ্রাম লিখলেই সে বুঝতে পারে, অন্যথায় পারে না। কম্পিউটার প্রোগ্রাম রচনার অনেকগুলো ভাষা আছে।

৫.২ বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা

কম্পিউটার প্রোগ্রামের জন্য অনেক রকম কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তর বা প্রজন্মে ভাগ করা যায়। যথা–

- প্রথম প্রজন্ম বা ফার্স্ট জেনারেশন ভাষা (১৯৪৫): মেশিন ভাষা (Machine Language)
- দ্বিতীয় প্রজন্ম বা সেকেন্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৫০): অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)
- তৃতীয় প্রজন্ম বা থার্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৬০): উচ্চতর (High Level Language)
- চতুর্থ প্রজন্ম বা ফোর্থ জেনারেশন ভাষা (১৯৭০): অতি উচ্চতর (Very High Level Language)
- পঞ্চম প্রজন্ম বা ফিফ্থ জেনারেশন ভাষা (১৯৮০): স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল (Natural) ভাষা।

প্রোগ্রাম রচনার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোগ্রামের ভাষাসমূহকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা হয়।

যথা: নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language) এবং উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)। কম্পিউটার বা অনুরূপ যন্ত্রগুলো সরাসরি বুঝতে পারে এরূপ ভাষাকে নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়।

চিত্র: প্রোগ্রামের ভাষার

নিম্নস্তরের ভাষা আবার দুপ্রকার। যথা: মেশিনের বা যন্ত্রের ভাষা (Machine Language) এবং অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)। পাশে এসব ভাষার অবস্থান দেখানো হয়েছে। মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষাকে লো-লেভেল ভাষা বলে। কারণ এগুলো কম্পিউটারের ভাষার (0 বা 1) কাছাকাছি। অন্যদিকে হাই লেভেল বা উচ্চতর ভাষা মানুষের ভাষার কাছাকাছি, যেমন–ইংরেজি। উল্লেখ্য যে নির্বাহের জন্য প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করতে হয়।

৫.৩ প্রথম প্রজন্ম বা ফাস্ট জেনারেশন ভাষা (১৯৪৫)

যান্ত্রিক ভাষা বা মেশিন ভাষা (Machine Language): কম্পিউটারের সরাসরি বোধগম্য ভাষাকে মেশিন ভাষা বা নিম্নস্তরের ভাষা বলে। যান্ত্রিক ভাষার সহজ অর্থ হচ্ছে যন্ত্রের নিজস্ব ভাষা অথবা হেক্সাপদ্ধতি ব্যবহার করে সবকিছু লেখা হয়। সুতরাং 1 ও 0 এ দুটি অঙ্ক ব্যবহার করে নির্দেশ সাজিয়ে প্রোগ্রাম লেখার পদ্ধতিকে মেশিনের ভাষায় প্রোগ্রাম বলে। মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট (Object) প্রোগ্রাম বলে। মেশিন ভাষা ব্যতিত অন্য যেকোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে বলে Source (উৎস) প্রোগ্রাম। কম্পিউটার শুধুমাত্র মেশিন ভাষাই বুঝতে পারে। অন্য কোনো ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করলে কম্পিউটার কার্য-নির্বাহের আগে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে। মেশিন ভাষায় (0 বা 1) প্রোগ্রাম লিখা অত্যন্ত জটিল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। মেশিন ভাষায় প্রতিটি নির্দেশের দুটি অংশ থাকে। যথা:

১। অপকোড (Opcode)

২। অপারেন্ড (Operand)

১। **অপকোড (Opcode):** অপকোড এর পূর্ণরূপ হলো অপারেশন কোড (Operation Code)। এর সাহায্যে কম্পিউটার কি ধরনের কাজ করবে তা বুঝানো হয়। যেমন- ADD ও DIV দিয়ে যথাক্রমে যোগ ও ভাগ করাকে বুঝায়।

২। **অপারেন্ড (Operand):** অপারেন্ড কম্পিউটারকে কি অপারেশন হবে তা নির্দেশ করে। সাধারণভাবে অপারেন্ড অপারেট করা হবে এমন ডেটা অ্যাড্রেস দিয়ে থাকে।

মেশিন ভাষায় যেসব নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. গাণিতিক (Arithmetic)	অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।
২. নিয়ন্ত্রণ (Control)	অর্থাৎ লোড (Lode), স্টোর (Store) ও জাম্প (Jump)
৩. ইনপুট-আউটপুট(Input-Output)	অর্থাৎ পড় (Read) ও লেখা (Write)
৪. প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct use)	অর্থাৎ শুরু করা (Start) এবং শেষ করা (End)

মেশিন ভাষার সুবিধা –

১. এ ভাষার সাহায্যে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রোগ্রাম লেখা যায়।
২. এ ভাষা সিপিইউ সরাসরি বুঝাতে পারে বলে অন্য ভাষার তুলনায় কম সময় লাগে।
৩. প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় লাগে।
৪. এ ভাষায় প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি মেমরির প্রয়োজন হয় না।

মেশিন ভাষার অসুবিধা–

১. এ ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি করা অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য।
২. এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।
৩. এ ভাষায় ভুল সনাক্ত করা ও ডিবাগিং করা বেশ কষ্টসাধ্য।
৪. এ ভাষায় এক কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে চালানো যায় না।
৫. এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৫.৪ দ্বিতীয় প্রজন্ম বা সেকেন্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৫০)

অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

বিভিন্ন ধরনের সংকেত বা নেমোনিক কোড ব্যবহার করে যে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়, তাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে। অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রচলন শুরু হয় ১৯৫০ সাল থেকে। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে এ ভাষার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। এ অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য এক ধরনের ট্রান্সলেটর ব্যবহার করা হয় যার নাম অ্যাসেম্বলার। এ ভাষা বিভিন্ন সংকেতের সমন্বয়ে লেখা হয়ে থাকে। এজন্য এ ভাষাকে সাংকেতিক ভাষাও বলা হয়। কারণ অ্যাসেম্বলি ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ ও ডেটার অ্যাড্রেস বাইনারি বা হেক্সা সংখ্যার সাহায্যে না দিয়ে সংকেতের সাহায্যে দেয়া হয়। এ সংকেতকে বলে সাংকেতিক কোড (Symbolic Code) বা নেমোনিক (Nemonic)। অর্থাৎ যে সংকেতের সাহায্যে কোনো বড় সংখ্যা বা কথাকে মনে রাখার সুবিধা হয়। যেমন-অ্যাকিউমুলেটরে রাখা, নেমোনিক (LDA)। মেশিনের ভাষার মতো বাইনারি সংখ্যা সরাসরি ব্যবহার না করে বরং কতকগুলো বিটের সমষ্টিকে কয়েকটি ইংরেজি বর্ণের সাহায্যে বিশেষ কোডে প্রকাশ করে কম্পিউটারকে বোঝানো হয়। এ কোডগুলোকে অ্যাসেম্বলি কোড বা অ্যাসেম্বলি ভাষা বলা হয়। যেমন- যোগ করার জন্য কম্পিউটারকে নির্দেশ দেয়ার জন্য ADD এবং বিয়োগ করার জন্য SUB ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রতিটি নির্দেশে চারটি অংশ থাকে–

১. লেবেল (Lebel)
২. অপকোড (Opcode)
৩. অপারেন্ড (Operand)
৪. মন্তব্য (Comment)

লেবেল	অপকোড	অপারেন্ড	কমেন্ট

লেবেল (Lebel)

লেবেলে এ ফিল্ড দিয়ে সাংকেতিক অ্যাড্রেসকে বুঝানো হয়। যেমন–জাম্পের সময় পরবর্তী নির্দেশের ঠিকানা লেবেলে দেওয়া হয়, তবে লেবেল সব সময় নাও থাকতে পারে। লেবেলের এক হতে দুটি অ্যালফানিউমেরিক বর্ণ থাকে, এ বর্ণের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। নির্দেশ নেমোনিক (যেমন LDA) ও রেজিস্টারের নাম লেবেল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। লেবেলের শুরুতে অবশ্যই অক্ষর থাকতে হয়।

অপকোড (Opcode)

এতে নির্দেশ নেমোনিক থাকে। আপকোড বা অপারেশন কোড দিয়ে বুঝানো হয় কি অপারেশন বা কাজ করতে হবে। যেমন- Sum এবং Sub আপকোড দিয়ে যথাক্রমে যোগ এবং বিয়োগের কাজ বুঝানো হয়।

নির্দেশ নেমোনিক	উচ্চারণ ও পূর্ণরূপ	ব্যাখ্যা
LDA	Load Accumulator লোড অ্যাকিউমুলেটর	প্রধান মেমরির কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানের সংখ্যা অ্যাকিউমুলেটরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ADD	ADD অ্যাড	ADD দিয়ে দুটি অপারেন্ড-এর মধ্যে যোগ করার নির্দেশ বুঝানো হয়।
CLR	CLEAR ক্লিয়ার	অ্যাকিউমুলেটর খালি করার কমান্ড।
STA	Store Accumulator	এর অর্থ হলো অ্যাকিউমুলেটরে ডেটা সংরক্ষণ করতে হবে।
SUB	SUBtract বিয়োগ	SUB দিয়ে দুটি অপারেন্ড-এর মধ্যে বিয়োগ করার নির্দেশ বুঝানো হয়।
MUL	MULtiply গুণ	MUL দিয়ে দুটি অপারেন্ড এর মধ্যে গুণ করার নির্দেশ বুঝানো হয়।
DIV	DIVide ভাগ	DIV দিয়ে দুটি অপারেন্ড এর মধ্যে ভাগ করার নির্দেশ বুঝানো হয়।
OR	OR অর	OR দিয়ে দুটি অপারেন্ড এর মধ্যে লজিক্যাল অর অপারেশন বুঝায়।
JMU	JUMP জাম্প	নিঃশর্ত ভাবে প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার নির্দেশ।
INP	INPUT ইনপুট	ডেটা বা নির্দেশ গ্রহণ করে মেমরির নির্দিষ্ট স্থানে রাখা।
OUT	OUTPUT আউটপুট	মেমরির কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে আউটপুটে পাঠানোর নির্দেশ।
STP	STOP থাম	প্রোগ্রামকে থামানোর নির্দেশ।

অপারেন্ড (Operand)ঃ

অপকোড যার উপর কাজ করে তাকে অপারেন্ড বলে। অপারেন্ডের অবস্থানের ঠিকানা বুঝানোর জন্য এখানে সাধারণত অ্যালফানিউমেরিক বর্ণ ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ A, B, A1, B1, AM, XY ইত্যাদি।

মন্তব্য (Comment)ঃ

কমেন্ট বা মন্তব্য নির্দেশের কোনো অংশ নয়। মন্তব্য আসলে প্রত্যেক নির্দেশের ব্যাখ্যা যাতে ভবিষ্যতে প্রোগ্রামার বা অন্য কেউ প্রোগ্রামের সঠিক অর্থ সহজে বুঝতে পারে। প্রোগ্রামের নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়। অপারেন্ড ফিল্ডের পর কোলন (ঃ) বা সেমিকোলন (;) দিয়ে মন্তব্য লেখা যায়।

উদাহরণঃ A ও B যোগ করে C অবস্থানে রাখ। এখানে A বা B এর অবস্থানের অ্যাড্রেসকেও যথাক্রমে A বা B বলা হয়। নিচে A ও B যোগ করে C অবস্থানে রাখার জন্য অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রোগ্রাম দেওয়া হলো।

CLR	অ্যাকিউমুলেটর খালি কর।
INP: A	A সংখ্যাটিকে ইনপুট থেকে প্রধান মেমরি A অবস্থানে রাখ।
INP: B	B সংখ্যাটিকে ইনপুট থেকে প্রধান মেমরি B অবস্থানে রাখ।
LDA: A	অ্যাকিউমুলেটরে A রাখ।
ADD: B	B কে অ্যাকিউমুলেটরের সংখ্যার সাথে যোগ করে যোগফল অ্যাকিউমুলেটর রাখ।
STA : C	অ্যাকিউমুলেটরের সংখ্যা C অবস্থানে রাখ।
OUT : C	ফলাফল C চলকের মাধ্যমে প্রদর্শন কর।
STP	থাম।

অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। এজন্য এ জাতীয় প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করতে হয়। এ রূপান্তরের কাজে বিশেষ প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। যে প্রোগ্রামের সাহায্যে অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলার বলে। নিম্নের চিত্রে অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম নির্বাহ প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

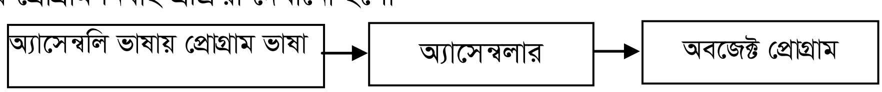

অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা–

১. অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা যান্ত্রিক ভাষার তুলনায় অনেক সহজ।
২. প্রোগ্রাম রচনা করতে কম সময় লাগে।
৩. প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ।
৪. মেশিনের ভাষার তুলনায় ডিবাগিং সহজতর।

অ্যাসেম্বলি ভাষার অসুবিধা–

১. প্রোগ্রাম রচনার সময় প্রোগ্রামারকে মেশিন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়।
২. এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
৩. এটি যন্ত্র নির্ভর ভাষা।
৪. অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।

৫.৫ মধ্যম স্তরের ভাষা (Mid-Level Language)

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিট পর্যায়ের প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে মধ্যম স্তরের ভাষা। এ ভাষায় উচ্চতর ভাষার সুবিধা পাওয়া যায় আবার নিম্ন স্তরের ভাষায়ও প্রোগ্রাম রচনা করা যায়। সি (C) এ স্তরের ভাষা।

৫.৬ তৃতীয় প্রজন্ম বা থার্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৬০)

উচ্চস্তরের বা হাই লেভেল (High Level) ভাষা

প্রোগ্রাম রচনার জন্য সহজে বোধগম্য সার্বজনীন ভাষাকে উচ্চস্তরের ভাষা বলা হয়। উচ্চস্তরের ভাষায় আমাদের পরিচিত বাক্য, বর্ণ ও সংখ্যা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। উচ্চস্তরের ভাষা অনেকটা ইংরেজি ভাষার মতো। এ ভাষায় খুব দ্রুত এবং সহজে প্রোগ্রাম লেখা যায়। উচ্চস্তরের ভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো লিখিত প্রোগ্রাম যেকোনো কম্পিউটারের ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ এ ভাষা যন্ত্র বা মেশিন নির্ভর নয়। মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রধান অসুবিধা হলো যে, এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য রচিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া লো-লেভেল ভাষায় (মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষা) প্রোগ্রাম লিখা কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য কাজ। কম্পিউটারের পক্ষে লো-লেভেল ভাষা বোঝা সম্ভব হলেও মানুষের পক্ষে লো-লেভেল ভাষা বোঝা সহজসাধ্য নয়। এ অসুবিধা থেকে অব্যাহতির প্রচেষ্টার ফলে উচ্চতর ভাষার উদ্ভব হয়। এ স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা সম্ভব। অর্থাৎ এ প্রোগ্রাম কম্পিউটার সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে, ফলে এসব ভাষাকে উচ্চতর ভাষা বলা হয়। উচ্চস্তরের ভাষা মানুষের ভাষার (যেমন-ইংরেজি ভাষা) সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চস্তরের ভাষার মধ্যে প্রধান হলো C,C++, VISUAL BASIC, JAVA, ORACLE, ALGOL, FORTRAN ইত্যাদি।

প্রয়োগের ভিত্তিতে উচ্চস্তরের ভাষাকে সাধারণত নিম্নলিখিত দুভাগে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ কাজের ভাষা (General Purpose Language)

২. বিশেষ কাজের ভাষা (Special Purpose Language)

যেসব ভাষা সব ধরনের কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয় তা সাধারণ কাজের ভাষা নামে পরিচিত। যেমন- BASIC, PASCAL, C ইত্যাদি। আর যেসব ভাষা বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয় তা বিশেষ কাজের ভাষা নামে পরিচিত। যেমন- COBOL, ALGOL, FORTRAN ইত্যাদি।

উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা–

১. উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যেকোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।

২. লো লেভেল ভাষার চেয়ে হাই লেভেল ভাষা শেখা বেশি সহজ।

৩. প্রোগ্রাম রচনা সহজ ও যুক্তিনির্ভর।

৪. হাই লেভেল ভাষায় স্বাভাবিক ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহার করা যায়।

৫. প্রোগ্রাম লেখার সময় কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন নেই।

৬. এ ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম সহজে পরিবর্তন বা ভুল সংশোধন করা যায়।

উচ্চস্তরের ভাষার অসুবিধা–

১. উচ্চস্তরের ভাষার প্রোগ্রাম সরাসরি কম্পিউটার বুঝতে পারে না।

২. এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটারে চালাতে হলে অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।

৩. প্রোগ্রাম রান করতে অধিক মেমরির প্রয়োজন হয়।

৪. প্রোগ্রাম রান করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

উচ্চস্তরের ভাষার ব্যবহার–

১. বৃহৎ ডেটা প্রসেসিং এর কাজে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম তৈরি করতে।

২. যেসব ক্ষেত্রে প্রচুর মেমরির প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রের সফটওয়্যার তৈরির কাজে।

৩. জটিল গাণিতিক হিসাব- নিকাসে সফটওয়্যার তৈরির কাজে।

৪. এ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরির কাজে।

৫. বিভিন্ন ধরনের অটোমেটিক প্রসেস কন্ট্রোলের কাজে।

উচ্চস্তরের ভাষার পরিচিতি

Description of High Level Language

সি (C):

সি নামটা এসেছে মার্টিন রিচার্ডস (Martin Richards) এর উদ্ভাবিত বিসিপিএল (BCPL-Basic Combined Programming Language) ভাষা থেকে যা প্রাথমিকভাবে ক্যামব্রিজ ইউনির্ভাসিটি রিসার্স অরিয়েন্টেড কাজে ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরির ডেনিস রিচি ১৯৭০ সালে এ ভাষার উদ্ভাবন করেন। ভাষাটির নাম ‘C’ রাখা হয়েছে কারণ, B নামের অপর একটি ভাষা আগেই তৈরি হয়েছে। মিড লেভেল বা মাধ্যম স্তর ভাষা হিসাবে সি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সি দিয়ে উচ্চস্তরের ভাষায় সুবিধা পাওয়া যায়। সি দিয়ে সহজে উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তরের ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। সি কে স্ট্রাকচার্ড বা প্রোসিডিউর অরিয়েন্টেড ভাষা বলা হয়। কারণ সি’তে মূল সমস্যাকে কতকগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের জন্য আলাদাভাবে ভেরিয়েবল, স্ট্রাকচার, ফাংশন ইত্যাদি বর্ণনা করা যায় এবং প্রয়োজনে if, while, for, goto ইত্যাদি কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়, কিংবা কোনো ফাংশন বা স্ট্রাকচার পুনঃব্যবহার করা যায়। C ভাষাকে কম্পিউটার ভাষার জনক বলা হয়ে থাকে। এ ভাষারও অনেক সংস্করণ রয়েছে। যেমন-C, C++, ANSI C, Visual C, Turbo C প্রভৃতি। বর্তমান কালের অধিকাংশ প্যাকেজ প্রোগ্রামই এ ভাষার মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে। যেকোনো সফ্‌টওয়্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।

এক বা একাধিক ফাংশন নিয়ে সি প্রোগ্রাম গঠিত। তবে সি প্রোগ্রামে main () নামের একটি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন অবশ্যই থাকতে হয়। main () ফাংশন অন্যান্য লাইব্রেরি এবং ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন কল করে। কম্পাইল এবং নির্বাহের সময় সি প্রোগ্রাম main () ফাংশন থেকে শুরু করে।

সি++ (C++)

সি ++ একটি বহুল ব্যবহৃত অবজেক্ট অরিয়েন্টড প্রোগ্রাম ভাষা। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এটি এন্ড টি বেল ল্যাবরেটরিতে জর্ন স্ট্রাউসট্রপ (Bjarne Stroustrop) সিমুলা ৬৭ এর ক্লাস এবং সি প্রোগ্রামিং পদ্ধতির সমন্বয়ে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি নতুন ভাষা উদ্ভাবন করেন। তিনি এ ভাষায় নাম দেন 'সি উইথ ক্লাস'। পরবর্তীতে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে ১৯৮৩ সালে এর নামকরণ করা হয় সি++। সি++ যেমন সি এর প্রোসিডিউর প্রোগ্রামিং এর সুবিধা প্রদান করে তেমনি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পদ্ধতি অনুমোদন করে। এজন্য সি++ কে হাইব্রিড প্রোগ্রাম ভাষা বলে।

সি++ এর নামের সাথে সি এর ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর (++) যুক্ত, তাই সাধারণভাবে সি++ কে সি এর বর্ধিত সংস্করণ বলা হয়। আবার সি++ কে সি এর সুপারসেট বলা হয়। কারণ সি এর প্রায় সব বৈশিষ্ট্য সি++ এ বিদ্যমান।

সি প্রোগ্রামের মতো প্রতিটি সি++ প্রোগ্রাম এক বা একাধিক ফাংশনের সমষ্টির এবং প্রতিটি সি++ প্রোগ্রামে main () নামে একটি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন অবশ্যই থাকে। যেকোনো সি++ প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় তা main () থেকেই শুরু হয়। main () ফাংশন অন্যান্য লাইব্রেরি এবং ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহার করে।

ভিজুয়্যাল বেসিক

বিশ্ববিখ্যাত মাইক্রোসফ্ট কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত GUI (Graphical User Interface) পরিবেশের জন্য তৈরি বেসিক ল্যাংগুয়েজের আধুনিক সংস্করণ হলো ভিজুয়্যাল বেসিক। সহজ ল্যাংগুয়েজ, অসাধারণ ডিবাগিং সুবিধা এবং একটিভ এক্স লাইব্রেরি ব্যবহারের অন্যান্য সুযোগ ভিজুয়্যাল বেসিককে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল খ্যাতি এনে দিয়েছে। উইন্ডোজ প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ হিসাবে এটি বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। প্রথম থেকে কয়েকটি ভার্সন অতিক্রম করে ভিজুয়্যাল বেসিক 4, 5 এরপর এসেছে ভিজুয়্যাল বেসিক 6। ভিজুয়্যাল বেসিক 5 এর তিনটি এডিশন রয়েছে:

i. Learning Edition ii. Professional Edition iii. Enterprise Edition.

ভিজুয়্যাল বেসিক শিখার জন্য যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন। যেমন- প্রজেক্ট (Project), ফর্ম (Form) মডিউল (Module), অবজেক্ট (Object), প্রোপার্টিজ (Properties) মেডথ (Method) ও ইভেন্ট (Event)।

জাভা (Java)

১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সান মাইক্রোসিস্টেম কোম্পানিতে (Sun Microsystem) একদল বিশেষজ্ঞের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রচলিত প্রোগ্রাম ভাষাগুলো ডিঙ্গিয়ে নতুন চমক নিয়ে আসে জাভা প্রোগ্রাম ভাষা। বর্তমান ইন্টারনেট ও ই-মেইলের যুগে নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম ভাষা হিসেবে জাভা ভাষার বিকল্প নেই।

রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সান মাইক্রোসিস্টেম ১৯৯০ সালে একটি প্রোগ্রাম ভাষা উদ্ভাবনের পরিকল্পনা নেয়। সে লক্ষ্যে গ্রিন প্রজেক্ট (Green Project) নামে একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় জেমস গসলিং (James Gosling) এর নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞের প্রেট্রিক নিউটন (Petric Naughton), ক্রিস ওয়ার্দ (Chris Warth), এডওয়ার্ড ফ্রাঙ্ক (Ed. Frank) ও মাইক শেরিডান (Mike Sheridan) প্রমুখ দীর্ঘ ১৮ মাসের সম্মিতিল গবেষণার ফলে ১৯৯১ সালের শেষ দিকে ওক (Oak) নামে একটি নতুন প্রোগ্রাম ভাষা উদ্ভাবিত হয়। গ্রিন প্রজেক্টের প্রধান জেমস গসলিং এর জানালার ধারে একটি ওক গাছ ছিল বলেই হয়তো এর এরূপ নামকরণ করা হয়।

তবে সেই সময় ওক নামে আরও একটি প্রোগ্রাম ভাষা চালু থাকায় পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে দিকে এর নাম পরিবর্তন করে জাভা রাখা হয়। পরবর্তীতে জাভা উন্নয়নে অনেকেই অনেক অবদান রাখেন। তবে গ্রিন প্রজেক্টের প্রধান জেমস গসলিংকে জাভার জনক বলা হয়।

জাভা ভাষায় সি এবং সি ++ এর বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যাবলি বাদ দিয়ে নতুন অনেক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটান হয়, ফলে জাভা সত্যিকার অর্থে একটি সহজ-সাবলীল, বিশ্বস্ত ও সুসহনীয় প্রোগ্রাম ভাষায় পরিণত হয়। জাভা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্লাটফর্ম অনির্ভরশীলতা।

ওরাকল (Oracle)

ওরাকল কর্পোরেশন বর্তমানে একটি সর্ববৃহৎ ডেটাবেইজ কোম্পানি। আর ওরাকল কোম্পানির ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম ওরাকল একটি সর্বাধিক শক্তিশালী ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ওরাকল এ কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট যেখানে রিলেশনাল ডেটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সাপোর্ট করে। ওরাকল কর্পোরেশন প্রথম কোম্পানি যারা বাণিজ্যিকভাবে একটি রিয়েল রিলেশনাল ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম বাজারে ছেড়েছে। ওরাকল সিস্টেম ডেটাবেইজ কারনেলের সঙ্গে কানেক্ট করতে নন-প্রসিডিউরাল এসকিউএল বা স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করছে। ওরাকল বর্তমানে বিশ্বে নেটওয়ার্ক বেসড ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম হিসেবে ওরাকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ওরাকলের প্রাশসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। তাছাড়া এর সিকিউরিটি সিস্টেম খুবই শক্তিশালী। বর্তমানে ওরাকল ডেটাবেইজ ডেভেলপারগণের নিকট একটি আদর্শ ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম হিসেবে বিবেচিত।

ওরাকল একটি RDBMS বা রিলেশনাল ডেটাবেইজ প্রোগ্রাম। বিশ্বে রিলেশনাল ডেটাবেইজ এখন স্ট্যান্ডাড হয়ে দাঁড়িয়েছে। RDBMS ডেটাবেইজ প্রোগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ড. ই.এফ.কড RDBMS ১২টি Rule তৈরি করেছেন তার সুদীর্ঘ গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে। এখন পর্যন্ত ওরাকল ডেটাবেইজ প্রোগ্রামে RDBMS এর সর্বাধিক রুলস্ প্রয়োগ করা যায়। RDBMS এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ডেটাবেইজের সকল ডেটাসমষ্টি একে অপরের সহিত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

অ্যালগল (ALGOL)

ALGOL শব্দের অর্থ হচ্ছে ALGOrithmic Language। ১৯৫৮ সালে সার্বজনীন ভাষা হিসেবে সব কম্পিউটারে ব্যবহার যোগ্যভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলিক সমস্যা সমাধানের জন্য এ ভাষার উদ্ভব হয়। ইউরোপের বাইরে এর জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত ভাষাসমূহে এ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ফরট্রান (Fortran)

FORTRAN শব্দের অর্থ হচ্ছে Formula Translation. ১৯৫৭ সালে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ক্ষেত্রসমূহ ফর্মূলার গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য আইবিএম কোম্পানি কর্তৃক এ উচ্চস্তরের ভাষার উদ্ভাবন হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এ ভাষার বেশ কয়টি সংস্করণ বের করা হয়। যেমন- FORTRAN II, FORTRAN IV, FORTRAN 77 ইত্যাদি।

পাইথন (Python) : পাইথন একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, ইন্টারেক্টিভ, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এবং উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা। পাইথন একটি প্রোগ্রামিং ভাষা যা সমস্যা সমাধানের জন্য একজন প্রোগ্রামারের ব্যবহৃত টুল। পাইথন সহজ এবং স্বজ্ঞাত শক্তিশালী ভাষা। পাইথনকে প্রায়ই TCL, পার্ল, রুবি, প্রকল্প বা জাভার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ (i) খুব পরিস্কার, পাঠযোগ্য সিনট্যাক্স। (ii) শক্তিশালী অন্তদর্শন ক্ষমতা। (ii) স্বজ্ঞাত বস্তুর স্থিতিবিন্যাস।

পাইথন যেসমস্ত প্রধান অপারেটিং সিস্টেমে পাওয়া যায় সেগুলো হলো উইন্ডোজ, লিনাক্স/ইউনিক্স, অপারেটিং সিস্টেম/২। এছাড়াও নেট ও জাভা ভার্চুয়াল মেশিনেও পাইথন আছে।

৫.৭ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4th Generation Language)

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাকে (Fourth Generation Language) সংক্ষেপে 4GL বলা হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রজন্মের ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা হচ্ছে SQL, NOMAD, RPG III, FOCUS, Intelect ইত্যাদি কয়েকটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা। চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা মানুষের ভাষার মতো। এধরনের ভাষা উচ্চস্তরের ভাষার চেয়েও বোধগম্য এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য। সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে কম্পিউটারের ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে সহজ করার উদ্দেশ্যে এধরনের ভাষা তৈরি করা হয়েছে।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটি ভাষাকে 4GL বলা হয়। যেমন–

- ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ
- অতি উচ্চস্তরের ভাষা
- অ্যাকটরাল ভাষা
- ব্যবহার বা প্রয়োগভিত্তিক ভাষা

4GL এর বৈশিষ্ট্য–

১. এ ভাষায় লিখিত কোনো প্রোগ্রাম বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি কম্পিউটারে একই সাথে কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।
২. এ ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তারিত প্রক্রিয়াকরণের বর্ণনা দিতে হয় না।
৩. এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার পর পুরোটা কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না। একটি কমান্ড লেখার সাথে সাথেই কম্পাইল হয়ে যায়।
৪. এ ভাষা ব্যবহার করে ডেটাবেসের প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটা সংরক্ষণ, কুয়েরি, রিপোর্ট ইত্যাদি কাজ করা যায়।
৫. কথোপকথন রীতিতে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ডেটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।

৫.৮ অনুবাদক প্রোগ্রাম (Translator Software)

কম্পিউটারের আদি ভাষা হলো 0 ও 1। কম্পিউটার বাইনারি সংকেত 0 ও 1 ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না। আমরা যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষাতেই প্রোগ্রাম রচনা করি না কেন; মেশিনের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হলে অবশ্যই তাকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করতে হবে। উচ্চস্তরের এবং অ্যাসেম্বলি ভাষায় রচিত প্রোগ্রামকে উৎস প্রোগ্রাম বলে। উচ্চস্তরের ভাষা ব্যতিত অন্য যেকোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে বলে অবজেক্ট (Object) প্রোগ্রাম বলে। অনুবাদক সফটওয়্যার হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা এক প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখিত সোর্স প্রোগ্রামকে (Source Program) অন্য প্রোগ্রামিং ভাষার অবজেক্ট প্রোগ্রাম (Object Program) রূপান্তর করে। অন্যভাবে বলা যায়, যে

প্রোগ্রাম উৎস প্রোগ্রাম কে মেশিনের ভাষা বা যন্ত্রের ভাষায় অনুবাদ করে (বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে) সে প্রোগ্রামকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। যেমন- কিউবেসিকে একটি প্রোগ্রাম লেখা হলো কিন্তু কম্পিউটার এ প্রোগ্রামটি বুঝবে না, এ প্রোগ্রামটিকে অনুবাদ করে মেশিনের ভাষায় (বাইনারিতে) বুঝিয়ে দিতে হয়। এ অনুবাদের কাজে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার একমাত্র মেশিন ভাষা বুঝতে পারে বলে অন্য ভাষায় লেখা উৎস প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ না করে নিলে তা কার্যকর করতে পারে না।

অনুবাদক প্রোগ্রাম তিন প্রকার–

১. কম্পাইলার (Compiler)
২. ইন্টারপ্রিটার (Interpreter)
৩. অ্যাসেম্বলার (Assembler)

৫.৮.১ কম্পাইলার (Compiler)

উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করার প্রোগ্রামকে কম্পাইলার বলে। কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে। কম্পাইলার সহায়ক মেমরিতে থাকে। প্রয়োজনের সময় তাদের র‌্যামে আনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন হাই লেভেল ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার লাগে। কোনো নির্দিষ্ট কম্পাইলার একটি মাত্র হাই লেভেল ভাষাকে মেশিন ভাষায় পরিণত করতে পারে। যেমন- যে কম্পাইলার বেসিককে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করতে পারে তা কিন্তু কোবলকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করতে পারে না। কম্পাইলার পুরো উৎস প্রোগ্রামের উপর একসাথে কাজ করে। এ কারণে কম্পাইলার চালনার জন্য বেশি পরিমাণ মেমরির প্রয়োজন পড়ে।
সাধারণত উচ্চস্তরের ভাষার একটি স্টেটমেন্ট যন্ত্রভাষার চার পাঁচটি নির্দেশে পরিণত হয়। কম্পাইলার অনুবাদ করা ছাড়াও উৎস প্রোগ্রামের গুণাগুণ বিচার করতে পারে।

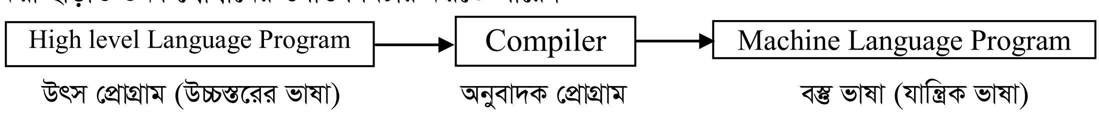

চিত্র: কম্পাইলারের কাজের ধারা।

কাজ– ১. উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
২. প্রোগ্রামকে লিংক করা।
৩. প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রধান মেমরিতে প্রয়োজনীয় স্মৃতি অবস্থানের ব্যবস্থা করা।
৫. প্রয়োজনে বস্তু বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বের করা।

কম্পাইলারের সুবিধা–

১. কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে ফলে প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি দ্রুত হয়।
২. প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় লাগে।
৩. কম্পাইলারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয়।
৪. একবার প্রোগ্রাম কম্পাইল করা হলে পরবর্তিতে আর কম্পাইলের প্রয়োজন হয় না।
৫. প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা মনিটরে একসাথে প্রদর্শন করে।

কম্পাইলারের অসুবিধা–

১. কম্পাইলার প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে ফলে প্রোগ্রাম সংশোধনে বেশি সময় লাগে।
২. কম্পাইলার বড় ধরনের প্রোগ্রাম হওয়ায় এটি সংরক্ষণে মেমরিতে বেশি জায়গা লাগে।
৩. প্রোগ্রাম ডিবাগিং ও টেস্টিং এর কাজ ধীরগতি সম্পন্ন।

৫.৮.২ ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা কোনো প্রোগ্রামকে সরাসরি নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয় ইন্টারপ্রেটার। ইন্টারপ্রেটারের কাজ হলো হাই লেবেল ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা। ইন্টারপ্রেটার উৎস প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন পড়ে এবং মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে। একটি লাইন নির্বাহ শেষ হলে ইন্টারপ্রেটার উৎস প্রোগ্রামের পরবর্তী লাইনে যায়। এটি ব্যবহারে প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করা বা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ হয়। ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রাম আকারে ছোট বলে এর ব্যবহারে মেমরি অবস্থানে জায়গা বাঁচে। তাছাড়া ছোট কম্পিউটারে সাধারণত ইন্টারপ্রিটার ব্যবহৃত হয়।

নিচের চিত্রে ইন্টারপ্রেটারের কাজ দেখানো হলো–

কাজ– ১. হাই লেভেল ভাষাকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করা।

২. এটি এক লাইন পড়ে ও অনুবাদ করে।

৩. এটি প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে অনুবাদ কাজ বন্ধ করে দেয়।

৪. ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করে।

ইন্টারপ্রেটারের সুবিধা–

১. এটি ব্যবহারে প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করা এবং পরিবর্তন করা সহজ হয়।

২. Interpreter Program আকারে ছোট হয় এবং মেমরি স্থানে কম জায়গা দখল করে।

৩. এটি সাধারণত ছোট কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়।

৪. ইন্টারপ্রেটার খুব বন্ধুভাবাপন্ন (User Friendly)।

ইন্টারপ্রেটারের অসুবিধা–

১. ইন্টারপ্রেটার ব্যবহারে প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে কম্পাইলারের তুলনায় বেশি সময় লাগে।

২. এর মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না।

৩. প্রতিটি কাজের পূর্বে অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়।

৫.৮.৩ অ্যাসেম্বলার (Assembler)

অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করার জন্য যে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলার বলে। নিচের চিত্রে অ্যাসেম্বলারের কাজ দেখানো হলো:

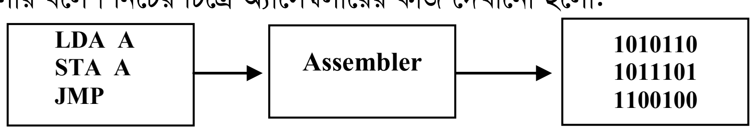

উৎস প্রোগ্রাম (অ্যাসেম্বলি ভাষা) অনুবাদক প্রোগ্রাম বস্তু ভাষা (যান্ত্রিক ভাষা)

চিত্র: অ্যাসেম্বলারের কাজের ধারা।

কাজ: ১. নেমোনিক কোডকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে।

২. অ্যাসেম্বলি অ্যাড্রেসকে মেশিন ভাষায় লেখা অ্যাড্রেস পরিণত করে।

৩. প্রত্যেক নির্দেশ ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা, ঠিক না থাকলে ঠিক করা।

৪. সব নির্দেশ ও ডেটা প্রধান মেমরিতে রাখে।

কাজ: কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৫.৯ প্রোগ্রামের সংগঠন (Program Structure)

প্রোগ্রামের সংগঠন বলতে প্রোগ্রামের গঠন শৈলীকে বোঝায়। প্রত্যেক প্রোগ্রামেরই প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। যথা: ইনপুট, প্রসেসিং এবং আউটপুট। প্রোগ্রামের গঠনকে নিম্নোক্ত ছক আকারে উপস্থাপন করা যায়:

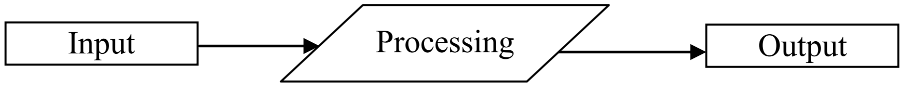

ইনপুট: ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে যেসব ডেটা ও ইনফরমেশন বা তথ্য কম্পিউটারে দেয়া হয় সেগুলোই হলো ইনপুট।
প্রসেসিং: প্রসেসিং হলো প্রোগ্রামে দেয়া নির্দেশ অনুসারে প্রদেয় তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করা।
আউটপুট: আউটপুট বলতে প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলকে বোঝায়।
নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে একটি প্রোগ্রামের তিনটি অংশ দেখানো হলো:

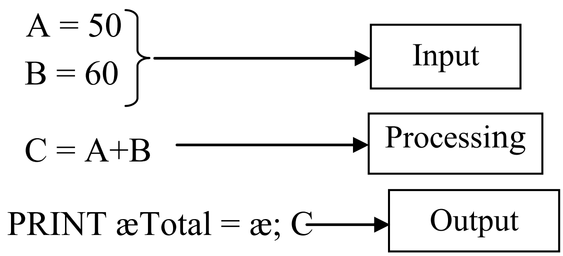

৫.১০ কম্পিউটারের সাহায্যে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনার ধাপসমূহ–

প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ (Steps of a program): কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে একটি পরিকল্পনা করা হয় এবং পরিকল্পনাটিকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা কম্পিউটারে প্রোগ্রাম নির্বাহ করে সমস্যার সমাধান করি। প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ পাশে চিত্রের সাহায্যে দেখান হলো–

১. সমস্যা সনাক্তকরণ/নির্দিষ্টকরণ (Problem identification)

কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রথমে সমস্যাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। কী সমস্যার জন্য আমরা সমাধান তৈরি করছি সে সম্পর্কিত ধারণা আমাদের ভালো সমাধান তৈরি করতে সাহায্য করে।

২. সমস্যা বিশ্লেষণ (Problem Analysis):

সমস্যা নির্দিষ্টকরণের পর তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে হবে এবং কী ইনপুটের জন্য আমরা কী আউটপুট আশা করি, তা নির্দিষ্ট করতে হবে।

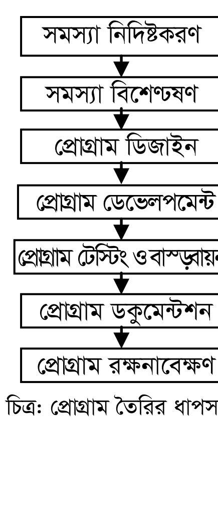

চিত্র: প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

এজন্য আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. সমস্যাটির কাঠামোগত বর্ণনা প্রস্তুতকরণ।
২. গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ।
৩. ইনপুট সনাক্তকরণ।
৪. আউটপুট সনাক্তকরণ।
৫. প্রয়োজনীয় মেমরি নির্ধারণ।

৩. প্রোগ্রাম ডিজাইন (Program design)

সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে। সমস্যাটি আদৌ সমাধানযোগ্য কিনা তা দেখতে হবে। সমস্যাটিকে সঠিকভাবে ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করার পর তার বিভিন্ন অংশের সমাধান করতে হবে, সামগ্রিক সমাধানও চিন্তা করতে হবে, সম্ভাব্য সমাধানগুলোর মান বিচার করতে হবে সাধারণভাবে ব্যবহাকারী কী ধরনের সমাধান প্রত্যাশা করে, তাও বিবেচনা করতে হবে।

প্রোগ্রাম ডিজাইনের উল্লেখ্যযোগ্য অংশ হলো–

১. ইনপুট ডিজাইন (Input design)
২. আউটপুট ডিজাইন (Output design)
৩. ইনপুট ও আউটপুটের সম্পর্ক ডিজাইন (design of relationship between input and output)

সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহকে আমরা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারি। সমাধানের ধাপসমূহকে বোধগম্যভাবে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। এ ধাপসমূহকে চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করাকে বলে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র।

৪. প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (Program development)

সমাধানের ধাপসমূহ (অ্যালগরিদম বা ফ্লোচার্ট) কে প্রোগ্রামিং ভাষায় রূপান্তর করাকে বলে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট। প্রোগ্রামার তার পছন্দ অনুযায়ী কোনো ভাষায় (সি. সি + +, জাভা) রূপান্তর করে। তবে সফটওয়্যার রচনায় সাধারণত অন্যান্য চলকের উপর নির্ভর করে ভাষা নির্ধারণ করা হয়। প্রোগ্রাম রচনাকে সাধারণভাবে কোডিং (Coding) বলে।

৫. প্রোগ্রাম পরীক্ষণ ও বাস্তবায়ন (Program Testing & Development)

কোনো প্রোগ্রামকে কম্পিউটারে টাইপ করার পর প্রোগ্রাম চালিয়ে পরীক্ষা এবং পরবর্তীতে ভুলসমূহ নির্ধারণ করে সংশোধন করতে হয়। কম্পিউটারের স্মৃতিতে এ প্রোগ্রামকে টাইপ করার পর একে বলা হয় উৎস প্রোগ্রাম (Source program)। এ উৎস প্রোগ্রাম যেকোনো প্রকার অনুবাদক ব্যবহার করে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। এ প্রোগ্রামকে বলে "বস্তু প্রোগ্রাম" (Object Program)।

প্রোগ্রাম সবসময় কিছু না কিছু ভুল থাকে। প্রোগ্রামের ভুলকে বলা হয় বাগ (Bug) বা পোকা। আর এ বাগ বা প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটিসমূহ খুঁজে বের করে সংশোধন করাকে ডিবাগিং বলা হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে প্রোগ্রাম পরীক্ষণ ও সংশোধন করা যায়। যথা:

ক. প্রোগ্রাম টেস্টিং (Program Testing)

প্রোগ্রামে ডেটার কিছু বিশেষ মান বসিয়ে কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া নিজেরা গণনা করে ফলাফল বের করতে হয়। এ পদ্ধতিকে Dry Run বলে। এবার কম্পিউটারে ডেটার এ বিশেষ মানগুলো ইনপুট করে প্রোগ্রাম চালিয়ে দেখা হয়, কম্পিউটারের ফলাফল গণনার ফল ভুল হলে বোঝা যায় সে অংশে ভুল আছে। সেই অংশ তখন ভালো করে পরীক্ষা করতে হয়।

খ. প্রোগ্রামের ভুল (Program Bugs)

প্রোগ্রাম তৈরির সময় প্রোগ্রামে কিছু না কিছু ভুল থেকে যায়। প্রোগ্রামের ভুলকে বলে বাগ (Bugs)। ভুল যাতে না থাকে তার জন্য সতর্কভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয়। এজন্য লক্ষ্য রাখতে হয় প্রোগ্রামে যেন জটিল লজিক গঠন না থাকে এবং ট্রান্সফার অব কন্ট্রোল নির্দেশ কম থাকে।

প্রোগ্রামের ভুলকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। যথা:

১. চিহ্নাদির ভুল বা সিনট্যাক্স ভুল (Syntax Error)
২. লজিকেল বা যুক্তিগত ভুল (Logical Error)
৩. ডেটা বা তথ্য ভুল (Data Error) ।

সিনট্যাক্স ভুল (Syntax Error)

প্রোগ্রামের মধ্যে ভাষার ব্যাকরণগত যেসব ভুল থাকে তাকে বলা হয় সিনট্যাক্স ভুল। যেমন- বানান ভুল; কমা, ব্র্যাকেট ঠিকমতো না দেয়া; কোনো চলের মান না জানানো প্রভৃতি। এসব ভুল সংশোধন করা খুবই সহজ, কারণ সিনট্যাক্স ভুলের বেলায় কম্পিউটার একটি ভুলের বার্তা ছাপায়। প্রোগ্রাম রান করালে কম্পিউটারের ভুলের বার্তার মাধ্যমে কোনো লাইনে কি ধরনের সিনট্যাক্স ভুল আছে তা জানাবে। যেমন- প্রোগ্রামে Print কমান্ডের পরিবর্তে Priont লিখা।

লজিকেল বা যুক্তিগত ভুল (Logical Error)

প্রোগ্রামে যুক্তির ভুল থাকলে তাকে বলে লজিকেল ভুল। সাধারণত সমস্যা ঠিকমতো না বোঝার জন্যই এ ভুল হয়। যেমন- $A < B$ এর স্থলে $A > B$ বা $P = A+B$ এর স্থানে $P = A - B$ লিখলে লজিকেল ভুল হয়। সিনট্যাক্স ভুলের ক্ষেত্রে গণনা সম্ভব না হওয়ায় কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু লজিকেল ভুলের ক্ষেত্রে একটি উত্তর পাওয়া যায় যদিও তা ভুল। কম্পিউটার কোনো ভুলের বার্তা পাঠায় না বলে লজিকেল ভুল সংশোধন করা খুব কঠিন। যেমন–শূন্য দিয়ে ভাগ করা কিংবা ঋণ সংখ্যার বর্গমূল বা লগারিদম বের করা।

ডেটা বা তথ্য ভুল (Data Error)

কম্পিউটারকে ভুল তথ্য জানালে তা হলো তথ্য ভুল। এক্ষেত্রেও কম্পিউটার কোনো ভুলের বার্তা ছাপায় না।

৬. ডকুমেন্টশন (Documentation)

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টের সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। এ লিপিবদ্ধ করাকে প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন বলে। প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণে ডকুমেন্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। ডকুমেন্টেশনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়–

ক. প্রোগ্রামের বর্ণনা
খ. ফ্লোচার্ট
গ. লিখিত প্রোগ্রাম
ঘ. নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের তালিকা
ঙ. পরীক্ষণ ও ফলাফল।

৭. প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ (Program maintenance)

প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যবহারকারী বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। আবার ব্যবহারকারীর চাহিদারও পরিবর্তন হতে পারে। কোনো কোনো বিষয়ে প্রোগ্রাম উন্নয়নেরও প্রয়োজন হতে পারে, তাই প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় যেন ব্যবহারকারীর যেকোনো চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত পরিকল্পনা না থাকলে বড় কোনো সফটওয়্যার বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারে না। অনেক সময় প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণে অন্যসব ধাপের চেয়ে বেশি খরচ হয়। তাই, গুরুত্বের সাথে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৫.১০.১ অ্যালগরিদম (Algorithm)

কোনো কাজ করার পূর্বে আমরা কাজটির পরিকল্পনা করে থাকি। পরিকল্পনামাফিক কাজে অগ্রসর হলে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অ্যালগরিদম অর্থ ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান। অর্থাৎ একটি সমস্যাকে কয়েকটি ধাপে ভেঙ্গে প্রত্যেকটি ধাপ পরপর সমাধান করে সমগ্র সমস্যার সমাধান করা। অ্যালগরিদম শব্দটি আরব দেশের গণিতবিদ আল খারিজমী এর নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তাঁর গণিত বইতে অ্যালগরিদম শব্দটির ব্যাখ্যা দেন নিম্নরূপে: অ্যালগরিদম হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করার জন্য একটা বিশেষ পন্থা।"

অন্যভাবে বলা যায় যে, 'কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যাটিকে ছোট ছোট ধাপে বিভক্ত করে যুক্তিসম্মতভাবে পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করাকে অ্যালগরিদম বলে। অর্থাৎ অ্যালগরিদম হচ্ছে প্রোগ্রাম রচনা ও নির্বাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা। কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানে প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে অ্যালগরিদমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যালগরিদম তৈরির শর্ত বা নিয়ম–

১. অ্যালগরিদমটি সহজবোধ্য হবে।
২. প্রত্যেকটি ধাপ স্পষ্ট হতে হবে যাতে সহজে বুঝা যায়।
৩. সসীম সংখ্যক ধাপে সমস্যার সমাধান হতে হবে।
৪. অ্যালগরিদম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী হতে হবে।

অ্যালগরিদমের সুবিধা–

১. সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে বোঝা যায়।
২. সহজে প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় করা যায়।
৩. প্রোগ্রামের প্রবাহের দিক বুঝা যায়।
৪. জটিল প্রোগ্রাম সহজে রচনা করা যায়।
৫. প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে।

উদাহরণ-১: তিনটি সংখ্যার যোগফল ও গড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম নিম্নে দেয়া হলো–

ধাপ–১: কাজ শুরু কর।
ধাপ–২: সংখ্যা ৩টি পড়।
ধাপ–৩: সংখ্যা ৩টির যোগফল বের কর।
ধাপ–৪: যোগফলকে ৩ দ্বারা ভাগ করে গড় নির্ণয় কর।
ধাপ–৫: যোগফল এবং গড় ছাপাও।
ধাপ–৬: কাজ শেষ কর।

৫.১০.২ ফ্লোচার্ট (Flowchart) বা প্রবাহ চিত্র

ফ্লোচার্ট (Flow Chart) বা প্রবাহ চিত্র হচ্ছে সিদ্ধান্তক্রম বা অ্যালগরিদমমের চিত্ররূপ। ফ্লোচার্ট হলো এমন কতকগুলো ছবি যা থেকে বোঝা যায় সমস্যা সমাধান করতে হলে পরপর কিভাবে অগ্রসর হতে হবে। একে ফ্লোচার্ট বলার কারণ এ থেকে প্রোগ্রামের প্রবাহ কিভাবে হচ্ছে তা বুঝা যায়। সিদ্ধান্তক্রম বা অ্যালগরিদমের ধাপগুলো চিত্র আকারে তুলে ধরাই হচ্ছে প্রবাহচিত্রের কাজ। ফ্লোচার্টের মাধ্যমে কোনো সিস্টেম বা প্রোগ্রামের কাজ বা তার গতিরোধক উপস্থাপন করা। ভিন্ন আকৃতির কতকগুলো জ্যামিতিক চিত্র ব্যবহার করে ফ্লোচার্ট অঙ্কন করতে হয়। ফ্লোচার্ট প্রোগ্রামের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্যে করে। ফ্লোচার্টের উপর নির্ভর করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। ফ্লোচার্ট কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা উচিৎ নয়।

ফ্লোচার্টের বৈশিষ্ট্য:

একটি উন্নতমানের ফ্লোচার্টে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে–

১. সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

২. প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে।

৩. প্রোগ্রাম রচনায় সহায়তা করে।

৪. প্রোগ্রাম পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনে সহায়তা করে।

৫. সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লেখা যায়।

ফ্লোচার্ট তৈরি করার নিয়মাবলি (Rules of drawing flowchart):

১. ফ্লোচার্ট তৈরি করার জন্য প্রচলিত প্রতীক ব্যবহার করা উচিৎ।

২. তীর চিহ্ন দিয়ে উপর থেকে নিচে বা বাম থেকে ডান দিকে প্রবাহ দেখানো উচিৎ।

৩. ফ্লোচার্ট তৈরি করার সময় সংযোগ চিহ্ন যতো কম হয় ততোই ভালো।

৪. ফ্লোচার্ট সহজে বোধগম্য হওয়া উচিৎ।

৫. ফ্লোচার্ট নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা উচিৎ নয়।

৬. চিহ্নগুলো ছোট বড় হলে ক্ষতি নাই তবে আকৃতি ঠিক থাকতে হবে।

৭. প্রয়োজনে চিহ্নের সাথে মন্তব্য দিতে হবে।

৮. একাধিক প্রবাহরেখা পরস্পর ছেদ করলেও তাদের মধ্যে কোনো লজিক্যাল সম্পর্ক বুঝায় না।

৯. ফ্লোচার্টের কোনো অংশের বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজন হলে সে অংশের জন্য পৃথকভাবে ফ্লোচার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. ফ্লোচার্ট যতদূর সম্ভব এক পৃষ্ঠায় আঁকা উচিত। একাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হলে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত নির্ধারিত চিহ্ন দিতে হবে।

ফ্লোচার্টের প্রকারভেদ:

ফ্লোচার্টকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. সিস্টেম ফ্লোচার্ট এবং

২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট।

১. **সিস্টেম ফ্লোচার্ট:** সিস্টেম ফ্লোচার্টে উপাত্ত গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, স্মৃতিতে সংরক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের প্রবাহ দেখানো হয়। অর্থাৎ যে ফ্লোচার্টের মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থার সংগঠনকে সহজে তুলে ধরা যায় তাকে সিস্টেম ফ্লোচার্ট বলে।

প্রতীক	অর্থ	প্রতীক	অর্থ	প্রতীক	অর্থ
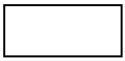	প্রক্রিয়াকরণ		ম্যানুয়েল ইনপুট	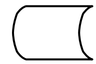	অন-লাইপ স্মৃতি
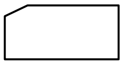	পাঞ্চকার্ড	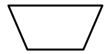	ম্যানুয়েল কাজ	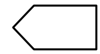	প্রদর্শন
	ডকুমেন্ট		কী অপারেশন	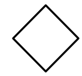	সটিং বা সাজান
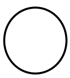	চৌম্বক টেপ	← → ↓ ↑	প্রবাহের দিক	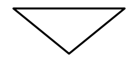	মার্জ বা একত্রিকরণ
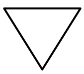	অফ-লাইন স্মৃতি	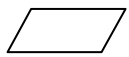	গ্রহণ/ নির্গমন	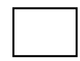	সহায়ক ক্রিয়া
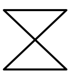	কোলেট বা সংযুক্তি	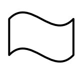	পাঞ্চ টেপ		যোগাযোগ মাধ্যম

চিত্র: সিস্টেম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত প্রতীক।

২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট:

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধাপের বিস্তারিত বিবরণ চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। এছাড়া প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় ও সংশোধনের জন্য এ ফ্লোচার্ট ব্যবহার করা হয়। প্রবাহ চিত্রে অনেক রকম প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত চিহ্নগুলো নিচে দেয়া হলো:

প্রতীক	অর্থ	প্রতীক	অর্থ
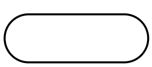	Start/End	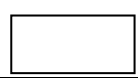	Process
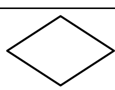	Decision		Predefined process
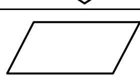	Input/Output	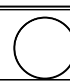	Connector
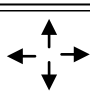	Direction of flow	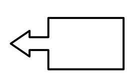	Sort note

ফ্লোচার্টের মৌলিক গঠন

১. সরল অনুক্রম (Simple sequence)
২. নির্বাচন (Selection)
৩. লুপ বা চক্র (Repetition or loop)
৪. জাম্প (Jump)

১. সরল অনুক্রম (Simple sequnce)

এটি একটি সরল স্ট্রাকচার। এ স্ট্রাকচারে সকল নির্দেশ নির্বাহের অনুক্রমে সাজানো থাকে।

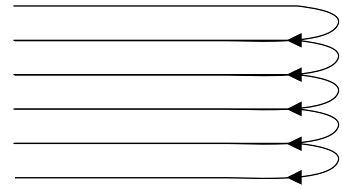

চিত্র: সরল অনুক্রম

২. নির্বাচন (Selection)

যেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় বা তুলনা করে কার্য নির্বাহ করতে হয় সেক্ষেত্রে এ স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়।

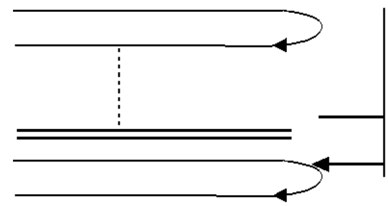

চিত্র: নির্বাচন

৩. লুপ বা চক্র (Repetition or loop)

প্রোগ্রামে একই ধরনের কাজ বারবার করার প্রয়োজন হলে লুপ বা চক্র ব্যবহার করা হয়।

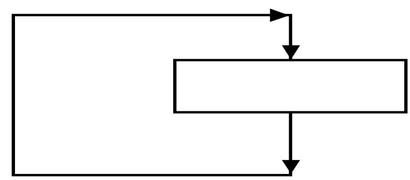

চিত্র: লুপ বা চক্র (Loop)

৪. জাম্প (Jump)

প্রোগ্রামে সরল অনুক্রমকে ভঙ্গ করে প্রোগ্রামের মধ্যে এক লাইন থেকে পরবর্তী লাইনে না গিয়ে উপরে বা নিচে অন্য কোনো লাইন থেকে কাজ শুরু করলে তাকে জাম্প বলে।

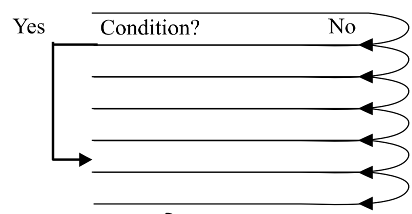

চিত্র: জাম্প (Jump)

কাজ: অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উদাহরণ-১: তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

অ্যালগরিদম:

ধাপ–১: শুরু কর।

ধাপ-২: সংখ্যা তিনটি a, b, c এর মাধ্যমে পড়।

ধাপ-৩: a এর মান b থেকে বড় হলে ধাপ-৬ এ যাও অন্যথায় পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৪: b এর মান c থেকে বড় হলে ধাপ-৯ এ যাও অন্যথায় পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৫: ধাপ-৭ এ যাও।

ধাপ-৬: a এর মান c থেকে বড় হলে ধাপ-১১ এ যাও অন্যথায় পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৭: বড় সংখ্যা c ছাপাও।

ধাপ-৮: ধাপ-১২ এ যাও।

ধাপ-৯: বড় সংখ্যা b ছাপাও।

ধাপ-১০: ধাপ-১২ এ যাও।

ধাপ-১১: বড় সংখ্যা a ছাপাও।

ধাপ-১২: শেষ কর।

ফ্লোচার্ট:

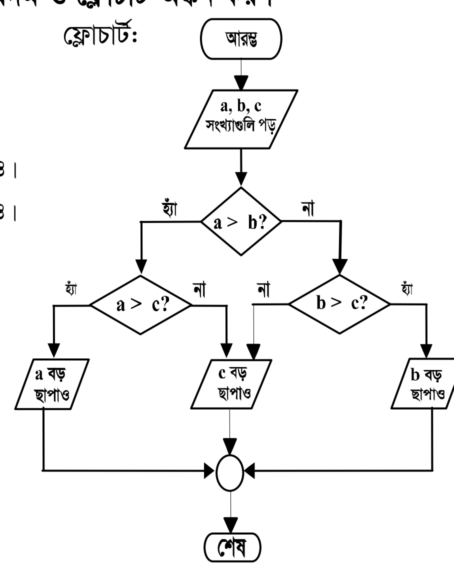

উদাহরণ-২: ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রূপান্তরের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু কর।

ধাপ-২: ফারেনহাইট স্কেলে (F) তাপমাত্রার মান গ্রহণ কর।

ধাপ-৩: সেলসিয়াস স্কেলে C = (F–32) * 5/9

ধাপ-৪: সেলসিয়াস স্কেলে C প্রদর্শন কর।

ধাপ-৫: শেষ কর।

ফ্লোচার্ট:

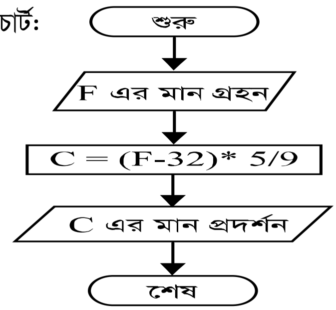

উদাহরণ-৩: ১ + ২ + ৩ + ----- + N সিরিজের যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু কর।

ধাপ-২: ইনপুট হিসেবে N-এর মান গ্রহণ কর।

ধাপ-৩: ধরি S = 0 এবং I = 1

ধাপ-৪: ধরি S = S + I

ধাপ-৫: ধরি I = I + 1

ধাপ-৬: তুলনা: I এর মান কি N এর চেয়ে বড়?

ক. যদি বড় না হয় তবে ৪ নম্বর ধাপে যাও।

খ. যদি বড় হয় তবে ৭ নম্বর ধাপে যাও।

ধাপ-৭: নির্ণেয় ফলাফল S চলকের মাধ্যমে প্রদর্শন কর।

ধাপ-৮: শেষ কর।

ফ্লোচার্ট:

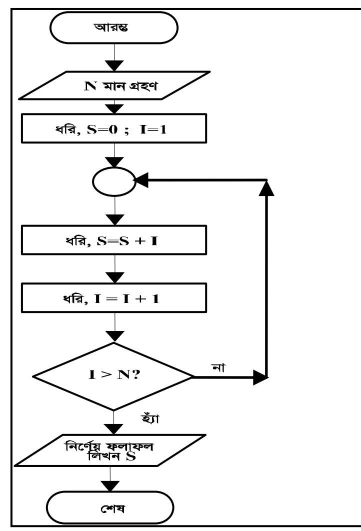

উদাহরণ-৪: দুটি সংখ্যার গ. সা. গু নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১ : শুরু কর।

ধাপ-২ : দুটি সংখ্যা নির্ধারণ কর, একটি বড় অন্যটি ছোট।

ধাপ-৩ : ছোট সংখ্যাটি দিয়ে বড়টিকে ভাগ করে ভাগশেষ নির্ণয় কর।

ধাপ-৪ : ভাগশেষ যদি ০ হয় তবে ৫ নং ধাপে যাও অন্যথায় ৩নং ধাপে যাও।

ধাপ-৫ : গ. সা. গু নির্ণয় কর।

ধাপ-৬ : ফলাফল ছাপাও।

ধাপ-৭ : শেষ কর।

ফ্লোচার্ট:

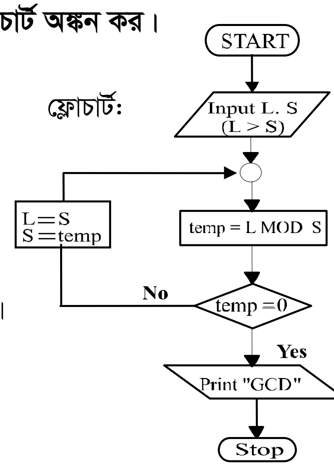

উদাহরণ-৫: একটি ধনাত্মক সংখ্যার ফ্যাকটোরিয়াল নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১ : শুরু কর।

ধাপ-২ : N এর মান পড়।

ধাপ-৩ : F=1 ; i=1

ধাপ-৪ : F = F * i
i = i + 1

ধাপ-৫ : যদি i < = N, তবে ৪নং ধাপে যাও।

ধাপ-৬ : F এর মান ছাপাও।

ধাপ-৭ : শেষ কর।

ফ্লোচার্ট:

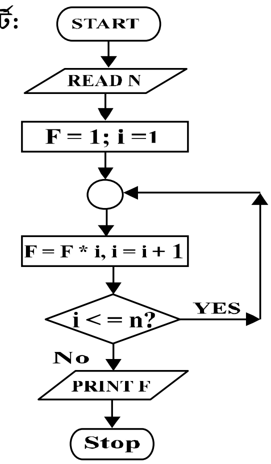

কাজ: অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৫.১১ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল (Program Design Model)

প্রোগ্রামের মডেল বলতে প্রোগ্রামের গঠনশৈলীকে বুঝায়। সুন্দরভাবে প্রোগ্রাম লেখা ও সহজে বুঝার জন্য প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি মডেল ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট একটি বিশেষ মডেল ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করলে তা সহজে অনুধাবন করা যায়।

বর্তমানে বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামিং মডেল হচ্ছে–

১. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং
২. ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামি
৩. অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং
৪. ইভেন্ট ড্রিভেন প্রোগ্রামিং।

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structure Programming)

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং হলো একটি প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে লেখা। স্টেটমেন্টের সংখ্যা এক এক শ্রেণির জন্য এক এক রকম হতে পারে। এর প্রত্যেকটি শ্রেণি স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। একটা পদ্ধতিগত পন্থায় প্রোগ্রাম রচনা করলে তাকে স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং বলে।

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রাম নিম্নবর্ণিত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়। যথা–

১. কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (Control Structure)
২. মডুলার প্রোগ্রামিং (Modular Programming)
৩. টপ-ডাউন পদ্ধতি (Top-down approach in program design)

কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (Control structure): স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এ তিন ধরনের কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়।

ক. পর্যায়ক্রমিক গঠন (Sequential Structure)
খ. আবর্ত গঠন (Loop Structure)
গ. সিদ্ধান্তমূলক গঠন (Decision Structure)

মডুলার প্রোগ্রামিং (Modular programming)

দীর্ঘ এবং জটিল প্রোগ্রাম, প্রোগ্রামারের পক্ষে রচনা, পরীক্ষা ও ভুল নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। সুতরাং দীর্ঘ ও জটিল প্রোগ্রামকে ছোট ছোট প্রোগ্রামে বিভক্ত করা হয়। এ ছোট প্রোগ্রামকে মডিউল বলে। একটা মডিউল নিজেই একটা প্রোগ্রাম যাকে পৃথকভাবে আবার সাব মডিউলে বিভক্ত করা হয়। মডিউলে বিভক্ত করে প্রোগ্রাম লেখার পদ্ধতিকে মডুলার প্রোগ্রামিং বলা হয়।

টপ-ডাউন পদ্ধতি (Top-down approach in program design)

টপ-ডাউন পদ্ধতিতে সমস্ত প্রোগ্রামটিকে একটা প্রোগ্রাম ধরা হয় এবং পরবর্তীতে কম জটিল, ছোট এবং সহজে অনুধাবনযোগ্য হয় এমনিভাবে উপ-বিভক্ত করা হয় ফলে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা সহজ হয়। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য:

১. এটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।
২. এটি ডিবাগিং করা সহজ ।
৩. সহজে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।
৪. এটি সহজে রচনা করা যায়।

অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming)

অবজেক্ট বা চিত্রভিত্তিক কমান্ডের সাহায্যে চালিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বলা হয়। এটি আসলে ভিজুয়্যাল প্রোগ্রামিং এর চালনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র এককে পরিণত হয়ে নিজস্ব পরিচয় লাভ করে।

অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য–

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে চলে:

১. এনক্যাপসুলেশন এবং ডেটা হাইডিং (Encapsulation and data hiding)
২. ইনহেরিটেন্স এবং পুনঃব্যবহার (Inheritance & Reuse)
৩. পলিমরফিজম (Polymorphism)

এনক্যাপসুলেশন এবং ডেটা হাইডিং: একটা স্বতন্ত্র এককের বৈশিষ্ট্যকে এনক্যাপসুলেশন বলে এবং এই বৈশিষ্ট্য গোপন রাখাকে ডেটা হাইডিং বলে।

ইনহেরিটেন্স এবং পুনঃব্যবহার (Inheritance and Reuse)

ইনহেরিটেন্স এবং পুনঃব্যবহার হলো একটা existing বস্তুর ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে নতুন আরেকটি বস্তুর সৃষ্টি করা।

পলিমরফিজম (Polymorphism): পলি অর্থ অনেক এবং মরফহ (MORPH) অর্থ ফর্ম। অর্থাৎ একই নামকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলে তাকে পলিমরফিজম বলে।

উদাহরণ: – C++, J ++ ইত্যাদি অবজেক্ট অরিয়েন্টড প্রোগ্রামিং এর উদাহরণ।

ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming)

চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিংগুলো হলো ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং অর্থাৎ যে প্রোগ্রামিং এর বিভিন্ন নির্দেশ বা ইন্সট্রাকশন চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয় তাকে ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং বলে। কী বোর্ডের কোনো Key Press করা কোনো বিশেষ কন্ট্রোলের উপর মাউস এর পয়েন্টার ক্লিক করা ইত্যাদি কাজ হলো ইভেন্ট। ব্যবহাকারী যখন কোনো কমান্ড বাটন এর উপর ক্লিক করেন তখন সেই নির্দেশটি কার্যকর হয়।

যেমন–ব্যবহাকারী যদি কম্পাইল (Compile) এ ক্লিক করে তবে প্রোগ্রামটি কম্পাইল হবে। এক্ষেত্রে কমান্ড বাটন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল এবং ক্লিক করা হচ্ছে ইভেন্ট। ভিজুয়্যাল প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে এ প্রোগ্রামিং ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

ভিজুয়্যাল প্রোগ্রামিং (Visual Programming)

উইন্ডোজ ভিত্তিক প্রোগ্রামটি ভিজুয়্যাল বা দৃশ্যমান প্রোগ্রামিং বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রোগ্রামের কমান্ড বা নির্দেশ মেনু বা চিত্রের সাহায্যে দেওয়া হয়, এজন্য এটা ব্যবহারকারীর নিকট খুবই জনপ্রিয়। প্রোগ্রামিং সম্পর্ক নূন্যতম ধারণা থাকলেই প্রোগ্রাম রচনা করা যায়। এ প্রোগ্রামের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক কম ইন্স্ট্রাকশন বা স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা যায়। যেমন ভিজুয়্যাল বেসিক প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী (Control Button) কন্ট্রোল বাটন ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করে থাকে। ভিজুয়্যাল প্রোগ্রামের উদাহরণ: ভিজুয়্যাল বেসিক, ভিজুয়্যাল সি/সি++, ভিজুয়্যাল ফক্সপ্রো ইত্যাদি।

আদর্শ প্রোগ্রামের গুণাবলি

আদর্শ প্রোগ্রাম বলতে যে প্রোগ্রামে কম্পিউটার প্রোগ্রামের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি বর্তমান সে ধরনের প্রোগ্রামকে বুঝায়। সাধারণত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। একটি আদর্শ প্রোগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি আদর্শ প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে ৭টি ধাপে রচনা কার্য সমাপ্ত করতে হয়। ধাপগুলো এ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। এ ৭টি ধাপে প্রোগ্রাম রচনা করলে রচনাকার্যে ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া একটি আদর্শ প্রোগ্রামের সাধারণত ৫টি পর্ব থাকে।

১. পরিচয় পর্ব
২. বর্ণনা
৩. ইনপুট
৪. প্রসেস
৫. আউটপুট

১. পরিচয় পর্ব: এ পর্বে প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু, প্রোগ্রামারের নাম, প্রোগ্রামের সময়কাল, প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন চলকের বর্ণনা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে।

২. বর্ণনা : এ পর্বে প্রোগ্রামের সমস্যার বর্ণনা, সমাধানের কৌশল, সিদ্ধান্ত, যুক্তি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

৩. ইনপুট: একটি আদর্শ প্রোগ্রামের ভেতরে তথ্য ইনপুটের সুবিধা থাকবে অথবা প্রোগ্রাম চলাকালে বাইরে থেকে তথ্য যোগানের সুবিধা থাকবে।

৪. প্রসেস: তথ্য প্রক্রিয়াকরণই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। অতএব, একটি আদর্শ প্রোগ্রামে অবশ্যই তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা থাকবে।

৫. আউটপুট: যেকোনো প্রোগ্রামের জন্য ফলাফল অবশ্যই বাঞ্চনীয়। একটি আদর্শ প্রোগ্রামে ফলাফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকবে।

৬. প্রোগ্রামটি নির্ভুল, যুক্তিপূর্ণ বিন্যাস, সরল ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

৭. সহজে প্রোগ্রামটির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও ভুল সংশোধন করা যাবে।

৫.১২ সি ভাষার প্রাথমিক ধারণা (Primary Concept of C Language)

১৯৭০ সালে আমেরিকার Bell Telephone Laboratory তে ডেনিস রিচি (Dennis Ritchie) ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সি প্রোগ্রামিং ভাষা উদ্ভাবন করেন। তিনি সর্বপ্রথম DEC PDP-11 মেশিনে Unix Operating System এ C ভাষা প্রয়োগ করেন। সি হচ্ছে একটি উচ্চতর প্রোগ্রামিং ভাষা। একে হাই-লেভেল স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ভাষাও বলা হয়ে থাকে। ১৯৬০ সালে মারটিন রিচার্ড (Martin Richard) BCPL (Basic Combined Programming Language) নামে একটি প্রোগ্রামিং ভাষা ডেভলপ করেন যা মূলত প্রাথমিকভাবে ইউরোপে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে BCPL থেকে B নামক অপর একটি প্রোগ্রামিং ভাষা উদ্ভাবন হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে ডেনিস রিচির লেখা 'দ্যা সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ' বইটি প্রকাশের পর এবং মাইক্রোকম্পিউটারের জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে সি এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সে সময়ে সি এর জনপ্রিয়তা প্রধান কারণ ছিল এক কম্পিউটারে লেখা প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে ব্যবহারের সুবিধা।

চিত্র: ডেনিস রিচি

সি ভাষাকে কম্পিউটার ভাষার জনক বলা হয়ে থাকে। সি ভাষার অনেক সংস্করণ রয়েছে। যেমন- C, C++, ANSI C, Visual C ও Turbo C প্রভৃতি। C ভাষার সাহায্যে যে ধরনের প্রোগ্রাম লেখা যায় তাহলো–

Operating System	Computer Games
Assemblers	Utilities
Compilers	Network Drivers
Interpreters	Data Base Program
Editors	Virus and Antivirus ইত্যাদি।

অতি দ্রুত C ভাষা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ভার্সনে C ব্যবহার শুরু করে। এতে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৯৮৩ সালে ANSI (American National Standard Institute) C এর একটা আদর্শ মান নির্ধারণ করে যা ANSI-C নামে পরিচিতি লাভ করে। C/C ++ এর বিভিন্ন কম্পাইলারগুলোর মধ্যে Turbo C, Quick C, Borland C++ ইত্যাদি অন্যতম। C++ হচ্ছে এর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ভার্সন। প্রথম ভার্সন ১৯৮৫, ২য় ভার্সন ১৯৯০ এবং তৃতীয় ভার্সন ১৯৯৫ সালে Windows 95 ও Windows NT এর জন্য তৈরি হয়। প্রোগ্রামিং ভাষায় নূন্যতম কতকগুলো Library Function থাকে এবং তা (American National Standard Institute) নির্ধারণ করে দেয়। ডেটা গ্রহণ, ডেটা ব্যবহার এবং ডেটা প্রদর্শনের জন্য BASIC ও C এর Library Function এর তুলনা দেখানো হলো–

কাজ	C	BASIC
ডেটা গ্রহণ (INPUT)	getcher ( ) scanf ( ) gets ( ) sscanf () fscanf ()	INPUT READ DATA GET
ডেটা প্রক্রিয়াকরণ (PROCESSING)	if / else for while do-while	IF / ELSE FOR NEXT
ফলাফল প্রদর্শন (OUTPUT)	putchar ( ) puts ( ) printf ( ) fprinf ( )	PRINT LPRINT WRITE PRINT USING

৫.১২.১ সি ভাষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of C Language)

১. প্রতিটি C প্রোগ্রামের ভাষা শুরু হয় একটি ফাংশন main( ) এর মাধ্যমে। একটি প্রোগ্রামে একাধিক main () Function থাকবে না। প্রতিটি প্রোগ্রামের কাজ এ ফাংশন থেকে শুরু হবে।

২. ফাংশনের মধ্যে যেসব স্টেটমেন্ট থাকে সেগুলোকে দ্বিতীয় বন্ধনী { } এর মধ্যে রাখতে হবে। বন্ধনী শুরু করলে অবশ্যই শেষ করতে হবে।

৩. প্রতিটি স্টেটমেন্ট এর শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হবে।

৪. প্রতিটি চলক ব্যবহারের পূর্বে তাদের ডেটা টাইপ উল্লেখ করতে হবে।

৫. Header ফাইলগুলো # include দ্বারা যুক্ত করতে হবে।

৬. প্রোগ্রামের মধ্যে যে মন্তব্য দেয়া হবে তাকে অবশ্যই /* এবং */ এই চিহ্নের মধ্যে রাখতে হবে।

৭. C ল্যাংগুয়েজ পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইব্রেরি ফাংশন, ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ও কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের সুবিধা রয়েছে।

৮. C তে পর্যাপ্ত পরিমাণ কম্পাউন্ড অপারেটর, যেমনঃ + =, – =, *= ইত্যাদি রয়েছে।

৯. C ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা হয় ছোট হাতের অক্ষর দ্বারা তবে Symbolic name ও output string সাধারণত বড় হাতের অক্ষরে লেখা হয়।

১০. C ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। কারণ এটি যেকোনো হার্ডওয়্যারে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে।

৫.১২.২ প্রোগ্রাম কম্পাইলিং (Program Compiling)

কম্পাইলার হলো এমন একটি প্রোগ্রাম, যা কম্পিউটারের নিকট বোধগম্য করার জন্য উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলোকে মেশিন ভাষায় 0 এবং 1 এ পরিবর্তন করে। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পইলার ব্যবহৃত হয়। যেমন-যে কম্পাইলার সি প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে সেই কম্পাইলার বেসিক প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে না। উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রুপান্তরকে কম্পাইলিং বলে। সি-তে সোর্স প্রোগ্রাম তৈরির পর তা নির্বাহ করার জন্য প্রথমে তা কম্পাইল করতে হয়। একটি নির্দিষ্ট কাজ C প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা বা কোড করাকে সোর্স কোড (Source code) বলে। কম্পিউটার দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজটি করার জন্য প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করতে হয়। একেই অবজেক্ট (Object code) কোড বলে। কম্পাইলের নিয়ম মোতাবেক প্রোগ্রাম রচনা করলে কাজটি নিখুতভাবে করা যায়। এছাড়া প্রোগ্রাম কম্পাইলিং এর সময় প্রচুর ভুল দেখায়। প্রতিটি ভুল সংশোধনের পর প্রোগ্রাম নির্বাহ করা হলে নির্দেশ মোতাবেক ফলাফল পাওয়া যায়। C প্রোগ্রাম কম্পাইলার কর্তৃক পরিচালিত বিধায় প্রোগ্রামের সকল ভুল একবারে প্রদর্শন করে। এর ফলে প্রোগ্রাম নির্বাহের সময়ও কম লাগে। C তে প্রোগ্রাম লেখা ও নির্বাহ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার পাওয়া যায়। যেমন- Turbo C, ANSI C, Boarland C++, Dev C ইত্যাদি।

কম্পাইলিংয়ের প্রধান কাজ (Main functions of compiling)

১. সোর্স প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করা।
২. প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রুটিন (প্রোগ্রামের ছোট অংশ) কে লিংক করা।
৩. প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রোগ্রামের জন্য প্রধান মেমরিতে প্রয়োজনীয় মেমরি অবস্থান তৈরি করা।

৫. প্রোগ্রামের যেকোনো ভুল ত্রুটি সংশোধন করা।

C প্রোগ্রাম কম্পাইল করার ধাপসমূহ:

১. প্রথমে C প্রোগ্রামে প্রবেশ করার পর File মেনুতে Click করলে একটি কমান্ড লিস্ট দেখা যাবে।
২. New অপশনে Click করার পর একটি খালি স্ক্রীন দেখা যাবে।
৩. এখন যেকোনো একটি প্রোগ্রাম লিখে সংরক্ষণ করা হলে এ প্রোগ্রামকে Source Code বলে।
৪. প্রোগ্রাম লেখার পর মেনুবার থেকে Run-এ Click করতে হবে। অথবা কীবোর্ড থেকে Ctrl+F9 চাপতে হবে।
৫. প্রোগ্রাম কম্পাইল করার পর প্রোগ্রামে ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে হবে।
৬. Run-করার পর ভুল না থাকলে ফলাফল প্রদর্শন করবে।

৫.১২.৩ প্রোগ্রামের গঠন (Structure of a program)

প্রতিটি প্রোগ্রামের তিনটি অংশ থাকে এবং এ তিনটি অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র: প্রোগ্রামের সাধারণ গঠন।

ইনপুট: ইনপুট বলতে ফলাফল প্রাপ্তির জন্য যেসব ডেটা বা নির্দেশ কম্পিউটারে দেয়া হয় সেগুলোকে বুঝায়।

প্রসেসিং: প্রসেস হলো ইনপুট অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করা।

আউটপুট: আউটপুট বলতে প্রোগ্রামের ফলাফলকে বুঝায়।

C প্রোগ্রাম গঠন:

C প্রোগ্রাম এক বা একাধিক ফাংশনের সমন্বয়ে গঠিত। C প্রোগ্রাম লেখার জন্য প্রথমে এক বা একাধিক ফাংশন গঠন করতে হয়। তারপর ফাংশনগুলোকে একত্রিত করতে হয়। যার মধ্যে একটি কমন ফাংশন হচ্ছে main ( ) ফাংশন। main ( ) ফাংশনটি C প্রোগ্রামে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে। একটি C প্রোগ্রাম এক বা একাধিক সেকশন নিয়ে গঠিত।

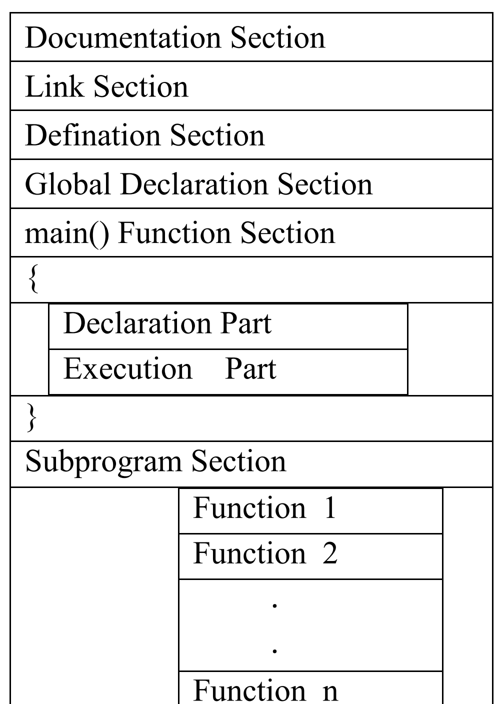

চিত্র: একটি C প্রোগ্রামের মৌলিক গঠন।

Documentation Section:
এটি সি প্রোগ্রামের ঐচ্ছিক অংশ। এ অংশে এক বা একাধিক মন্তব্য, প্রোগ্রামের নাম, প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু, প্রোগ্রাম রচয়িতার নাম, প্রোগ্রাম ব্যবহারের নিয়ম সংযুক্ত করা হয়।

Link Section:
এ অংশে কম্পাইলারের সাথে বিভিন্ন লাইব্রেরি ফাংশনের সংযোগ স্থাপন করা হয় অর্থাৎ হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হয়।

Defination Section:
এ অংশে প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় Symbolic constant কে # define করা হয়।

Global Declaration Section: এ অংশে একাধিক ফাংশন বা প্রোগ্রামের সবখানে ব্যবহৃত হয় এমন চলক বা ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়।

main() Function Section: একটি কমন ফাংশন হচ্ছে main () ফাংশন। main () ফাংশনটি C প্রোগ্রামে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে। main() Function এর দুটি অংশ রয়েছে। যথা:

১. **Declaration Part:** এ অংশে প্রয়োজনীয় চলক যা নির্বাহ অংশে ব্যবহার করা হবে তা ঘোষণা করতে হয়।
২. **Execution Part:** এ অংশে প্রোগ্রাম নির্বাহ করে। main () Function এ দুটি অংশ দুটি দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে রাখতে হয়।

Subprogram Section:

এ অংশে এক বা একাধিক ব্যবহারকারীর তৈরি ফাংশন থাকবে যা main() Function এ Call করা হবে। সাধারণত main() Function এর শেষে এসব ফাংশন থাকে, তবে এদরকে main() ফাংশনের আগেও লিখা যায়।

এখানে একটি সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে উপরের দেয়া C প্রোগ্রামের গঠন আলোচনা করা হলো।

উদাহরণ-১ : দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করে সংখ্যা দুটি সহ যোগফল প্রিন্ট করার জন্য প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int x, y, sum;
x = 15;
y = 10;
sum = x +y;
printf ("1st Number = %d\n",x);
printf ("2nd number = % d\n", y);
    printf(" summation = % d\n", sum);
    getch();
    }
```

ফলাফল:

```
1st Number = 15
2nd Number = 10
Summation = 25
```

প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ:

১. #include<stdio.h> প্রোগ্রামের ভিতরে printf () একটি লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে। এ ফাংশনটি stdio.h নামক হেডার ফাইলে রয়েছে। সি প্রোগ্রামে যেসব লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হয় সেগুলো যে হেডার ফাইলে রয়েছে প্রোগ্রামের শুরুতে সে হেডার ফাইলের নাম #include এর সাথে সংযুক্ত করতে পারে।
২. #include<conio.h> প্রোগ্রামে ভিতরে getch ( ) লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে। এ ফাংশনটি একটি conio.h নামক হেডার ফাইলে রয়েছে। তাই #include এর সাথে উক্ত হেডার ফাইলটির নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।
৩. main ( ) প্রোগ্রামের মূল ফাংশন। main ( ) থেকেই প্রোগ্রামের কার্যকারিতা শুরু হয়। প্রতিটি প্রোগ্রামে main () ফাংশন অবশ্যই থাকবে।

৪. { দ্বিতীয় ব্রাকেটটি main () ফাংশন লেখার পর এ ফাংশনটির কার্যক্রম শুরুবুঝানোর জন্য শুরুতে দ্বিতীয় ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়।

৫. int দিয়ে x, y, sum variable গুলোর ডেটা টাইপ integer ঘোষণা করা হয়েছে। integer অর্থ হচ্ছে পূর্ণসংখ্যা।

৬. printf( ) ফাংশনটি কম্পিউটারের পর্দায় কোনো কিছু প্রিন্ট বা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৭. %d হলো integer ডেটা টাইপের format specifications ।

৮. \n ফাঁকা লাইন প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৯. } ব্রাকেটটি ফাংশনের কার্যক্রম শেষ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৫.১২.৪ ডেটা টাইপ (Data Type)

কম্পিউটারে ইনপুট অংশের মাধ্যমে যেসব অঙ্ক, বর্ণ, চিহ্ন ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং যার উপর নির্ভর করে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় তাকে ডেটা বলে। যেমন- ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল তৈরির জন্য সংগৃহীত তাদের নাম, রোল নম্বর, বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হলো এক একটি ডেটা। সি প্রোগ্রাম মূলত কতকগুলো স্টেটমেন্ট এর সমন্বয়ে গঠিত। আর এ স্টেটমেন্ট তৈরির মূল উপাদান হলো বিভিন্ন ধরনের ডেটা, ধ্রুবক, চলক ইত্যাদি।

ডেটার ধরনকে ডেটা টাইপ বলা হয়। C প্রোগ্রামিং-এ বিভিন্ন প্রকার ডেটা নিয়ে কাজ করা হয়। প্রোগ্রাম চালনার সময় সকল ডেটা মেমরিতে সংরক্ষিত হয়। বিভিন্ন টাইপের ডেটা মেমরিতে ভিন্ন ভিন্ন বাইটের জায়গা দখল করে।

সি-ল্যাংগুয়েজে ডেটার শ্রেণি বিভাগ: সি প্রোগ্রামিং তার ডেটা টাইপের জন্য বেশ সমৃদ্ধ। সাধারণত ডেটা টাইপ মেশিনের উপর নির্ভরশীল। ANSI (American National Standard Institute) কর্তৃক নির্ধারিত সি ভাষায় ব্যবহৃত ডেটাসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. প্রাইমারি বা ফান্ডামেন্টাল ডেটা টাইপ (Primary or Fundamental data type)
২. ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ (User defined data type)
৩. ডিরাইভড ডেটা টাইপ (Derived data type)
৪. এমটি ডেটা টাইপ (Empty data type)

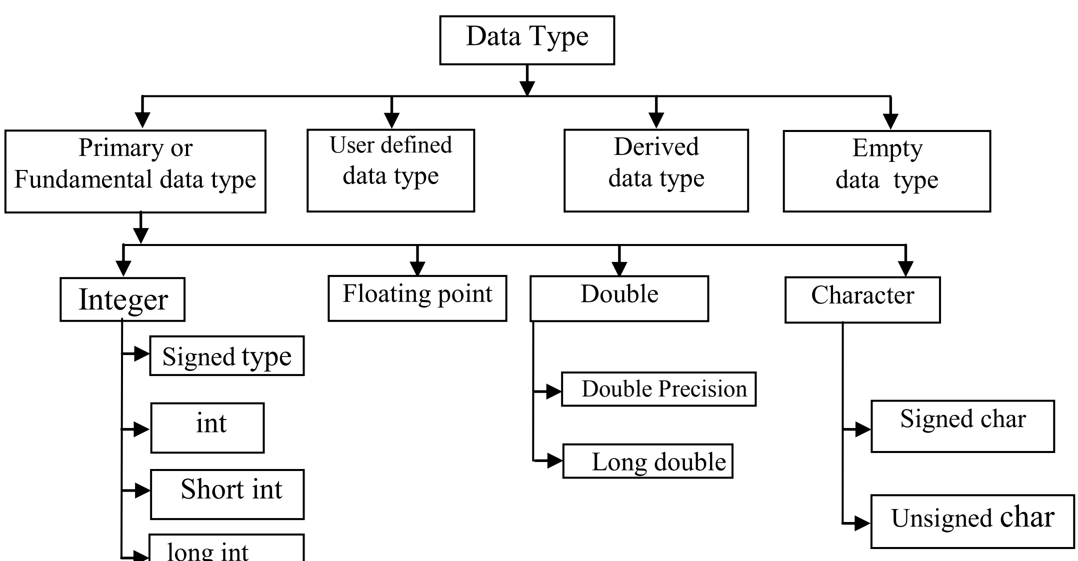

চিত্র: ডেটার প্রকারভেদ

১. প্রাইমারি বা ফান্ডামেন্টাল ডেটা টাইপ (Primary or Fundamental data type):
প্রাইমারি বা ফান্ডামেন্টাল ডেটা টাইপে সাধারণত পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ, ক্যারেক্টার বা স্পেশাল সিম্বল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ডেটা টাইপকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. ইন্টিজার (Integer) বা পূর্ণসংখ্যা
খ. ফ্লোটিং পয়েন্ট (Floating Point) বা ভগ্নাংশ
গ. ডাবল প্রিসিশন (Double Precision)
ঘ. ক্যারেক্টার (Character) বা অক্ষর

ক. ইন্টিজার (Integer) বা পূর্ণসংখ্যা : ইন্টিজার টাইপ ডেটা বলতে পূর্ণসংখ্যার ডেটাকে বুঝায়। এ ডেটার রেঞ্জ -২^{১৫} থেকে +২^{১৫}–১ পর্যন্ত। অর্থাৎ –৩২৭৬৮ থেকে +৩২৭৬৭ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ডেটার মান যদি –৩২৭৬৮ থেকে + ৩২৭৬৭ এর মধ্যে হয় তবে সেই ডেটাকে ইন্টিজার ডেটা বলা হয়। যেমন-১০,৫০,১০৫,২৭০ও ৫০০ ইত্যাদি। এ ডেটা অনেক সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- Short Integer, Long Integer, Unsigned Integer ইত্যাদি। মেমরিতে Integer ডেটা লেখার জন্য ২ বাইট জায়গা লাগে।

খ. ফ্লোটিং পয়েন্ট (Floating Point) বা ভগ্নাংশ: ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটা টাইপ বলতে দশমিকযুক্ত ডেটাকে বুঝানো হয়। এ ডেটার রেঞ্জ 3.4E-38 থেকে 3.4E+38 পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখানে Exponential Notation এ ‘E’ কে Exponent এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ‘E’ এর পর যে লেখা হয় (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) তা কয়বার সংখ্যাকে ১০ দিয়ে গুণ করে তা বুঝায়। যেমন–

$$2.3456E + 4 = 2.3456*10*10*10*10 = 23456$$
$$2.3456E - 4 = 2.3456*10^{-1}*10^{-1}*10^{-1}*10^{-1}$$
$$= 2.3456*10^{-4}$$
$$= 0.00023456$$

ফ্লোটিং ডেটা টাইপ অনেক সময় Double Floating Data Type আকারে ব্যবহার করা হয়। এদের সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে- Double Float। এধরনের ডেটা মেমরিতে ৪ বাইট বা ৩২ বিট জায়গা দখল করে।

গ. ডাবল প্রিসিশন (Double Precision): ডাবল প্রিসিশন ডেটাও হলো দশমিকযুক্ত ডেটা। তবে এটি ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূক্ষ্মতার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়। এর সূক্ষ্মতা ১৪ ডিজিট পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এ ডেটার রেঞ্জ 1.7E-308 থেকে 1.7E+308 পর্যন্ত হয়। এধরনের ডেটা মেমরিতে ৮ বাইট বা ৬৪ বিট জায়গা দখল করে।

ঘ. ক্যারেক্টার (Character) বা অক্ষর: এ ডেটা টাইপ অ্যালফাবেট অর্থাৎ (a–z, A–Z) অংক (0–9) বা বিশেষ কোনো চিহ্ন যেমন- (#,@,*) ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। সাইন ক্যারেক্টার বা আনসাইন ক্যারেক্টার এ দুধরনের ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা হয়ে থাকে। সাইন ক্যারেক্টার বা আনসাইন ক্যারেক্টার মেমরিতে ৮ বিট বা ১ বাইট জায়গা দখল করে। সাইন ক্যারেক্টারের রেঞ্জ সধারণত -2^7থেকে 2^7-1 পর্যন্ত। আনসাইন ক্যারেক্টারের রেঞ্জ 2^8 বা 256 পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২. **ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ (User Defined Data Type)**: C প্রোগ্রামিং এ ইচ্ছানুযায়ী ডেটা টাইপ তৈরি করা যায়। এদেরকে কাস্টম ডেটা টাইপ বা ইউজার ডিফাইন ডেটা টাইপ বলা হয়। এধরনের ডেটা টাইপ হিসেবে সাধারণত টাইপ ডেফিনেশন বা এবং ইনিউমেরিটেড বা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ডেটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রাকচার, ক্লাস, ইউনিয়ন ইত্যাদি।

৩. **ডিরাইভড ডেটা টাইপ (Derived Data Type)**: এ ডেটা টাইপ এর মধ্যে অ্যারে, ফাংশন, স্ট্রাকচার, পয়েন্টার ও রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত।

৪. **এমটি ডেটা টাইপ (Empty data type):** এমটি ডেটা টাইপ হিসেবে সাধারণত ভয়েড (Void), ভ্যালুলেস (Valueless) বা নাল (Null) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

C প্রোগ্রামে ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করার পদ্ধতি

Charactar ডেটা টাইপের গঠন:
char < variable name>;
char ch; (এখানে ch একটি variable)
char ch = `x' (variable assign করার নিয়ম)

Integer ডেটা টাইপের গঠন:
int < variable name>;
int number1;
short int number2;
long int number3:

Float ডেটা টাইপের গঠন:
float number1;
double number2;
long double number3;

C প্রোগ্রামে ডেটা টাইপের নাম, কী ওয়ার্ড, আকার ও রেঞ্জ:

ভেরিয়েবল টাইপ	কী ওয়ার্ড	সংরক্ষণের জন্য বিট সংখ্যা	ব্যাপ্তি
character	char	8	– 128 to 127 বা -2^7 থেকে 2^7-1
unsigned	unsigned char	8	0 to 255 বা 0 থেকে (2^8-1)
integer	int	16	– 32768 to 32767 বা -2^{15} থেকে $(2^{15}-1)$
short interger	short int	16	– 32768 to 32767
long integer	long int	32	– 214748348 to 2147483647 বা -2^{31} থেকে $(2^{31}-1)$
unsigned integer	unsigned int	16	0 to 65535 বা 0 থেকে $(2^{16}-1)$
unsigned short integer	unsigned short int	16	0 to 65535 বা 0 থেকে $(2^{16}-1)$
unsigned long integer	unsigned long int	32	0 to 4294467295 বা 0 থেকে $(2^{32}-1)$
float	float	32	3.4 E – 38 to 3.4 E + 38
double	double	64	1.7 E – 308 to 1.7 E + 308
long double	long double	80	3.4E – 4932 to 1.1E + 4932

ধ্রুবক (Constant):

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় C ভাষায় এমন কিছু মান আছে যা কোনো সময় পরিবর্তিত হয় না। যেমন π এর মান হলো $\frac{22}{7}$ বা 3.14285। কখনো এ π এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় যার মান অপরিবর্তীত থাকে তাকে ধ্রুবক বলে। প্রোগ্রামে কোনো স্থির বা অপরিবর্তনশীল মান ব্যবহার করার জন্য প্রোগ্রামে ধ্রুবক বা Constant হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

প্রোগ্রামে ধ্রুবক ব্যবহারের সুবিধা–

১. ধ্রুবক ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
২. প্রোগ্রামের কোড টাইপ করতে সময় লাগে।
৩. প্রোগ্রাম সহজবোধ্য হয়।

ধ্রুবক (Constant) চার প্রকার। যথা–

১. ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট (Integer Constant)
২. ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট (Floating Point Constant)
৩. অক্ষরমালা বা ক্যারেক্টার (Character Constant)
৪. স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট (String Constant)

১. **ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট (Integer Constant):** Integer Constant ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ ০-৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- ৫০, ১০০, ১০৫, ২০০, ৫০০ ইত্যাদি। C ভাষায় ব্যবহৃত ইন্টিজার কনস্ট্যান্টকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
ক) ডেসিমাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট, খ) অকট্যাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট, গ) হেক্সাডেসিমাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট

ক. **ডেসিমাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট:** ০ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলোর সমন্বয়ে ডেসিমাল ইন্টিজার গঠিত। ধনাত্নক বা ঋনাত্নক মান ডেসিমাল ইন্টিজারের অংশ। যেমন- ২০৫, + ৫০৫, –৭০ ইত্যাদি।

খ. **অকট্যাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট:** ০ থেকে ৭ পর্যন্ত অঙ্কগুলোর সমন্বয়ে অকট্যাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট গঠিত। এ ধরনের সংখ্যার পূর্বে ০ বসাতে হয়। যেমন- ০৫৪২, + ০১২৫, – ০২২৫ ইত্যাদি।

গ. **হেক্সাডেসিমাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট:** ০ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলো এবং A থেকে F বা a থেকে *f* পর্যন্ত আলফাবেটিকের সমন্বয়ে হেক্সাডেসিমাল ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট গঠিত। এধরনের সংখ্যার পূর্বে 0X বা 0x লিখতে হয়। যেমন- 0XBD57, 0xabc ইত্যাদি।

২. **ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট (Floating Point Constant):** Floating Point Constant অবশ্যাই ভগ্নাংশের সমন্বয়ে গঠিত। ০ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলোর সাহায্যে গঠিত দশমিকযুক্ত বা ভগ্নাংশ সংখ্যাগুলোই হলো ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট। যেমন- ০.১২৫, ০.২৭৫, ০.০০৯ ইত্যাদি।

৩. **অক্ষরমালা বা ক্যারেক্টার (Character Constant):** অক্ষরমালা বা ক্যারেক্টার ধ্রুবকগুলো ক্যারেক্টারের সমন্বয়ে গঠিত। এতে সাধারণত সিঙ্গেল কোটেশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- 'J' , `S' ইত্যাদি।

৪. **স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট (String Constant):** এক বা একাধিক ক্যারেক্টার যখন দ্বৈত বন্ধনীর (Double quotation) এর মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে তখন তাকে স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট বলে। যেমন- "Shuvodeep" "Joyshree" "Cambrian College" ইত্যাদি।

ভেরিয়েবল (Variable)

ভেরিয়েবল হলো মেমরি () লোকেশনের নাম বা ঠিকানা। প্রোগ্রামে ডেটা ব্যবহারের পূর্বে তা অবশ্যই মেমরিতে রাখা যায়। এক্ষেত্রে মেমরি অ্যাড্রেস সরাসরি ব্যবহার না করে একটি নাম দিয়ে ঐ নামের অধীনে ডেটা রাখা হয়। ঐ নামকেই ভেরিয়েবল বা চলক বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় যার মান পরিবর্তিত হয় তাকে ভেরিয়েবল বা চলক বলে। চলকের একটি নাম দিতে হয়। নামটি ৩১ অক্ষরের মধ্যে হতে হয়। নামের প্রথম অক্ষর অব্যশই বর্ণ হতে হয়। ইচ্ছামতো চলকের নাম দেয়া যায়। তবে সংগতিপূর্ণ নাম দেয়া ভালো।

যেমন–একজন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এ তিনটি বিষয়ের নম্বর প্রোগ্রামে ইনপুট আকারে দেয়ার জন্য তিনটি ভেরিয়েবল দরকার হবে। এক্ষেত্রে x, y ও z কে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশনঃ

প্রোগ্রামে ডেটা নিয়ে কাজ করার সময় প্রতিটি ডেটার জন্য একটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে হয়। আবার প্রতিটি ভেরিয়েবলের নামের পূর্বে তার ডেটা টাইপ উল্লেখ করতে হয়। ডেটা টাইপসহ কোনো ভেরিয়েবলের নামকরণ করার প্রক্রিয়াকে ভেরিয়েবল ঘোষণা বলা হয়। C তে ভেরিয়েবল ঘোষণা করার নিয়ম হলো–

data_type variable_name:
data_type variable_name = value; (value assign করার ক্ষেত্রে)

উদাহরণঃ

int x;
int x = 10; (value assign করার ক্ষেত্রে)

C তে কোনো ধরনের ডেটার জন্য কোনো ডেটা টাইপ করতে হয় তা নিম্নে দেখানো হলো–

character টাইপ ডেটা রাখার জন্য data_type অংশে char লিখতে হয়।
integer টাইপ ডেটা রাখার জন্য, data_type অংশে int লিখতে হয়।
float টাইপ ডেটা রাখার জন্য, data_type অংশে float লিখতে হয়।
double টাইপ ডেটা রাখার জন্য, data_type অংশে double লিখতে হয়।

মূলত কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় data_type অংশের মাধ্যমে কম্পাইলারকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট ভেরিয়েবল মেমরিতে কি ধরনের ডেটা রাখতে ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ভেরিয়েবলের জন্য মেমরিতে কত বাইট জায়গা নির্ধারিত হবে।

ভেরিয়েবল বা চলক লেখার নিয়মাবলি–

ভেরিয়েবল ঘোষণা, নামকরণ এবং তা ব্যবহারের জন্য কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

- ভেরিয়েবল নামকরণে কেবল আলফাবেটিক ক্যারেক্টার (a, ……, z, A, ……, Z), ডিজিট (০, 1, 2, …., 9), এবং আন্ডারস্কোর (_) ব্যবহার করা যায়। আন্ডারস্কোর ব্যতীত অন্য কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার (যেমন- !, @, #, $, %, *, +, – ইত্যাদি) ব্যবহার করা যায় না। যেমন-hsc _com, Mycomp বৈধ ভেরিয়েবল; কিন্তু hsc@com ও My&Comp অবৈধ।
- ভেরিয়েবল নামের মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান বা White space থাকতে পারে না। যেমন-MyNumber, Number1, My_Comp বৈধ ভেরিয়েবল। কিন্তু My Number, Number 1 ও My Comp অবৈধ।
- ভেরিয়েবল নাম ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে শুরু হতে পারে না। যেমন–Number1 ও Number_10 বৈধ ভেরিয়েবল; কিন্তু 1 Number ও 10_Number অবৈধ।
- সি প্রোগামে বড় হাতের এবং ছোট হাতের অক্ষরগুলো আলাদা অর্থ বহন করে। তাই MyNumber, Number1 ও Number_10 নামে ভেরিয়েবল ঘোষণা করে যথাক্রমে myNumber, number 1 ও Number_10 নামে ব্যবহার করা যায় না।

- কোনো কীওয়ার্ডের নাম ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না এবং main কোনো কীওয়ার্ড না হলেও ভেরিয়েবল নাম হিসেবে main ব্যহার করা যায় না। অবশ্য কী-ওয়ার্ডসমূহের নামের এক বা একাধিক বর্ণ বড় হাতের হরফে লিখে আইডেন্টিফায়ারের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে এরূপ না করাই উত্তম। যেমন-Int, Char, Main, MAIN ইত্যাদি বৈধ ভেরিয়েবল। কিন্তু int, private, main ইত্যাদি অবৈধ।
- ভেরিয়েবল নামকরণে যেকোনো সংখ্যক ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যায়। তবে ANSI নিয়ম অনুযায়ী দুটি ভেরিয়েবলের নামের পার্থক্য অবশ্যই প্রথম ৩১টি ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হবে। এজন্য ভেরিয়েবল নামকরণে ৩১টি ক্যারেক্টারের বেশি ব্যবহার না করাই ভালো।

ভেরিয়েবলের প্রকারভেদ: ডিক্লারেশনের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable) ও ২. গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable)

১. লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable): কোনো ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বা স্থানীয় চলক বলা হয়। ফাংশনের মধ্যে ঘোষণা করা চলক উক্ত ফাংশনের বাইরে ব্যবহার করা যায় না। লোকাল ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফাংশনেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে একই নামের লোকাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।

২. গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable): সকল ফাংশনের বাইরে প্রোগ্রামের শুরুতে ঘোষণাকৃত ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়। গ্লোবাল ভেরিয়েবল সাধারণত প্রোগ্রামের শুরুতেই ডিক্লেয়ার করা হয়। এধরনের ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড কোনো ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে একে গ্লোবাল বা সার্বজনীন ভেরিয়েবল বলে।

গ্লোবাল ভেরিয়েবল main() ফাংশনের পূর্বে ঘোষণা করতে হয় এবং গ্লোবাল ভেরিয়েবল int,char,float ইত্যাদি ডেটা টাইপ হতে পারে। সি প্রোগ্রামে ভেরিয়েবল কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে ভেরিয়েবলসমূহকে আরও কয়েকভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১. অটোমেটিক ভেরিয়েবল (Automatic Variable)
২. এক্সটারনাল ভেরিয়েবল (External Variable)
৩. স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল (Static Variabe)
৪. রেজিস্টার ভেরিয়েবল (Register Variable)

কাজ: ধ্রুবক ও চলক এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৫.১২.৫ C-এর অপারেটর (Operator)

সি ভাষায় গাণিতিক (Mathemetical) এবং যৌক্তিক (Logical) কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলো বিশেষ ক্যারেক্টার যেমন: +,-,*,/,++,--, ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এসব বিশেষ ক্যারেক্টারগুলোকে বলা হয় অপারেটর। এ অপারেটর যেসব ডেটার (যেমন-ইন্টিজার টাইপ ডেটা, ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটা ইত্যাদি) সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে তাদেরকে বল হয় অপারেন্ড। কোনো অপারেটরের সাথে অপারেন্ড ব্যবহার করে expression তৈরি করা হয়। যেমন- a + b – (a*b)/c হলো একটা expression। অর্থাৎ কতকগুলো অপারেন্ড ,অপারেটর এবং কনস্ট্যান্টের মিলিত ফল হলো এক্সপ্রেশন (Expression) বা রাশিমালা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, x = (a + b + c)/3 ; একটি এক্সপ্রেশন। এখানে, a, b, c হলো অপারেন্ড (Operand)

+ , = এবং / হলো অপারেটর এবং 3 হলো একটি কনস্ট্যান্ট।

যেসব অপারেটর একটি মাত্র অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে তাদেরকে unary operator বলে।

উদাহরণ: – x+y । এখানে – operator টি unary operator হলো।

যেসব অপারেটর দুটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে তাদেরকে binary operator বলে। binary operator গুলো দুটো অপারেন্ডের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(a + b) – x ; এখানে '+' অপারেটরটির a ও b দুটো অপারেন্ড এবং '-' অপারেটরটি দুটো অপারেন্ড (a + b) ও x কে নিয়ে কাজ করে। তাই এক্ষেত্রে '+' ও '-' binary operator।

সি ভাষায় অপারেটরকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operators)
২. রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operators)
৩. লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operators)
৪. অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operators)
৫. ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operators)
৬. কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operators)
৭. বিট ওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operators)
৮. স্পেশাল অপারেটর (Special Operators)

১. গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operators)

C প্রোগ্রামে বিভিন্ন রকম গাণিতিক কাজ (যেমন-যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি) করার জন্য যেসব প্রতীক বা অপারেটর ব্যবহৃত হয় সেসব অপারেটরকে Arithmetic Operator বলা হয়। C তে মূলত পাঁচটি Arithmetic Operator আছে। যেমন–

অপারেটর (Operator)	নাম (Name)	ব্যবহার (Uses)
+	plus	যোগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
-	minus	বিয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
/	division	ভাগ করে ভাগফল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
*	multiplier	গুণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%	modulas	ভাগশেষ বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

C তে সূচক এর কাজ করার জন্য কোনো অপারেটর নেই। তাই সূচকের কাজ প্রোগ্রামে নিচের মতো করে উপস্থাপন করতে হয়,

a^4 কে লিখতে হয় a*a*a*a;
$3a^3$ কে লিখতে হয় 3*a*a*a ;
$2(a+b)^2$ কে লিখতে হয় 2*(a+b) * (a+b) ;

তবে এধরনের কাজ করার জন্য C এর নিজস্ব কিছু function আছে।

C তে Arithmetic operator গুলো ব্যবহার করে উপরের মতো সাধারণ expression ছাড়াও জটিল expression তৈরি করা যায়। যেমন–

গাণিতিক এক্সপ্রেশন	সমতুল্য C এর এক্সপ্রেশন
$Y = a^2+2ab+b^2$	Y = a*a + 2*a*b + b*b
$Y = 2ab^2d/3c$	Y = (2*a*b*b*d)/(3*c)
$Y = 4m^2 + 6n +2$	Y = 4*m*m + 6 * n +2
$Y = \pi r^2 + 2\pi rh$	Y = 3.14 * r* r + 2*3.14 * r* h
$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	A = SQRT (s * (s–a) * (s–b) * (s–c))
$Z = ax^2 + bx + c$	Z = a*x*x+b*x+c
$y = \frac{3a^2 + 2b}{4}$	y = (3*a*a+2*b)/4
sinAB + cosAB	Sin(A*B) + cos(A*B)

নিম্নের এক্সপ্রেশনসমূহ ব্যাখ্যা কর।

i. a = + i

ii. + + i > ও i + +

সমাধান:

i. a = + অর্থ এর মান i এর সমান a = a + i

ii. + + i অর্থ i + i এর অনুরূপ। + + যদি Operator এর আগে থাকে তবে তাকে pre-increment or prefix বলে।

i++ অর্থ i = i + 1 অনুরূপ। ++ যদি Operator এর পরে থাকে তবে তাকে post-increment or postfix বলে।

রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operators)

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় দুটি চলকের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে রিলেশনাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে দুটো অপারেন্ডের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক প্রকাশ করতে যে অপারেটরসমূহ ব্যবহৃত হয় তাদেরকে Relational Operator বলা হয়।

এখানে সম্পর্ক বা রিলেশন বলতে একটি অপারেন্ড অপর অপারেন্ড থেকে ছোট কিংবা ছোট বা সমান কিংবা বড় বা সমান ইত্যাদি বুঝায়।

নিচে রিলেশনাল অপারেটর ও তার কাজের বর্ণনার ছক দেয়া হলো:

রিলেশনাল অপারেটর	কাজ	উদাহরণ	বর্ণনা
<	Less than (ছোট)	a < b	a এর মান b মানের চেয়ে ছোট
< =	Less than or equal (ছোট বা সমান)	a <= b	a এর মান b মানের চেয়ে ছোট অথবা সমান
>	Greater than (বড়)	a > b	a এর মান b মানের চেয়ে বড়
>=	Greater than or equal (বড় বা সমান)	a > = b	a এর মান b মানের চেয়ে বড় অথবা সমান।
==	Equal to (সমান)	a == b	a এর মান b মানের সমান
! =	Not equal to (অসমান)	a ! = b	a ও b এর মান সমান নয়

৩. লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operators)

সাধারণত দুই বা ততোধিক এক্সপ্রেশনের তুলনার জন্য যুক্তিমূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে যুক্তিমূলক এক্সপ্রেশন নিয়ে কাজ করার জন্য যেসব অপারেটর ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে লজিক্যাল বা যৌক্তিক অপারেটর বলা হয়। লজিক্যাল অর (||), লজিক্যাল এন্ড (&&) এবং লজিক্যাল নট (!) ইত্যাদি হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর।

নিচে লজিক্যাল অপারেটর ও তাদের কাজ বর্ণনা করা হলো:

অপারেটর এর চিহ্ন	অপারেটর এর নাম	কার্যপদ্ধতি	উদাহরণ
&&	AND অপারেটর	যদি উভয় অপারেন্ড এর মান শূন্য না হয় তবেই শর্তটি সত্য বা true হবে।	(A && B) is true.
||	OR অপারেটর	যদি দুটি অপারেন্ড এর কমপক্ষে একটি মান শূন্য না হয় তবেই শর্তটি সত্য বা true হবে।	(A || B) is true.
!	NOT অপারেটর	অপারেন্ড এর মান বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদি একটি শর্ত সত্য বা true হয় এবং সেক্ষেত্রে লজিক্যাল NOT অপারেটর ব্যবহারের ফলে শর্তটি মিথ্যা বা false হবে।	! (A && B) is false.

৪. অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operators)

যখন কোনো রাশিমালার বা কোনো ধ্রুবকের মান কোনো চলকে রাখতে হয় তখন অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয়। কোনো এক্সপ্রেশন বা ভেরিয়েবলের মানকে অন্য কোনো ভেরিয়েবলের মান হিসেবে নির্ধারণ করতে যেসব অপারেটর ব্যবহার করা হয়, তাই হলো Assignment Operator। সাধারণত অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হিসাবে '=' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। a = 5, Factorial= 0। এখানে a ও Factorial হলো ভেরিয়েবলের নাম যাদের কে যথাক্রমে 5 এবং দিয়ে 0 অ্যাসাইন্ট করা হয়েছে। C ভাষায় short hand assignment operator ও ব্যবহৃত হয়।

নিচে C প্রোগ্রামিং ভাষায় short hand assignment operator গুলোর তালিকা দেয়া হলো:

Simple assignment operator	Short hand assignment operator
a = a +	a + = 1
a = a –1	a – = 1
a = a * b	a * = b
a = a/b	a / = b
a = a%b	a% = b

টেবিল-সি এর short hand assignment operator

৫. ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operators)

সি প্রোগ্রামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেটর ব্যবহার করা হয় যা সাধারণত অন্য ভাষায় ব্যবহার করা হয় না। অপারেটর দুটি হচ্ছে Increment and Decrement Operators। অর্থাৎ ++ এবং -- ।

ভেরিয়েবলের মানকে বর্ধিত করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে Increment Operator বলে। এ বর্ধিত করণ ১ থেকে শুরু করে যেকোনো মান হতে পারে। যেমন- x=x+1; x=x+6 ইত্যাদি। Increment Operator একটি ইউনারি অপারেটর যার গঠন নিম্নরূপ–

++a or a++

++a কে prefix ইনক্রিমেন্ট বলে এবং a ++ কে postfix ইনক্রিমেন্ট বলে।

++a is equivalent to a = a + 1; or a + = 1

ভেরিয়েবলের মানকে হ্রাস করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে Decrement Operator বলে। এ হ্রাস করণ ১ থেকে শুরু করে যেকোনো মান হতে পারে। যেমন- x = x–1; x = x – 6 ইত্যাদি। Decrement Operator একটি ইউনারি অপারেটর যার গঠন নিম্নরূপ–

--a or a--

--a কে prefix ডিক্রিমেন্ট বলে এবং a++ কে postfix ডিক্রিমেন্ট বলে।

--a is equivalent to a = a – 1; or a– =1

৬. কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operators)

সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসাবে নির্ধারণ করার জন্য কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়। কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহারের ফরম্যাট হলো–

True

Exp1 = (Test Condition) ? Exp2 : Exp3

False

উপরের স্টেটমেন্টে প্রথমে Test Condition পরীক্ষা করা হবে। এ মান সত্য বা অশূন্য হলে Exp1= Exp2 নির্ধারিত বা সম্পাদিত হবে, আর এ মান মিথ্যা বা শূন্য হলে Exp1= Exp3 নির্ধারিত বা সম্পাদিত হবে। উল্লেখ্য, কন্ডিশনাল অপারেটরের ক্ষেত্রে কেবল Exp2 অথবা Exp3 সম্পাদিত হয়; কখনোই Exp2 এবং Exp3 উভয় সম্পাদিত হয় না।

৭. বিট ওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operators):

C প্রোগ্রামে বিট লেভেলে ডেটা ব্যবহার করার জন্য Bitwise Operator ব্যবহার করা হয়। এসব অপারেটর ব্যবহার করা হয় কোনো বিট পরীক্ষা করার জন্য বা কোনো বিট ডানে বা বামে সরানোর জন্য। Float বা Double টাইপের ডেটার ক্ষেত্রে Bitwise Operator ব্যবহার করা যায় না। পাশের টেবিলে কিছু Bitwise Operator ও তাদের অর্থ দেয়া হলো–

Operator	Meaning
&	Bitwise AND
|	Bitwise OR
^	Bitwise exclusive OR
< <	Shipt left
>>	Shipt right
~	One's complement

৫.১২.৬ কী-ওয়ার্ড (Keyword)

প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ভাষায় কিছু সংরক্ষিত শব্দ আছে, কম্পাইলারের কাছে যাদের বিশেষ অর্থ আছে। সংরক্ষিত শব্দগুলো প্রোগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এ শব্দসমূহকে কী-ওয়ার্ড বা রিজার্ভড ওয়ার্ড বলা হয়। সি প্রোগ্রামে ৩২ সংরক্ষিত শব্দ আছে। প্রত্যেক কীওয়ার্ডের সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং কীওয়ার্ড আলাদা আলাদা কাজ করে। সি প্রোগ্রামে সকল কীওয়ার্ড ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হয়।

ANSI-এর মান অনুযায়ী C প্রোগ্রামে ব্যবহৃত Keyword হলো–

auto	double	if	void
break	else	int	struct
case	enum	static	switch
char	extern	register	typedef
const	long	return	union
continue	float	short	unsigned
default	for	signed	volatile
do	goto	sizeof	while

৫.১২.৭ স্টেটমেন্ট (Statement)

প্রোগ্রামে কোনো এক্সপ্রেশন কিংবা ফাংশনের শেষে যখন সেমিকোলন (;) দেয়া হয়, তখন C এর ভাষায় একে সাধারণত স্টেটমেন্ট বলা হয়।

Statement দুধরনের হতে পারে। যথা: ১. Simple statement এবং ২. Compound statement

১. **Simple Statement:** একটি মাত্র এক্সপ্রেশন কিংবা একটি মাত্র ফাংশন নিয়ে গঠিত স্টেটমেন্টকে Simple statement বলে। যেমন-

```
int x = 7;
int y = 8; z
z = x + y;
printf (æSum = % d", z);
```

এখানে প্রতিটি লাইন একেকটি Simple statement।

২. **Compound statement**: এক বা একাধিক Simple স্টেটমেন্টকে যখন { } বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়, সি এর ভাষায় তখন তাকে compound statement বলে।

নিচে compound statement এর উদাহরণ দেয়া হলো:

```
{
pi = 3.141593;
circumference = 2*pi*r;
area = pi*r*r;
}
```

ইনপুট-আউটপুট স্টেটমেন্ট: C প্রোগ্রামে অনেক ধরনের লাইব্রেরি ফাংশন আছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে Standard I/O লাইব্রেরি ফাংশন যা সকল ধরনের Input / Output এর কাজ সম্পন্ন করে।

ইনপুট স্টেটমেন্ট (Input Statement)

যেসব স্টেটমেন্ট এর সাহায্যে প্রোগ্রামে ডেটা তথা ভেরিয়েবলের মান গ্রহণ করা হয় তাকে Input Statement বলে। কী বোর্ড থেকে string জাতীয় ডেটা ইনপুটের জন্য C তে কয়েক ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। যথা:

Input Statement
scanf()
getc()
gets()
getchar()

সি ভাষায় তিন ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেটা ইপুট দেয়া যেতে পারে। যথা:

১. অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট (Assignment Statement)
২. ফরমেটেড ইনপুট (Formated Input)
৩. রিডিং এ ক্যারেক্টার (Reading a character)

১. **অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট (Assignment Statement):** প্রোগ্রামের ডেটাগুলোকে সরাসরি একটি চলকে নির্দিষ্ট করে দিলে তাকে অ্যাসাইমেন্ট স্টেটমেন্ট বলে।

যেমন– physics = 80, chemistry = 70

নিম্নে দুটি বিষয়ের যোগফল বের করার জন্য Assignment Statement ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

```
# include <stdio.h>
main ( )
{
int physics = 80;
int chemistry = 70;
int total;
total = physics+chemistry;
printf ( æ The total number of two subjects = %d”,total);
}
```

ফলাফল: The total number of two subjects = 150

২. ফরমেটেড ইনপুট (Formated Input)

প্রোগ্রাম চলার সময় ব্যবহারকারীর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা নেয়ার জন্য বহুল ব্যবহৃত ইনপুট স্টেটমেন্ট হলো scanf ( ), যার সাহায্যে int, char, float ইত্যাদি টাইপের ডেটা ইনপুট করা যায়। scanf ( ) এর জন্য stdio.h লাইব্রেরি ফাংশন প্রোগ্রামে সংযুক্ত করতে হয়। scanf () হলো একটি Formated input ফাংশন।

scanf ( ) এর সাধারণ গঠন হলো:

```
scanf (æControl String”, &variable);
```

এখানে Control String বলতে বুঝানো হয়েছে ব্যবহারকারীর নিকট থেকে কোন টাইপের ডেটা নেয়া হবে। আর &variable নির্দেশ করে address of variable অর্থাৎ ব্যবহারকারী যে ডেটা ইনপুট করবে, তা উক্ত ভেরিয়েবলের জন্য নির্ধারিত মেমরি অ্যাড্রেসে সংরক্ষিত হবে। যেমন–

```
int a ;
scanf (æ%d”, &a);
```

এখানে %d হলো integer ডেটা টাইপের format specifications. আর &a হলো address of a যা নির্দেশ করে integer টাইপের a ভেরিয়েবলের মেমরি লোকেশন যেখানে ডেটা সংরক্ষিত হবে।

দুই বা ততোধিক ইনপুট ডেটা নেয়ার জন্য স্টেটমেন্টের গঠন হলো:

```
scanf (æControl Strings”, &variable1, &variable2, ........... &rariablen;
```

একই টাইপের ডেটার জন্য হতে পারে আবার ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ডেটার জন্যও হতে পারে। যেমন-

```
int a, b, c
scanf (æ%d  %d  %d”, &a, &b, &c);
```

অথবা,

```
int a;
float b;
char c;
scanf (æ%d  %f  %c”, &a, &b, &c);
```

সুতরা ং scanf ( ) ইনপুট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করার পূর্বে format specifications সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নিচের টেবিলে বিভিন্ন ধরনের format specifications এর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:

format specifications	ব্যবহার
%c	Single character টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%d বা %i	decimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%f	floating point টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%u	unsigned integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%o	octal integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%x	hexadecimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%s	String টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. রিডিং এ ক্যারেক্টার (Reading a Character)

সবচেয়ে সহজতম ইনপুট কমান্ড হলো একটি বর্ণ পড়া, যা সাধারণত করা হয় কী বোর্ডেও সাহায্যে। এই কাজটি করার জন্য getehar ফাংশনটির গঠন নিম্নরূপ:

```
Variable_name = getchar () ;
```

Variable_name কে char type এ ঘোষণা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ-

```
char name;
name = getchar ( );
```

আউটপুট স্টেটমেন্ট (Output Statement):

যেসব স্টেটমেন্ট এর সাহায্যে প্রোগ্রামের ফলাফল মনিটরে প্রদর্শন বা প্রিন্ট করা হয় তাদের কে আউটপুট স্টেটমেন্ট বলা হয়। কী বোর্ড থেকে string জাতীয় ডেটা আউটপুট প্রদর্শনের জন্য C তে কয়েক ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

Output statement
printf ( )
putc ()
puts ( )
putchar ( )

যথা: সি ভাষায় দুধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেটা আউটপুট পাওয়া যেতে পারে। যথা:

১. ফরমেটেড আউটপুট (Formated Output)
২. রাইটিং এ ক্যারেক্টার (Writing a character)

১. ফরমেটেড আউটপুট (Formated Output): C ভাষায় আউটপুট স্টেটমেন্ট হিসেবে বহুল ব্যবহৃত ফাংশন হলো printf ( ), যার সাহায্যে স্ট্রিং বা স্ট্রিংসহ বিভিন্ন টাইপের (যেমন: int, char, float ইত্যাদি) ডেটার মান মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন করা যায়।

printf ( ) এর গঠন হলো:

```
printf (æString");
```

String হিসেবে যেকোনো word বা character বা sentence হতে পারে। অর্থাৎ printf ( ) ফাংশন এর প্রথম বন্ধনী ( ) ভিতর ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা লেখা হয় printf ( ) ফাংশনটি মনিটরের স্ক্রিণে তাই প্রদর্শন করে।

উদাহরণ: COMPUTER শব্দটি মাঝে এক লাইন ফাঁকা স্থান সহ প্রিন্ট করার জন্য প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ( )
   {
    clrscr ( ) ;
    printf (æ\n COMPUTER");
    printf (æ\n");
    printf (æ\n COMPUTER");
    getch ( ) ;
      }
```

Output:

COMPUTER

COMPUTER

ইনপুট-আউটপুট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কয়েকটি প্রোগ্রাম:

উদাহরণ-১: একটি প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর নিকট থেকে পদার্থ এবং রসায়ন নম্বর জিজ্ঞাসা করবে এবং তাদের যোগফল বের করবে।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
```

উদাহরণ-২: সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রূপান্তরের প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main ( )
{
```

```
int Physics, Chemistry, sum;
printf (æEnter your score in Physics:”);
scanf (æ%d”, & Physics);
printf (æEnter your score in Chemistry:”);
scanf (æ%d”, & Chemistry);
sum = Physics + Chemistry;
printf (æTotal number is : %d”, sum);
getch();
}
```

ফলাফল: Enter your score in Physics: 70
Enter your score in Chemistry: 60
Total number is : 130

```
int c, f;
printf (æEnter celcious
temperature:”);
scanf (æ%d”,&c);
f=9*c/5+32;
printf (æFerenheight
temperature=%d\n”,f);
getch( );
}
```

ফলাফল:

Enter celcious temperature: 50
Ferenheight temperature = 122

উদাহরণ-৩: একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া থাকলে তার ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
main()
{
float a, b, c, s, area;
printf (æEnter the value of 3 arms of a triangle:”);
scanf (æ%f %f %f”, &a, &b, &c);
s = (a + b + c) / 2;
area = sqrt (s*(s–a)* (s–b)* (s–c));
printf (æ\nThe area of a triangle = % f”,
    area);
getch ();
}
```

প্রোগ্রামটি রান করলে আউটপুট হবে নিম্নরূপ:

Enter the value of 3 arms of a triangle: 6 7 8

The area of a triangle = 20.333

উদাহরণ-৪: বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define PI 3.14
main ( )
{
int ra;
flaot area;
printf (æEnter integer value for radius:”);
scanf (æ%d”,&ra);
area = PI* (ra*ra);
printf(æ\n Area of circle = %f”, area);
getch ( );
}
```

ফলাফল:

Enter integer value for radius: 7

Area of circle = 153.86

৫.১২.৮ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Control Statement)

সি ভাষায় লিখা প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো পর্যায়ক্রমে বা ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে যা একের পর এক সিকোয়েন্স অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে স্টেটমেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট ও ফাংশনের সমন্বয়ে সি প্রোগ্রাম গঠিত। যদি স্টেটমেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী সম্পাদনের প্রয়োজন হয় তাহলে কিছু শর্তযুক্ত করা হয়। এগুলোকে কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলে। কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লিখা হলে প্রোগ্রামের আকার ছোট হয় এবং প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম লাগে।

কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট এর শ্রেণিবিভাগ:

সি ভাষায় কন্ট্রোল স্টেটমেন্টকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

- কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Conditional Control Statement)
- লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Loop Control Statement) ।

কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Conditional Control Statement)

সি প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য কন্ডিশনাল কন্টোল ব্যবহৃত হয়। এরূপ শর্তযুক্ত স্টেটমেন্টকে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলে। কন্ডিশনাল কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত সত্য হলে প্রোগ্রামে এক ধরনের ফলাফল পাওয়া যায় এবং মিথ্যা হলে অন্য ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়।

সি প্রোগ্রামে Conditional Control Statement সমূহ হলোঃ

১. if স্টেটমেন্ট
২. if …else স্টেটমেন্ট
৩. else if স্টেটমেন্ট
৪. switch স্টেটমেন্ট

১। **if স্টেটমেন্টঃ** সি প্রোগ্রামে "যদি" অর্থে if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। শর্ত যদি সত্য হয় তবে statement কার্যকরী হবে আর শর্ত যদি মিথ্যা হয় তবে statement কার্যকরী হবে না। if statement এর গঠন–

Simple statement এর ক্ষেত্রেঃ

```
if (Condition)
statement1;
```

Compound statement এর ক্ষেত্রেঃ

```
if (Condition)
{
    statement 1;
    statement 2;
    ..................
    statement n;
}
```

if এর পর প্রথম বন্ধনীর ভেতর কন্ডিশনটি লিখতে হয়। if (Condition) স্টেটমেন্টের পরে কোনো সেমিকোলন থাকবে না। এ শর্তের মান যদি সত্য হয় তবে কন্ডিশনের পরের statement টি সম্পাদিত হয়, অন্যথায় পরবর্তী statement টি সম্পাদিত হয়।

প্রোগামে if statement যেভাবে কাজ করে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

```
# include<stdio.h>
# include<conio.h>
void main ()
{
int a;
printf (æEnter a value:” );
scanf (æ%d”, &a);
if (a>0)
printf (æ%d is a positive number.”, a );
getch () ;
}
```

ফলাফল: Enter a value: 5
5 is a positive number.

২। **if ...else স্টেটমেন্ট:** সি প্রোগ্রামে "অন্যথায়" অর্থে if স্টেটমেন্টের সাথে else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এজন্য এ স্টেটমেন্টকে if ...else স্টেটমেন্ট বলা হয়। if else statement ব্যবহারের ফরম্যাট হলো–

simple statement এর ক্ষেত্রে:

```
if (condition)
        statement 1;
else
        statement 2;
```

if (condition) স্টেটমেন্টের পরে কোনো সেমিকোলন বসে না। এখানে if এর condition সত্য হলে, প্রোগ্রামে if সংশ্লিষ্ট statement 1 সম্পাদিত হবে। অন্যথায় statement 1 সম্পাদিত না হয়ে else সংশ্লিষ্ট statement 2 সম্পাদিত হবে।

যদি compound statement হয়, তাহলে if else statement ব্যবহারের ফরম্যাট হলো–

```
if (condition)
   {
    statement 1;
    .................
    statement n;
    }
else
   {
     statement 11;
     ..................
     statement ln;
     }
```

এখানে if এর condition সত্য হলে, প্রোগ্রামে if সংশ্লিষ্ট compound statement সম্পাদিত হবে। অন্যথায় else সংশ্লিষ্ট compound statement সম্পাদিত হবে।

উদাহরণ–১: দুটি পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট দিতে হবে এবং এদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি প্রিন্ট করার জন্য If-then-else ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    int a, b;
    printf (æEnter 1st value:") ;
    scanf (æ%d", &a);
    printf (æEnter 2nd value;");
    scanf(æ%d", &b);
    if (a>b)
    printf (æLargest  Number is %d", a);
    else
    printf (æLargest  Number is %d", b);
```

উদাহরণ–২: একটি সাল ইনপুট দিতে হবে এবং সালটি Leap Year কিনা তা নির্ণয় করার জন্য প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ( )
{
    int y;
    int Rem4, Rem100, Rem400;
    printf (æ\n Enter a year:");
    scanf (æ%d", &y);
     Rem4 = y%4;
     Rem100 = y% 100;
     Rem400 = y%400;
if((Rem4 = = 0 && Rem100!=0) || Rem400 = = 0)
    printf (æ\n %d is a leap year", y);
```

```
getch () ;
}
```

আউটপুট: Enter 1st value: 25
Enter 2nd value: 35
Largesr Number is: 35

```
else
printf (æ\n%d is not a leap year", y);
getch ( );
}
```

ফলাফল: Enter a year: 2012
2012 is a leap year

৩। else if স্টেটমেন্ট:

সি প্রোগ্রামে "অন্যথায় যদি" অর্থে if-else স্টেটমেন্ট এর সাথে else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। প্রোগ্রামে একাধিক শর্ত যাচাই করার জন্য একাধিক if স্টেটমেন্ট এর পরিবর্তে else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। else if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরমেট হলো–

```
if (Condition1)
  {
   statement 1;
  }
else  if (Condition2)
   {
   statement 2;
  }
else  if (Condition3)
   {
   statement 3;
  }
   ............................
   else
   {
DefaultBlock;
   }
    BlockN;
   ............................
```

if এবং else if এর পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে শর্তসমূহ লিখা হয়। প্রোগ্রামে একাধিক সংখ্যক else if স্টেটমেন্ট থাকতে পারে। তবে if কিংবা else কিংবা if ...else সম্পর্কিত একটি মাত্র স্টেটমেন্ট সম্পাদিত হয়।

উদাহরণ: else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের জন্য প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ( )
{
int a, b, c ;
     printf (æEnter 3 inetger value:");
scanf (æ%d %d %d", &a, &b, &c);
if ((a>b) && (a>c))
printf (æ\n Lagest value is %d", a);
else if ((b>a) && (b>c))
printf (æ\n Lagest value is %d", b);
else
printf (æ\n Lagest value is %d", c);
getch ( );
}
```

ফলাফল:

Enter 3 inetger value: 3 7 9
Largest value is 9

Switch statement: else if এর মত প্রোগ্রামে একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট কোনো স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য C প্রোগ্রামে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বেশি সংখ্যক else if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের পরিবর্তে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। switch স্টেটমেন্ট এর সাথে অতিরিক্ত

case, break, default স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হতে পারে। বড় প্রোগ্রামে else if এর চেয়ে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে সহজেই প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় ।

switch স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরম্যাট হলোঃ

```
switch (expression)
{
case value1:
        statement(1);
        break;
case value2:
        statement(2);
        break;
        .........
case value n:
        statement(n);
        break;
default:
        default statement ;
        break;
}
```

উপরিউক্ত গঠন থেকে দেখা যায় যে, switch স্টেটমেন্ট চারটি keyword নিয়ে কাজ করে। যথাঃ

1. switch
2. case
3. break
4. default

switch: if স্টেটমেন্টের মতো switch এর পরে প্রথম বন্ধনীর '( )' মধ্যে expression লিখতে হয়। এ expression সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা বা ক্যারেক্টার টাইপের একটা ভেরিয়েবল হয়ে থাকে।

case: switch এর অন্তর্গত expression এর মান তুলনা করা হয় case এর সাথে যুক্ত মানের সঙ্গে। যে মানের সঙ্গে মিলবে বা সত্য হবে। সেই case সংশ্লিষ্ট statement(s) এক্সিকিউট বা সম্পাদিত হবে। লক্ষনিয় case value এর এরপর কোলন (:) চিহ্ন দিতে হয়। এ case value কে case label ও বলা যায়।

break: case label এর সাথে সংশ্লিষ্ট simple বা compound স্টেটমেন্টের শেষে break statement টি ব্যবহার করা হয়। ফলে কম্পিউটার বুঝতে পারে উপরিউক্ত case label টির কাজ শেষ। তবে break statement টি ব্যবহার করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই তবে ব্যবহার করা ভালো।

default: if else স্টেটমেন্ট এ যে কাজে else কে ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই কাজে switch স্টেটমেন্ট এ default ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, default এর পর কোলন (:) ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণঃ দুটি নম্বর ইনপুট হিসেবে নিবে এবং নম্বর দু'টি যোগ না বিয়োগ করবে তা ইনপুট হিসেবে নিবে এবং কার্যকর করবে। switch স্টেটমেন্টের সাহায্যে একটি প্রোগ্রাম লিখা হলো-

```
#include  <stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
```

```
{
    int menu, numb1, numb2, total ;
    printf (æEnter two numbers --?”) ;
    scanf (æ%d %d”, &numb1, &numb2 ) ;
    printf (æEnter your choice \n” ) ;
    printf (æ1=addition\n”) ;
    printf(æ2=subtraction \n”) ;
    scanf (æ%d”, &menu ) ;
    switch ( menu ) {
    case 1: total = numb1 + numb2;  break;
    case 2: total = numb1 - numb2;  break;
    default: printf (æInvalid option selected\n”) ;
    }
if ( menu == 1 )
    printf (æ%d plus %d is %d\n”, numb1, numb2, total) ;
else if ( menu == 2 )
    printf (æ%d minus %d is %d\n”, numb1, numb2, total) ;
getch ( ) ;
}
```

উপরিউক্ত প্রোগ্রামটি রান করলে স্ক্রীনে নিম্নোক্ত ফলাফল দেখাবে।

```
Enter two numbers: 25 10
Enter your choice
1 =  addition
2 = subtraction
1
25 plus 10  is 35
```

৫.১২.৯ লুপ (Loop)

সি প্রোগ্রামে স্টেটমেন্টসমূহ সাধারণত স্বংয়ক্রিয়ভাবে ও পর্যায়ক্রমে একবার করে সম্পাদিত হয়। প্রোগ্রামে যেসব স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার সম্পাদিত হয় সেগুলোকে লুপিং স্টেটমেন্ট বলা হয়। প্রোগ্রামের মধ্যে একই কাজ বার বার সম্পন্ন করাকে লুপ বা চক্র বলে।

লুপ স্টেটমেন্টসমূহ সাধারণত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা:

১. লুপ বডি (Loop Body)

২. টেস্ট কন্ডিশন (Test Condition)

প্রোগ্রামে যতক্ষণ পর্যন্ত টেস্ট কন্ডিশন বা শর্ত থাকে, লুপ বডির আবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। লুপ বডি ও টেস্ট কন্ডিশনের নির্বাহের উপর ভিত্তি করে লুপ স্টেটমেন্টসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ (Entry Control Loop):

এন্ট্রি কন্ট্রোললুপে লুপ বডির নির্বাহ শুরুর আগেই টেস্ট কন্ডিশন পরীক্ষা করা হয়। কন্ডিশন সত্য না হলে লুপ বডি সম্পাদিত হয় না।

এক্সিট কন্ট্রোল লুপ (Exit Control Loop):

এক্সিট কন্ট্রোল লুপে প্রথমে শর্তহীনভাবে একবার লুপ বডি নির্বাহ হয়। তারপর টেস্ট কন্ডিশন পরীক্ষা করা হয়।

নিচে এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ ও এক্সিট কন্ট্রোল লুপ এর ফ্লোচার্ট দেখানো হলো–

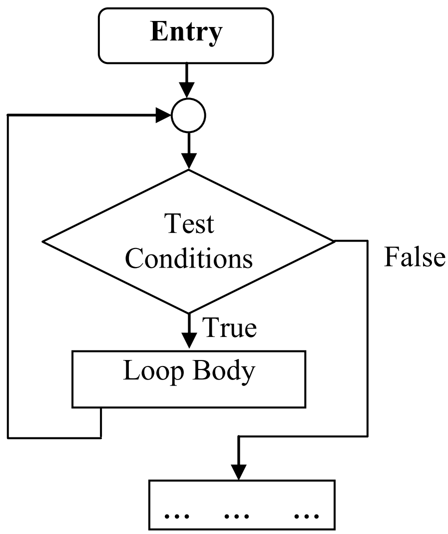

চিত্র: লুপ কন্ট্রোল – (ক) এন্ট্রি কন্ট্রোল

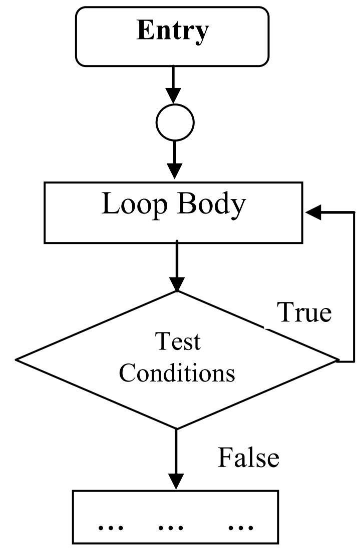

(খ) এক্সিট কন্ট্রোল

সি- প্রোগ্রামে লুপ স্টেটমেন্টসমূহ:

১। for loop স্টেটমেন্ট
২। while loop স্টেটমেন্ট
৩। do ...... while loop স্টেটমেন্ট

for loop স্টেটমেন্ট এর গঠন: সি প্রোগ্রামে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট একটি নির্দিষ্ট সংখ্যকবার সম্পাদন করতে for loop স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। লুপ কতবার নির্বাহ করা হবে তা জানা থাকলেই কেবলমাত্র for loop ব্যবহার করা যায়।

নিম্নে for loop স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো–

Simple statement এর ক্ষেত্রে:

```
for (expression 1; expression 2;
increment/decrement)
    {
    Statement;
    }
```

Compound statement এর ক্ষেত্রে:

```
for (expression 1; expression 2; increment / decrement)
    {
    statement 1;
    :
        statement1:
    }
```

এখানে expression 1-এ শুরুর মান assign করতে হয়। expression 2 তে শেষ মান conditional operator ব্যবহার করে উল্লেখ করতে হয়। increment / decrement দ্বারা শুরু থেকে শেষ মান পর্যন্ত কত করে বৃদ্ধি /হ্রাস পাবে তা প্রকাশ করে।

Simple ও Compound statement এর মধ্যে মূল্য পার্থক্য হলো Simple statement এ একটি statement থাকে অন্যথায় Compound এ একাধিক statement থাকে। Simple ও Compound statement উভয়টি দ্বারা লুপের স্ট্রাকচার দেখানো হলো। পরীক্ষায় লুপের স্ট্রাকচার লিখতে কোনো কিছু উল্লেখ না করলে Simple statement দিয়ে স্ট্রাকচার দেয়াই ভালো।

উদাহরণ–১: ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে বিজোড় সংখ্যাগুলো বের করার একটি প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
{
int  i ;
for (i = 1; i< = 50; i ++)
{
if (i % 2 ! = 0)
printf (æ%d", i);
}
getch ()
return 0 ;
}
```

প্রোগ্রামটি রান করলে নিচের ফলাফল প্রদর্শিত হবে:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

উদাহরণ–২: কোনো সংখ্যা মৌলিক কিনা তা যাচাই করার একটি প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main (void)
{
int  num, i, is_prime;
printf (æEnter the number to test:")
scanf (æ%d", &num):
is_prime=1;
for (i=2; i<=num/2; i=i+1);
if ( (num %i) = = 0) is_prime = 0;
if (is_prime = = 1)
printf (æThe number is prime. \n") ;
else
printf (æThe number is not prime.
\n");
}
```

ফলাফল:

Enter the number to test: 3
The number is prime.

While Loop: সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট একটি নির্দিষ্ট সংখ্যকবার সম্পাদন করতে while loop স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। while loop কে for loop এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়। while এর condition প্রথমেই check হয় এবং condition false হলে লুপ execute হয় না।

while loop স্টেটমেন্ট ফরম্যাট হলো–

Simple statement এর ক্ষেত্রে:

```
expression 1;
while (expression 2)
{
statement
expression 3;
}
```

Compound statement এর ক্ষেত্রে :

```
expression 1;
while (expression 2)
{
statement 1
.
.
```

```
statement n
expression 3;
}
```

এখানে, expression 1-এ শুরুর মান assign করতে হয়। expression 2 তে শেষ মান conditional operator ব্যবহার করে উলেখ করতে হয়। expression 3 দ্বারা শুরু থেকে শেষ মান পর্যন্ত কত করে বৃদ্ধি/হ্রাস পাবে তা প্রকাশ করে।

উদাহরণ-১: 1 + 3 + 9 + 27 + 81+.......+N ধারার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
        {
        int  i, n, s;
        printf (æEnter the last number: æ)
;
        scanf (æ%d", &n) ;
        i = 1;
        s = 0 ;
        while (i<=n)
                {
                s = s+  i;
                i = i * 3;
                }
        printf (æThe result is %d",  s) ;
        getch ( ) ;
        }
```

উপরিউক্ত প্রোগ্রামটি রান করলে স্ক্রীনে নিম্নোক্ত ফলাফল দেখাবে।

Enter the last number: 250

The result is 365

উদাহরণ–২: ১+২+৩+৪+ .... + n ধারার যোগফল নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লিখ। যেখানে n হলো কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
{
     int  s = 0 ;
     int  i = 1 ;
     int  n;
printf (æEnter the total number of value:");
     scanf (æ%d",&n);
     while (i<=n)
{
     s = s + i;
     i ++;
}
printf (æThe sum of the value is %d\n",s);
     getch();
}
```

প্রোগ্রামটি রান করে নিচের নমুনা ডেটা ইনপুট দিলে ফলাফল প্রদর্শিত হবে–

Enter the total number of value: 50
The sum of the value is 1275

do–while Loop: সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট একটি নির্দিষ্ট সংখ্যকবার সম্পাদন করতে do-while loop স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। তবে for এবং while যত বেশি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত হয় ততবেশি do-while loop লুপ ব্যবহৃত হয় না। do-while loop অন্ততপক্ষে একবার execute হবে, যদিও condition false হয়, কারণ এখানে condition পরে check হয়। do-while loop-টি শুধুমাত্র do loop নামে পরিচিত।

do-while/do loop এর গঠন হচ্ছে–

Simple statement এর ক্ষেত্রে:

```
expression 1;
do
{
        statement 1;
        .
        .
        statement n;
expression 2;
}
while (expression3);
```

Compound statement এর ক্ষেত্রে :

```
expression 1;
do
{
        statement 1;
        .
        .
      statement n;
expression 2;
}
while (expression3);
```

এখানে, expression 1–এ শুরুর মান assign করতে হয়। expression 2 দ্বারা শুরু থেকে শেষ মান পর্যন্ত কত করে বৃদ্ধি/হ্রাস পাবে তা প্রকাশ করে। expression 3 তে শেষ মান conditional operator ব্যবহার করে উল্লেখ করতে হয়।

উদাহরণ–১: কীবোর্ড থেকে 4 ডিজিটের একটি সংখ্যা ইনপুট করে উহাকে উল্টা ক্রমানুসারে (Reverse order) লেখার প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include<stdio.h>
# include<conio.h>
main ()
{
    int number, rightdigit;
   printf(æ\nEnter your number:") ;
   scanf (æ%d", &number) '
printf(æ\nThe Number in regerse order is: æ) ;
  do
  {
  rightdigit = number % 10 ;
  printf(æ%d", rightdigit) ;
  number = number / 10 ;
  }
while (number ! = 0   // End of do
getch () ;
} // End of main
```

ফলাফল:

```
Enter a number to reverse : 4567
Reverse of entered number is 7654
```

উদাহরণ–২: দুটি সংখ্যার গসাগু নির্ণয়ের প্রোগ্রাম।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
    {
    int  1, s, r ;
    printf (æEnter  two positive numbers:") ;
    scanf (æ%d   %d", &1, &s);
    do
         {
         r  =1  %  s;
         l = s ;
         s = r ;
         }
    while (s! = 0) ;
    printf (æThe GCD is %d", l) ;
    getch () ;
    }
```

উপরিউক্ত প্রোগ্রামটি রান করলে স্ক্রীনে নিম্নোক্ত ফলাফল দেখাবে।

```
Enter two positive numbers: 100   150
The GCD is 50
```

৫.১২.১০ অ্যারে (Array)

অ্যারে হলো একই ধরনের বা সমপ্রকৃতির চলকের সমাবেশ। যেমন- Mark(20) একটি অ্যারে, যেখানে ২১ জন ছাত্রের মার্কস সংরক্ষণ করা যাবে। এ অ্যারের প্রথম চলকটি হলো Mark(0), দ্বিতীয়টি Mark(1), তৃতীয়টি Mark(2) এবং একুশতমটি Mark (20)। অ্যারের একটি নাম থাকে, index থাকে এবং এর সদস্য বা আইটেমসমূহকে বন্ধনী (Braket) এর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। অ্যারে ব্যবহার করা সহজ। এটা প্রোগ্রামকে সহজ, সুন্দর ও ছোট করে এবং জটিলতা কমায়।

মনে করি, কোনো বিষয়ের পাঁচ জন ছাত্রের পরীক্ষার নম্বর হলোঃ 80,90,70,50,85।

Mark নিয়ে গঠিত অ্যারে দেখানো হলোঃ Mark [5] = [80, 90, 70, 50, 85]

অ্যারের এক একটি অ্যালিমেন্ট বা সদস্যকে তার অবস্থান দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন–

Mark [0] = 80
Mark [1] = 90
Mark [2] = 70
Mark [3] = 50
Mark [4] = 85

অ্যারে ব্যবহারের সুবিধাঃ

১. একই নামে অনেকগুলো চলক ব্যবহার করা যায়।
২. অ্যারের উপাদানগুলো মেমরিতে পাশাপাশি অবস্থান করে।
৩. প্রোগ্রাম নির্বাহ দ্রুত হয়।
৪. অ্যারে উচ্চস্তরের ভাষার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।
৫. অ্যারে প্রোগ্রামকে সহজ, সুন্দর ও ছোট করে এবং জটিলতা কমায়।

অ্যারে ব্যবহারের অসুবিধাঃ

১. অ্যারেতে একই জাতীয় ডেটা অর্থাৎ একই টাইপের ডেটা রাখতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ডেটা একটি অ্যারেতে রাখা যায় না।
২. প্রোগ্রাম নির্বাহের সময়ে ঘোষণাকৃত অ্যারের সাইজ কখনো পরিবর্তন করা যায় না।
৩. প্রকৃত ডেটা অপেক্ষা অ্যারের সাইজ অনেক বেশি ঘোষণা করা হলে মেমরির অপচয় হতে পারে।

অ্যারেকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. একমাত্রিক অ্যারে (One dimentional array)
২. দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two dimentional array)

১. একমাত্রিক অ্যারে (One dimentional array): অ্যারের অন্তর্ভুক্ত উপাদান বা ডেটাগুলো যদি একটি মাত্র কলাম ও একাধিক সারি অথবা একটি মাত্র সারি এবং একাধিক কলামে উপস্থাপন করা হয় তাকে একমাত্রিক অ্যারে বলা হয়। যেমন ৫ জন ছাত্রের রোল নম্বর যথাক্রমে 201,202,203,204,205 কে ৫টি চলক Roll0,Roll1,Roll2,Roll3,Roll4 দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

Roll[0]	201
Roll[1]	202
Roll[2]	203
Roll[3]	204
Roll[4]	205

যেমন- একমাত্রিক অ্যারের উদাহরণঃ Roll[4]।

এখানে, ডেটা টাইপ হচ্ছে int অ্যারে নাম হচ্ছে Roll এবং অ্যারের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 5 এবং সদস্যগুলো হচ্ছে– সি প্রোগ্রামিং ভাষায় একটি একমাত্রিক অ্যারে তৈরির নিয়মঃ data type variable name [size]

উদাহরণ: একটি কলেজের কোনো শ্রেণির পাঁচ জন ছাত্রের রোল নম্বর এবং পরীক্ষায় অর্জিত নম্বর ইনপুট হিসেবে প্রদান করে আউটপুট হিসেবে উক্ত রোল নম্বর এবং পরীক্ষায় অর্জিত নম্বরসমূহ অ্যারে আকারে প্রদর্শনের জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#define Max 5
main ()
{
    int  i, roll [Max] ;
    float Mark [Max] ;
    for (i = 0; i<Max; i++)
   {
    printf (æ\nEnter Roll [%d]  & Mark [%d]:”, i, i) ;
    scanf (æ%d%f’, &Roll [i], &Mark [i]);
   }
    for (i = 0; i <Max; i++)
    printf(æ\nRoll [%d] = %d   Mark [%d] = %, 2f’, i, Roll [i], i, Mark [i]) ;
    getch () ;
    }
```

প্রোগ্রামটি রান করালে নিচের ফরমেটে ইনপুট দিতে হবে। অতঃপর পাশের ফলাফল প্রদর্শিত হবে।

```
Enter Roll [0] & Mark [0] : 101  56.5    |  Roll [0] = 101 Mark [0] : 56.50
Enter Roll [1] & Mark [1] : 102  66      |  Roll [1] = 102 Mark [1] : 60.00
Enter Roll [2] & Mark [2] : 103  45.5    |  Roll [2] = 103 Mark [2] : 45.50
Enter Roll [3] & Mark [3] : 104  74.5    |  Roll [3] = 104 Mark [3] : 74.50
Enter Roll [4] & Mark [4] : 105  85      |  Roll [4] = 105 Mark [4] : 85.00
```

দ্বিমাত্রিক অ্যারে:

যে অ্যারের উপাদানগুলো একই সাথে একাধিক সারি ও একাধিক কলামে ডেটা উপস্থাপন করা হয় তাকে দ্বিমাত্রিক অ্যারে বলা হয়। দ্বিমাত্রিক অ্যারে ঘোষণা একমাত্রিক অ্যারের মতোই তবে এখানে দুটি subscript এর প্রয়োজন হয়। একটি subscript দ্বারা রো এবং অপর subscript দ্বারা কলাম বুঝায়। নিম্নে mark[3,4] নামে একটি দ্বিমাত্রিক অ্যারে দেখানো হলো, যার সারি ৬টি ও কলাম ৪টি।

	0	1	2	3
0	Mark[0,0]	Mark[0,1]	Mark[0,2]	Mark[0,3]
1	Mark[1,0]	Mark[1,1]	Mark[1,2]	Mark[1,3]
2	Mark[2,0]	Mark[2,1]	Mark[2,2]	Mark[2,3]
3	–	–	–	–
4	–	–	–	–
5	Mark[5,0]	Mark[5,1]	Mark[5,2]	Mark[5,3]

C প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে দ্বি-মাত্রিক অ্যারের গঠন নিম্নে দেয়া হলো:

data_type array_name [row_size] [column_size]

উদাহরণ-১: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত নামতার ছক প্রদর্শনের জন্য দ্বিমাত্রিক অ্যারে ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লিখ।

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#define Row 10
#define Col 10
main ()
{
int r, c;
int mul [Row] [Col] ;
printf (æ\t\t ===================== \n") ;
printf (æ\t\tMULTIPLICATION TABLE\n            æ) ;
printf(æ\t\t ====================== \n          ") ;
for (int j= 1;  j< = Col;  j++)
printf (æ%4d", j) ;
printf (æ===================== \n");
for (int  i= 0;  i<Row;  i++)
{
r = i + 1;
printf (æ%2d |  ",  r) ;
for (int j= i;  j<= Col;  j++)
{
c = j;
mul [i] [j] = r*c;
printf (æ%4d",  mul [i]  [j]);
}
printf (æ\n") ;
}
getch () ;
}
```

প্রোগ্রামটি রান করলে নিচের ফলাফল প্রদর্শিত হবে:

=====================
MULTIPLJCATION TABLE
=====================

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

৫.১২.১১ ফাংশন (Function)

সি প্রোগ্রামে যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কতকগুলো স্টেটমেন্ট কোনো নামে একটি ব্লকের মধ্যে রাখা হয় তখন তাকে ফাংশন বলা হয়। প্রতিটি সি প্রোগ্রাম এরূপ এক বা একাধিক ফাংশনের সমষ্টি।

ফাংশন চেনার সহজ উপায় হলো ফাংশনের নামের শেষে এক জোড়া প্রথম বন্ধনী '( )' থাকে, এ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। প্রতিটি ফাংশনের একটি নাম থাকে, যে নামে কম্পাইলার তাকে সনাক্ত করে। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময়ে কম্পাইলার যখন কোনো ফাংশন কল পায় তখন মূল প্রোগ্রামের কাজ স্থগিত রেখে কল ফাংশনে নির্বাহ শুরু করে এবং নির্বাহ শেষে মূল ফাংশনে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পরবর্তী লাইন থেকে নির্বাহ চালিয়ে যায়। তবে এ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত কিছুটা সময় ব্যয় হয়। তাই ছোট কোনো প্রোগ্রামের জন্য সাধারণত ফাংশন ব্যবহার করা হয় না।

ফাংশনের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Function)

১. ফাংশনের সাহায্যে প্রোগ্রামকে সংক্ষিপ্ত আকারে রচনা করা যায়।
২. ফাংশনের ব্যবহারে একই ধরনের কাজের জন্য একই ধরনের স্টেটমেন্ট বার বার লেখার প্রয়োজন হয় না।
৩. প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন বা ডিবাগিং করা সহজ হয়।
৪. ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুযায়ী ফাংশন তৈরি করে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

ফাংশন এর প্রকারভেদ (Types of Function)

সি-তে এ ব্যবহৃত ফাংশনসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function)
২. ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন (User Defined Function)

লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function)

যেসব ফাংশন বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদনের জন্য সি প্রোগ্রামে বিল্ট-ইন আছে তাকে লাইব্রেরি ফাংশন বলে। সি কম্পাইলারে লাইব্রেরি ফাংশন নামে কতকগুলো বিল্ট-ইন ফাংশন আছে সেগুলোকে তাদের নিজস্ব ফরম্যাট অনুযায়ী main () ফাংশনে ব্যবহার করা যায়। print (), scanf (), getch (), getchar (), abs (), sqrt (), sin (), cos(), tan (), rand () এধরনের লাইব্রেরি ফাংশনের উদাহরণ। লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার সহজ, এজন্য কেবল ঐ ফাংশনের ব্যবহারবিধি এবং ফরম্যাট জানলেই চলে।

নিচে C ভাষায় কতকগুলো Library function এর একটি ছক দেয়া হলো:

ফাংশন	সংশিষ্ট হেডার ফাইল	ফাংশনের কাজ
abs()	stdio.h	পরম মান নির্ণয় করে।
div()	stdio.h	ভাগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
printf()	stdio.h	আউটপুট মান আউটপুট মাধ্যমে পাঠায়
scanf()	stdio.h	ইনপুট মান গ্রহণ করে।
putchar()	stdio.h	আউটপুট মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠায়।
getchar()	stdio.h	ইনপুট মাধ্যম থেকে একটি বার্তা গ্রহণ করে।
sqrt()	math.h	বর্গমূল নির্ণয় করে।
sin()	math.h	সাইন মান নির্ণয় করে।
cos()	math.h	কোসাইন মান নির্ণয় করে।
tan()	math.h	ট্যানজেট মান নির্ণয় করে।

getch()	conio.h	কীবোর্ড থেকে একটি বার্তা নেয় তবে স্ক্রিনে প্রদর্শন করে না।
clrscr()	conio.h	স্ক্রীণ পরিস্কার করে।
arc()	graphics.h	বৃত্তচাপ অঙ্কন করে।
bar()	graphics.h	বার অঙ্কন করে।
circle()	graphics.h	বৃত্ত অঙ্কন করে।
line()	graphics.h	লাইন অঙ্কন করে।

লাইব্রেরি ফাংশন দুপ্রকার। যথা:

ক. **সংখ্যাবাচক ফাংশন (Numeric function):** যে ফাংশন গাণিতিক কার্য সম্পাদন করে তাকে সংখ্যাবাচক ফাংশন বলে।

যেমন- ABS, SQR, MOD, RND, DIM, LOG, SIN, TAN, COS ইত্যাদি।

খ. **স্ট্রিং ফাংশন (String function):** যে ফাংশনের সাহায্যে কোনো স্ট্রিং এর মান বের করা যায় তাকে স্ট্রিং ফাংশন বলে। যেমন- Date$, Times$, Ucase$, Lcase$ ইত্যাদি।

ইউজার-ডিফাইড ফাংশন (User Defined Function)

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুসারে তার পছন্দমতো ফাংশন তৈরি করতে পারে।

সি কম্পাইলারে অনেক বিল্ট-ইন্ট/লাইব্রেরি ফাংশন থাকা সত্ত্বেও প্রোগ্রাম রচনায় সময় চাহিদা অনুযায়ী সব রকম ফাংশন পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রাম তার নিজস্ব প্রয়োজন এবং প্রজ্ঞা অনুযায়ী যেসব ফাংশন তৈরি করে প্রোগ্রাম তথা main () ফাংশনে ব্যবহার করেন সেগুলোকে ইউজার-ডিফাইড (User defined) বা ব্যবহারকারী বর্ণিত ফাংশন বলা হয়। মনে করা যাক, একজন প্রোগ্রামারের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে দুটি পূর্ণসংখ্যা প্রদান করে যোগফল প্রদর্শনের প্রয়োজন হতে পারে এবং এজন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রাম কোড নিম্নরূপ হতে পারে:

```
int Valuel, Value2, Sum;
printf (æ\nEnter two integer numbers : ’’ ) ;
scanf (æ%d %d”, & Valuel, &Value2);
Sum = Valuel + Value2;
printf (æ\nSum of %d and %d is : %d”, Valuel, Value2, Sum)
```

এখন প্রোগ্রামার ইচ্ছে করলে যতগুলো প্রোগ্রামে কিংবা প্রোগ্রামের যতস্থানে দু’টি পূর্ণসংখ্যা প্রদান করে যোগফল প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে সবখানেই উপরিউক্ত প্রোগ্রাম ফাংশন লিখতে হবে। কিন্তু এতে সমস্যা হলো, এতে করে প্রোগ্রামের কলেরব এবং যেকোনো স্থানে দুটি পূর্ণসংখ্যা প্রদান করে যোগফল প্রদর্শনের জন্য কেবল সেই নাম লিখে ফাংশনটি কল করলেই হবে. এজন্য পুরো প্রোগ্রাম কোড লেখার প্রয়োজন নেই।

ফাংশনের গঠন:

```
function_name (argument list)
argument declaration;
{
local variable declaration;
```

```
executable statement 1;
executable statement 2;
.....................................
.....................................
return (expression);
}
```

এখানে,

Function_name : ভেরিয়েবল ধরন অনুযায়ী ফাংশনের নাম দিতে হবে।
argument list : যেসব ভেরিয়েবল ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার অপারেশন চালানো হবে তার তালিকা।
local variable declarations: শুধু এই ফাংশনে যেসব ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হবে তাদেরকে ঘোষণা করতে হয়।
return : যে মান মূল প্রোগ্রামে ফেরত আসবে তা উল্লেখ করতে হয়।

ফাংশনের বিভিন্ন উপাদান: সি/সি++ প্রোগ্রামে কোনো লাইব্রেরি কিংবা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহার করতে গেলে সাধারণত নিম্ন লিখিত চারটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়–

- ফাংশন বর্ণনা (Function Definition)
- ফাংশন কল (Function Call)
- ফাংশনের প্রোটোটাইপ (Function Prototype)
- ফাংশনের রিটার্ন টাইপ ও রিটার্ন স্টেটমেন্ট (Function's Return Type and Return Statement)।

ফাংশনের বর্ণনা (Function Definition)

ফাংশন বর্ণনার মাধ্যমে কম্পাইলারকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এটা কি কাজ করবে এবং কিভাবে করবে। একটি ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন কতকগুলো স্টেটমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফাংশনের প্রতিটি স্টেটমেন্ট সেমিকোলন দ্বারা শেষ হয়। ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশনের বর্ণনা তার ব্যবহারকারী বা main() ফাংশনের উপরে কিংবা নিচে থাকে কিন্তু ভেতরে নয়।

ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ঘোষণার ফরম্যাট হলো–

```
ReturnType FunctionName   (ArgumentList)
 // FunctionBody
 // ReturnStatement   (Depends on ReturnType)
)
```

এখানে, ReturnType যেকোনো বৈধ ডেটা টাইপ, FunctionName ব্যবহারকারী কর্তৃক দেয়া ফাংশনের নাম এবং ArgumentList ফাংশনে ব্যবহৃত আরগুমেন্টের তালিকা। FunctionBody-তে ফাংশনের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। FunctionBody-কেমন হবে তা ফাংশনের ধরন অর্থাৎ সমস্যার উপর নির্ভর করে।

উদাহারণ:

```
int  Sum ( )
    {
    //   . . . .   . . .
    return   (0) ;
    }
void main ( )
    {
     // . . . . .   . . .
    }
int   Sum (int, int)
    {
     // . . . . .   . . .
    retrun   (0) ;
   }
```

উল্লেখ্য, ফাংশনের প্রথম বন্ধনির মধ্যে কোনো ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হলে তাকে আরগুমেন্ট ভেরিয়েবল বলা হয়। সি++ প্রোগ্রামে ফাংশনে কোনো আরগুমেন্ট ভেরিয়েবল না থাকলে আরগুমেন্ট তালিকা void লেখা হয় তবে সি++ কম্পাইলারে তা বাধ্যতামূলক নয়। ফাংশনের নাম একটি আইডেন্টিফায়ার; সুতরাং আইডেন্টিফায়ার

নামকরণের নিয়মানুযায়ী ফাংশনের যেকোনো বৈধ নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ব্যবহারকারী ফাংশনে একই নামে অপর কোনো ভেরিয়েবল বা আইডেন্টিফায়ার থাকলে সেই নামের কোনো ফাংশন ব্যবহার করা যায় না।

সি/সি++ প্রোগ্রামে ব্যবহৃত লাইব্রেরি ফাংশসমূহের বর্ণনা সংশ্লিষ্ট হেডার ফাইলে বর্ণিত ব্যবহার করলে প্রোগ্রামের শুরুতেই অর্থাৎ main() এর পূর্বে #include ডিরেক্টিভ স্টেটমেন্টের সাহায্য ঐ লাইব্রেরি ফাংশন সংশ্লিষ্ট হেডার ফাইল সংযুক্ত করতে হয়।

ফাংশন কল (Function Call)

যখন একটি ফাংশন অপর কোনো ফাংশনকে ব্যবহার করে, তখন তাকে ব্যবহারকারী বা মূল ফাংশন এবং যে ফাংশনটি ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যবহৃত বা কল্ড ফাংশন বলা হয়। আর এ প্রক্রিয়ার নাম ফাংশন কল। ফাংশন কল প্রক্রিয়ায় একটি ফাংশনের সাথে অপর এক বা একাধিক ফাংশন সংযুক্ত করা হয়। ফাংশন কল একটি স্টেটমেন্ট। সুতরাং এর শেষে অবশ্যই সেমিকোলন (;) থাকতে হবে। এক জোড়া প্রথম বন্ধনী '()' দেখে যেমন ফাংশন চেনা যায়; তেমনি এর জোড়া প্রথম বন্ধনীর শেষে অতিরিক্ত একটি সেমিকোলন দেখে ফাংশন কল বুঝা যায়। যেকোনো সি/সি++ প্রোগ্রামের main() ফাংশন অপর এক বা একাধিক লাইব্রেরি কিংবা ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন কল করতে পারে। এভাবে এক ফাংশন এক বা একাধিকবার অন্য যেকোনো ফাংশন ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, main() একটি ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন হলেও অন্য কোনো ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন main() ফাংশন কল করতে পারে না। সি/সি++ কম্পাইলার main() ফাংশনকে ড্রাইভার ফাংশন বা চালক ফাংশন হিসেবে গণ্য করে ব্যবহৃত অন্যান্য ফাংশন কল করে। কোনো ফাংশন (লাইব্রেরি বা ইউজার-ডিফাইন্ড) কল করার ফরম্যাট হলো:

উদাহারণ:

```
int  Sum ( )
   {
   //  . . . .  . . .
   return   (0) ;
   }

void main ( )
   {
   // . . . . . . . .
   Sum ( ) ;
```

FunctionName (Parametre or Argument List)

অর্থাৎ ফাংশনের নামের শেষে প্রথম বন্ধনীর '()' মধ্যে প্যারামিটারের মানসহ (যদি থাকে) ফাংশন কল করা হয়।

রিকার্সিভ ফাংশন (Recursive Function)

একটি ফাংশন অন্য কোনো ফাংশনকে যেকোনো সংখ্যক বার কল করতে পারে। আবার কোনো ফাংশন নিজেও নিজেকে কল করতে পারে। যখন কোনো ফাংশন নিজেই নিজেকে কল করে তখন তাকে রিকার্সিভ ফাংশন বলা হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে রিকার্সন (Recursion) বলা হয়। কোন সংখ্যার ফ্যাক্টরিয়াল নির্ণয় রিকার্সিভ ফাংশনের একটি আদর্শ উদাহরণ। আমরা জানি, ফ্যাক্টরিয়াল হলো একটি গাণিতিক পদ্ধতি। যেকোনো ধনাত্বক সংখ্যা N এর ফ্যাক্টরিয়াল মান হলো 1 হতে N পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর গুণফল। যেমন- 3 এর ফ্যাক্টরিয়াল 6 ($3!=3\times2\times1=6$), 4 এর ফ্যাক্টরিয়াল 24 ($4!=4\times3\times2\times1=24$)

নিম্নে রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহার করে কোনো সংখ্যার ফ্যাক্টরিয়াল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম দেয়া হলো:

```
/* Finding Factorial using Recursive Function */
#include<stdio.h>
#include<time.h>
```

```
long Factorial (int n)
{
if (n  <=1)
  return 1;
 else
  return (n * Factorial (n-1));
}
void main ( )
{
int  V;
long F;
XX:
printf (æ\nEnter a Positive integer: ” );
scanf (æ%d”, &V);
if (V<0)
goto XX;
F= Factorial (V);
print (æ\nFactorial of %d = %1d = %1d”, V, F) ;
}
```

Output:

```
Enter a Positive integer: 6
Factorial of 6 = 720
```

রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহারের সুবিধা:

১. অনর্থক ফাংশন কলিং করা রোধ করে।
২. সমস্যাকে সহজভাবে সমাধান করা যায়।
৩. অনেক কম সংখ্যাক ভেরিয়েবলের প্রয়োজন হয়।
৪. প্রোগ্রাম সহজ ও সুন্দর হয়।

রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহারের অসুবিধা:

১. অনেক রিকার্সন ফাংশানের ব্যবহার কোডিংকে জটিল করে তোলে।
২. রিকার্সিভ সর্বদা লজিক্যাল এবং এর সমস্যা সনাক্ত করা কঠিন।
৩. বেশি স্ট্যাক স্পেসের প্রয়োজন হয়।
৪. প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি সময় লাগে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। চিত্রটি লক্ষ্য কর—

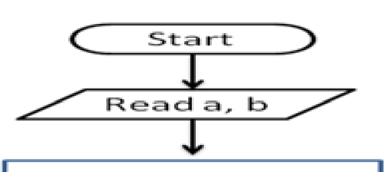

ক. কম্পাইলার কী ?
খ. চিত্রে ব্যবহৃত প্রতীকগুলোর নাম ও ব্যবহার লিখ।
গ. দুটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের জন্য প্রতীকগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে? বর্ণনা কর।
ঘ. "কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্লোচার্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" বিশ্লেষণ কর।

২। মি. জন আমেরিকার নাগরিক। তিনি রফিকের বন্ধু। বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য মি. জন বাংলাদেশে এসেছেন। মি. জন বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কতা বলতে হচ্ছে। কিন্তু মি. জন বাংলা না জানার কারণে সমস্যা হচ্ছিল। রফিক বিভিন্ন তথ্য ইংরেজিতে রূপান্তর করে মি. জনকে সাহায্য করে।

ক. অনুবাদক প্রোগ্রাম কি?
খ. একটি ডেটাবেজ প্রোগ্রামের নাম লিখ এবং এর বৈশিষ্ট্য লিখ।
গ. কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
ঘ. উচ্চ স্তরের ভাষার বৈশিষ্টগুলো আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। সি কোন ধরনের ভাষা?

ক. মেশিন ভাষা খ. হাই লেভেল ভাষা গ. মিড লেভেল ভাষা ঘ. অ্যাসেম্বলী ভাষা

২। নিচের কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রাম?

ক. পাইথন খ. ওরাকল গ. ইন্টারপ্রেটার ঘ. অ্যালগল

৩। কোনো প্রোগ্রাম রচনার পূর্বে–

i. অ্যালগরিদম তৈরি করতে হয়।
ii. ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হয়।
iii. ডিবাগিং করতে হয়।

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্ট বার বার নিবার্হের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. লুপ খ. অ্যারে গ. ফাংশন ঘ. কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করে রাখি। সু-শৃঙ্খল এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষণ করলে সহজে ম্যানিপুলেশন করা যায়। সাজানো কোনো নির্দিষ্ট রেকর্ড খুঁজে বের করা সহজ হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব-নিকাস করা যায়। প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা, এমনকি গ্রাফের সাহায্যে উপস্থাপন ইত্যাদি সহজে করার জন্য ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা হয়। একাধিক ডেটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা, ডেটার সিকিউরিটি রক্ষা করা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বর্ণনা করতে পারবে।
- ডেটা সিকিউরিটির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ডেটা সিকিউরিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ডেটা এনক্রিপশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ডেটা এনক্রিপশনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ব্যবহারিক:

- ডেটাবেজ তৈরি করতে পারবে।

৬.১ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট (Database Management)

ডেটাবেজঃ ডেটা (Data) শব্দের অর্থ উপাত্ত এবং বেজ (base) শব্দের অর্থ সমাবেশ। সূতরাং ডেটাবেজ হচ্ছে উপাত্তের সমাবেশ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডেটাবেজ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ যুগে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার সকল ডেটা ঐ প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকে। একটি ডেটাবেজে একাধিক টেবিল, ফর্ম, রিপোর্ট, কুয়েরি, ম্যাক্রো ইত্যাদি থাকতে পারে। ডেটাবেজের ডেটাগুলো বিভিন্ন প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে ডেটা পরিবর্তন / আপডেট করা যায়। এখানে ডেটাগুলো দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায়। যদিও ডেটাবেজে ডেটা সংরক্ষণ করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, তবে ডেটাবেজ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনসম্পদ প্রয়োজন। ডেটাবেজে ভুল ডেটা ইনপুট করলে সম্পূর্ণ ডেটাবেজকে প্রভাবিত করে। অনেক ডেটাবেজে প্রক্রিয়াকরণ ধীরগতিসম্পন্ন। ডেটাবেজ তথ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং, এয়ার লাইন্স, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেলিকমিউনিকেশন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা হয়। ডেটাবেজের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে- ডেটা, রেকর্ড এবং ফিল্ড।

কোনো ডেটা টেবিলের প্রত্যেকটি ফিল্ডে আমরা যেসব মান ব্যবহার করি তাকে ডেটা বলে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয় রেকর্ড, আবার রেকর্ডের প্রতিটি উপাদান হচ্ছে ফিল্ড। নিচে ডেটা, ফিল্ড এবং রেকর্ড এর উদাহরণ দেয়া হলো-

রোল নং	নাম	শ্রেণি	বয়স
৬৩	আলভী	কেজি	৬ বছর

এখানে, রোল নং, নাম, শ্রেণি, বয়স-এগুলো হলো এক একটি ফিল্ড। ৬৩, আলভী, কেজি, ৬ বছর-এগুলো প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ডেটা। সকল ফিল্ড / ডেটা একত্রে হলো রেকর্ড।

৬.১.১ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database management system-DBMS):

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (**DBMS**) হচ্ছে এমন একটি প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি (সফটওয়্যার) যা ডেটাবেজ তৈরি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনার কাজ করে। এ সফটওয়্যার ডেটাবেজ এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে মিডিয়া / যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে, সাধারণ থেকে দক্ষ সকল ব্যবহারকারি ডেটাবেজ ব্যবহার করে থাকে। এ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অতি সহজে ডেটাবেজ তৈরি করা যায়, প্রয়োজনে নতুন রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা যায়, রেকর্ডগুলোকে ইচ্ছামতো সর্টিং বা ইন্ডেক্সিং করা যায়। একাধিক টেবিলের মধ্যে লিংকড করা যায়।

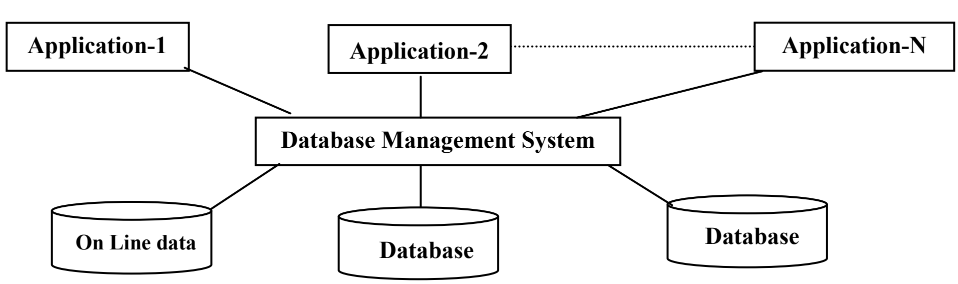

চিত্র: ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৬.১.২ DBMS-এর কাজ: কোনো তথ্য বা রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রথমেই আমাদের ডেটাবেজ তৈরি করতে হয়। অতপর ডেটা টেবিলে ডেটা / রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কাজটি করে থাকে। অনেক সময় অযাচিত ব্যক্তি কর্তৃক ডেটাবেজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে, বিভিন্ন প্রকার সফট্ওয়্যার (ভাইরাস) দ্বারাও ডেটাবেজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সুতরাং ডেটাবেজের নিরাপত্তা রক্ষা করে ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বিভিন্ন কারণে আমাদের ডেটাবেজে রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দিতে হয়। যেমন-জন্ম এবং মৃত্যর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ডেটাবেজ তৈরি করা হলে শিশু জন্ম গ্রহণ করলে রেকর্ড যোগ করতে হবে এবং কেউ মারা গেলে ডেটাবেজ থেকে রেকর্ড বাদ দিতে হবে। ডেটাবেজ গ্রহণযোগ্য করার জন্য ডেটার বানান এবং সংখ্যার ভুল হওয়া চলবেনা। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের ডেটাবেজ পরিবর্তন করতে হয়- নতুন ফিল্ড যুক্ত বা কোনো ফিল্ড মুছে ফেলতে হয়। এ কাজগুলোও ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর সাহায্যে করা হয়। বিভিন্ন কারণে রেকর্ড পরিবর্তন করতে হয় যেমন- কারো বয়স, পেশা, বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদি পরিবর্তনশীল মান। ডেটাবেজে রেকর্ডগুলো কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো ফিল্ড অনুযায়ী সাজানো থাকলে খুব সহজে কোনো নির্দিষ্ট রেকর্ড খুজে বের করা যায়। রেকর্ডসমূহ সাজানো বা খুঁজে বের করার কাজও এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে করা যায়। একটি ডেটাবেজে অনেকগুলো ফিল্ড থাকে কিন্তু সব কাজে এদের প্রয়োজন হয় না। নির্দিষ্ট কিছু ফিল্ডের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফিল্ড নিয়ে সুন্দর রিপোর্ট তৈরি করা এবং চার্ট বা গ্রাফ ব্যবহার করে তথ্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কাজও এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে করা হয়।

৬.২ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

Relational Database Management System-RDBMS

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কতকগুলো প্রোগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত একটি সফ্টওয়্যার। অর্থাৎ যে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রেকর্ডগুলো বিভিন্ন টেবিলে / ফাইলে জমা হয় এবং কুয়েরির মাধ্যমে একাধিক ডেটাবেজের মধ্যে রিলেশনশীপ তৈরি করা যায় তাকে রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয়। এটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ফাইল নিয়ে গঠিত। ডেটাবেজ তৈরি, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল হলো আধুনিক ডেটাবেজ টেকনোলজির ভিত্তি। ১৯৭০ সালে এডগার কড (Edgar Codd) সর্বপ্রথম রিলেশনযুক্ত ডেটাবেজ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর প্রবর্তিত ডেটাবেজকে চমৎকার গাণিতিক সূত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেলে ডেটার তিনটি দিক রয়েছে। যথা–

(i) ডেটা স্ট্রাকচার (Data Structure)
(ii) ডেটা ইন্টিগ্রিটি (Data Integrity) ও
(iii) ডেটা ম্যানিপুলেশন (Data Manipulation) ।

রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করার জন্য বাজারে অনেক সফটওয়্যার আছে। যথা:

- মাইক্রোসফট অ্যাকসেস (Microsoft Access)
- ওরাকল (Oracle)
- ডিবেজ (Dbase)
- মাইক্রোসফট ভিজুয়্যাল বেসিক (Microsoft Visual Basic)
- মাইক্রোসফট ভিজুয়্যাল ফক্সপ্রো (Microsoft Visual Foxpro)
- পাওয়ার বিল্ডার (Power Builder)
- ডেলফি (Delphi)
- ইনফরমিক্স (Informix) ইত্যাদি।

৬.২.১ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য Characteristics of RDBMS

রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে এর চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- সহজে টেবিল তৈরি করে ডেটা এন্ট্রি করা যায়।
- ডেটা ভ্যালিডেশনের সাহায্যে ডেটা এন্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- সংখ্যাবাচক ডেটাসমূহে সূক্ষ্ম গাণিতিক কাজ করা যায়।
- সহজে অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার/প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়।
- ডেটার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করা এবং ছবি সংযোজন করে আকর্ষণীয় রিপোর্ট তৈরি করা যায়।
- ব্যবহারকারি সহজে এক ডেটাবেজ থেকে অন্য ডেটাবেজের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।
- ব্যবহারকারি তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যকে খুঁজে বের করতে পারে অতি সহজে।
- সহজে নানা ফরমেটের রিপোর্ট ও লেবেল তৈরি ও তা মুদ্রণ করা যায়।
- উইন্ডোজের গ্রাফিক্যাল (Object Linking and Embedding) সুযোগ ব্যবহার করে রিপোর্টে গ্রাফিক্স সমন্বয় সাধন এবং গ্রাফিক্যাল ডেটা এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা যায়।
- সহজে অন্যান্য প্রোগ্রাম (যেমন- ডিবেজ, ফক্সপ্রো, এক্সেল ইত্যাদি) থেকে তথ্য বা ডেটা এনে ব্যবহার করা যায় এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের ফাইলের সাথে রিলেশন (Link) স্থাপন সম্ভব হয়।

৬.২.২ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ব্যবহার (Use of RDBMS)

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়-

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
- হাসপাতালে রোগীদের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্যে
- এয়ার লাইসেন্স টিকিটিং ও ফ্লাইটের সিডিউলিং এর ক্ষেত্রে
- ব্যাংক ও বিমায় গ্রাহকদের হিসাব-নিকাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
- বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্যে
- রেলওয়ে, বিমানের টিকিটিং ও রেলগাড়ির সিডিউলিং এর ক্ষেত্রে
- জনসংখ্যা তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা ও জরিপমূলক কাজে
- কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাসের ক্ষেত্রে।
- ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইলেকট্রনিক্স কমার্সে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরিতে

৬.৩ ডেটাবেজ তৈরি (Creating Database)

ডেটাবেজ উইন্ডো পরিচিতি: প্রথমে প্রোগ্রাম ফাইল থেকে মাইক্রোসফট এক্সেস সিলেক্ট করলে নিচের উইন্ডোটি দেখা যাবে-

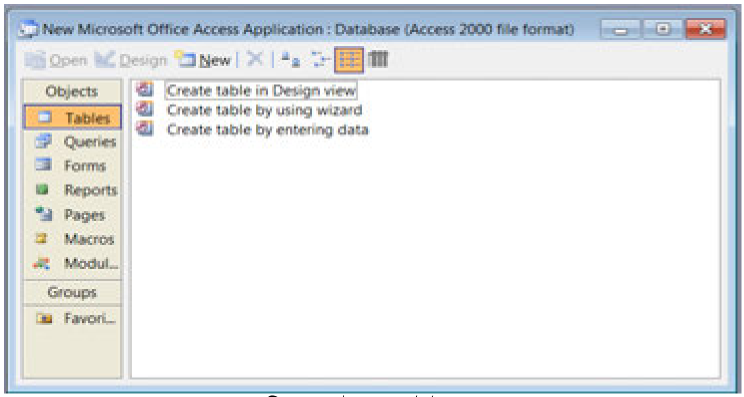

চিত্র: ডেটাবেজ উইন্ডো

ডেটাবেজ উইন্ডোতে অনেকগুলো ট্যাব থাকে। বিভিন্ন ট্যাবের আওতায় ডেটাবেজ টেবিলসমূহ ও অন্যান্য অবজেক্টগুলো ধারণ করে যে জাতীয় অবজেক্ট তৈরি করা হবে, ডেটাবেজ উইন্ডো থেকে সে জাতীয় ট্যাব নির্বাচন করে নিতে হয়। নিচে ডেটাবেস উইন্ডোর বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো-

Tables : এ ট্যাবের আওতায় টেবিলগুলো সংরক্ষিত থাকে। এখান থেকে কোনো টেবিল পরিবর্তন, সংশোধন, কিংবা নতুন ডেটাবেজ তৈরি করা যায়।

Queries: এ ট্যাব থেকে বর্তমান ডেটাবেজের সকল কুয়েরির তালিকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে কোনো কুয়েরি পরিচালনা করা, কুয়েরি পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন কোনো কুয়েরি তৈরি করা যায়।

Forms : এ ট্যাব থেকে বর্তমান ডেটাবেজের সকল রিপোর্ট ও ফর্ম পাওয়া যাবে। রিপোর্ট হচ্ছে ব্যবহারকারির পছন্দ মতো ফর্মেট তথ্যাবলি প্রদর্শন বা মুদ্রণ করা। এখান থেকে কোনো রিপোর্ট সংশোধন বা কোনো নতুন রিপোর্ট তৈরি করা যায়।

Page : ইন্টারনেট বা ইন্ট্রানেট-এ মাইক্রোসফ্‌ট এ্যাকসেস বা SQL সার্ভারে সংরক্ষিত ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য ডেটাবেজ access page তৈরি করা যায়।

Macro: ম্যাক্রো হচ্ছে এক ধরনের ছোট প্রোগ্রাম। এ ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডেটাবেজের সকল ম্যাক্রো প্রোগ্রামগুলোর তালিকা আসবে। এখান থেকে কোনো ম্যাক্রো সংশোধন বা নতুন ম্যাক্রো তৈরি করা যায়।

Module: প্রোগ্রামের এক বা একাধিক প্রসিডিউরকে এক একটি মডিউল বলা হয়। Module ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডেটাবেজের প্রোগ্রামিং মডিউলগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় কোড লিখা যায় বা সংশোধন করা যায়। কোড লিখার জন্য ভিজুয়্যাল বেসিক এডিটর ব্যবহৃত হয়।

ডেটাবেজ হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি টেবিল আবার কতকগুলো রেকর্ড নিয়ে গঠিত। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো ফিল্ড মিলে গঠিত হয় রেকর্ড। সুতরাং ফিল্ড হচ্ছে ডেটাবেজের ভিত্তি। কোনো টেবিল তৈরি করার পূর্বে টেবিলের প্রত্যেকটি রেকর্ডে কি কি ফিল্ড থাকবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রত্যেকটি ফিল্ডে কী ধরনের ডেটা থাকবে অর্থাৎ ডেটা টাইপ কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। কোনো ডেটাবেজে কি কি ফিল্ড থাকবে তা নির্ভর করবে ডেটাবেজের উদ্দেশ্য বা ডেটাবেজে কী ধরনের ডেটা থাকবে তার উপর।

৬.৩.১ ডেটা টাইপ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচুর ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয়। এ ডেটার টাইপ বা প্রকৃতি আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা-টেক্সট বা ক্যারেক্টার, নাম্বার বা নিউমেরিক, ইয়েস/ নো বা যুক্তিমূলক, তারিখ/ সময়, মেমো, কারেন্সি ইত্যাদি। নিম্নে ডেটার বিভিন্ন টাইপ বর্ণনা করা হলো -

(i) টেক্সট / ক্যারেক্টার (Text/Character): বেশিরভাগ ডেটাবেজে ব্যবহৃত প্রধান Data Type হলো Text। টেক্সট/ক্যারেক্টার ফিল্ডে অক্ষর, সংখ্যা, চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। সাধারণত এ ফিল্ডে সর্বোচ্চ **২৫৫**টি বর্ণ/ অঙ্ক/ চিহ্ন এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে, সংখ্যা ব্যবহার করলেও এ ডেটার উপর গাণিতিক কাজ করা যায় না।

(ii) নাম্বার / নিউমেরিক (Number/Numeric): যে ফিল্ডে গাণিতিক ডেটা ব্যবহার করা হয়, সেই ফিল্ডকে প্রকাশ করার জন্য নাম্বার ব্যবহৃত হয়। নাম্বার/ নিউমেরিক ফিল্ডে যোগ বা বিয়োগ চিহ্নসহ/ ছাড়া পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশ মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ব্যবহার করা যায়। এ ফিল্ডের ডেটার উপর গাণিতিক অপারেশন (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) করা যায়। ডেটার মানের ব্যাপ্তির (Range) উপর ভিত্তি করে নাম্বার/ নিউমেরিক ফিল্ডকে সাধারণত বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বাইট (Byte),

২. ইন্টিজার (Integer),

৩. লং ইন্টিজার (Long Integer),

৪. সিংঙ্গল (Single),

৫. ডবল (Double)

৬. রেপ্লিকেশন আইডি (Replication Id) ইত্যাদি।

(iii) অটো নাম্বার (Auto number): এটি একটি নিউমেরিক / নাম্বার ডেটা টাইপ। এটি সিরিজ জাতীয় বা ধারাবাহিক ডেটার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ ডেটা টাইপের সুবিধা হচ্ছে এতে ডেটা এন্ট্রি করতে হয় না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা এন্ট্রি হয়।

(iv) লজিক্যাল ডেটা: যুক্তিনির্ভর ফিল্ডের ডেটা টাইপ প্রকাশ করার জন্য Yes / No ব্যবহৃত হয়। কোনো ফিল্ডের মান 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এ দুটি তথ্য এ ফিল্ডে সংরক্ষণ করা যায়। সত্য / মিথ্যা বা হ্যাঁ / না তথ্যের জন্য

* True / False

* Yes / No

* On / Off ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

এ ফিল্ডকে অনেক প্রোগ্রামের বুলিয়ান ফিল্ডও বলা হয়। এ ফিল্ডের জন্য মেমোরিতে **১** বাইট জায়গা প্রয়োজন।

(v) তারিখ ও সময় (Date/ Time): এ ফিল্ডটি তারিখ বা সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ১০০ থেকে ৯৯৯৯ বছরের তারিখ ও সময়ের জন্য এ ফিল্ড ব্যবহৃত হয়। এ ফিল্ডের জন্য মেমরিতে ৮ বাইট জায়গা প্রয়োজন। তারিখ ও সময় বিভিন্ন ফরমেটে হতে পারে। যেমন-

ফরমেট	বর্ণনা	উদাহরণ
General Date	Date/ Time ফরমেটের Default সেটিং হলো General Date- এ ফরমেটে তারিখ ও সময় যেমন এন্ট্রি করা হবে ঠিক তেমনই প্রদর্শিত হবে। তবে শুধুমাত্র তারিখ এন্ট্রি করলে শুধুমাত্র তারিখ এবং শুধুমাত্র সময় এন্ট্রি করলে শুধুমাত্র সময় প্রদর্শিত হবে। আর তারিখ ও সময় একত্রে এন্ট্রি করলে তারিখ ও সময় উভয়ই প্রদর্শিত হবে।	4/3/13, 05:34:00 PM or 4/3/13 05:34:00 PM
Long Date	দিনের নাম, মাসের নামসহ (কথায়) তারিখ প্রদর্শনের জন্যে এ অপশন সিলেক্ট করতে হবে।	Saturday, April 3, 2013
Medium Date	মাসের নাম সংক্ষেপে (কথায়) প্রকাশসহ তারিখ প্রদর্শন করার জন্য এ অপশন সিলেক্ট করতে হয়।	3-Apr-13.
Short Date	দিন, মাস এবং সালকে সংখ্যায় প্রদর্শনের জন্য এ অপশন সিলেক্ট করতে হয়।	4/3/13
Long Time	সময়ের সাথে AM বা PM সহ পূর্ণ সময় (ঘণ্টা-মিনিট সেকেন্ড) প্রদর্শনের জন্য এ অপশন সিলেক্ট করতে হয়।	5:25:27 PM
Medium Time	AM বা PMসহ সেকেন্ড বাদে সময় প্রদর্শনের জন্য এ অপশন সিলেক্ট করতে হয়।	5:58 PM
Short Time	দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাভিত্তিক সময় প্রদর্শনের জন্য এ অপশন সিলেক্ট করতে হয়। যেমন-রাত একটাকে প্রকাশ করবে 01:00 এবং বেলা একটাকে প্রকাশ করবে 13:00	13:00

(vi) মেমো (Memo):

Memo, Text এর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত বর্ণনামূলক লেখা বা বর্ণনার জন্য এ ফিল্ড ব্যবহার করা হয়। এ ফিল্ডের ধারণ ক্ষমতা কম্পিউটার ডিস্কের ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সাধারণত এ ফিল্ডে ৬৫,৫৩৬টি ক্যারেক্টর লেখা যায়।

(vii) কারেন্সি (Currency):

মুদ্রা বা টাকার অঙ্ক ইনপুট করার জন্য $ ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র মুদ্রা বা টাকা সংক্রান্ত ডেটা এন্ট্রি করার জন্য Currency টাইপ সিলেক্ট করতে হয়। এ ফিল্ডের ডেটার উপর গাণিতিক অপারেশন সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এ ফিল্ডের জন্য মেমোরিতে ৮ বাইট জায়গা প্রয়োজন।

(viii) OLE Object: যেসব তথ্য ডেটাবেজ নয় এমন সফটওয়্যারে আছে এবং লিংক এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটাবেজে নেয়ার ক্ষেত্রে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- মাইক্রোসফট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি প্রোগ্রাম হতে ডেটাবেজে নেয়ার জন্য এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

(ix) Hyperlink: সাধারণত ডেটাবেজ প্রোগ্রামের সাথে ওয়েব পেজের কোনো ফইল কিংবা অন্য কোনো ব্যবহারিক প্রোগ্রামের ফাইল লিংক করার জন্য এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

(x) Look up wizard: সরাসরি কোনো ডেটা এন্ট্রি না করে কোনো লিস্ট থেকে ডেটা নির্বাচন করে ডেটা ইনপুট করার জন্য এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

ডেটা টেবিলে ফিল্ডের নামকরণ: টেবিল ট্যাগ সিলেক্ট করে ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটি আসবে-

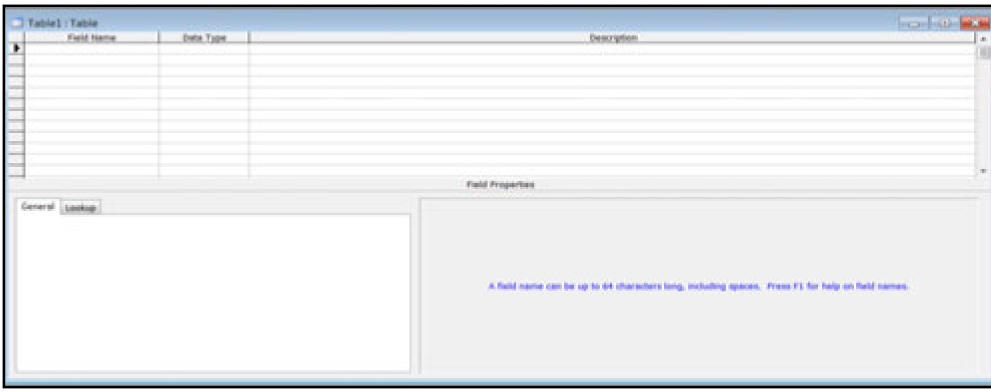

চিত্র: টেবিল উইন্ডো

এখানে টেবিলের জন্য প্রয়োজনীয় ফিল্ডের নাম এবং ডেটাইপ লিখতে হয়। সকল ফিল্ডের নাম এবং ডেটা টাইপ লিখা শেষ হলে পছন্দ মতো নামে (ধরি, টেবিলের নাম- Student) টেবিলটি সংরক্ষণ করতে হয়।

কাজ: রোল, নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, জেলা ফিল্ড যুক্ত একটি ডেটা টেবিল তৈরি কর। টেবিলটি Table-1 নামে সংরক্ষণ কর।

৬.৩.২ ডেটাবেজের কাঠামো পরিবর্তন করা

ডেটাবেজ তৈরি হওয়ার পর এর কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। এ পর্যায়ে নতুন ফিল্ড যুক্ত করা কিংবা কোনো ফিল্ড বাদ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ফিল্ডের ক্রম পরিবর্তনও এ পর্যায়ে করা যায়। ডেটাবেজে সাধারণত যেসব পরিবর্তন করা হয় তা হলো–

- ডেটাবেজ বা টেবিলের নাম পরিবর্তন।
- কোনো টেবিল যুক্ত করা বা বাদ দেয়া।
- ফিল্ডের ডেটা টাইপ পরিবর্তন করা।
- ফিল্ড সাইজ পরিবর্তন করা।
- ফিল্ড বাদ দেয়া।
- নতুন ফিল্ড যোগ করা।

৬.৩.৩ ডেটাবেজের গঠন পরিবর্তন করার পদ্ধতি

- যে ডেটাবেজের টেবিলের ফিল্ডের প্রোপার্টিজ পরিবর্তন করতে হবে সে ডেটাবেজটি ওপেন করে টেবিলটি সিলেক্ট করতে হবে।
- ডেটাবেজ উইন্ডোর ডিজাইন বাটনে ক্লিক করতে হবে।
- যে ফিল্ডের প্রোপার্টিজ পরিবর্তন করতে হবে সে ফিল্ডটি সিলেক্ট করতে হবে।
- প্রোপার্টিজ উইন্ডো থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে।
- পুনরায় ডেটাবেজটি সেভ করতে হবে।

ডেটাবেজে নতুন ডেটা যোগ করা:

কোনো ডেটাবেজের অধীনে ডেটা টেবিল তৈরি করে তাতে ডেটা এন্ট্রি করা যায়। টেবিলে ডেটা যোগ করার পদ্ধতি হলো-

- ডেটাবেজটি ওপেন করতে হবে।
- টেবিল ট্যাবে ক্লিক করে প্রদর্শিত তালিকা থেকে ডেটা টেবিলটি (ডাবল ক্লিক করে) ওপেন করতে হবে।
- টেবিলের সর্বশেষ রেকর্ডের নিচে সারিতে প্রথম ফিল্ডে ক্লিক করে নতুন ডেটা এন্ট্রি করতে হবে।
- টেবিলটি ক্লোজ করে বের হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হয়ে যাবে।

ডেটাবেজ সম্পাদনা: একটি ডেটাবেজ তৈরি করে তাতে ডেটা সন্নিবেশিত করার পর ডেটাবেজ ফাইলটির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ডেটাবেজের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো ফিল্ড বাদ পড়ল কি না, কোনো ফিল্ড বাদ দেয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, কোনো বানান ভুল হয়েছে কিনা, ফন্টের আকার বা স্টাইল পরিবর্তন করা ইত্যাদি ডেটাবেজ সম্পাদনার অংশ।

কাজ: নামের ডেটা টেবিলে Address ফিল্ড যুক্ত কর। ডেটা টেবিলে ৫টি রেকর্ড যোগ কর।

৬.৪ কুয়েরি (Query)

ডেটাবেজ হচ্ছে তথ্যের বিশাল সংগ্রহ। এ ডেটার ভাণ্ডার থেকে কোনো নির্দিষ্ট ডেটা বা ডেটা গ্রুপকে আলাদা করে প্রদর্শন বা ছাপানোর প্রয়োজন হতে পারে। কোয়েরির সাহায্য নিলে এ কাজটি খুব সহজে করা যায়। কোয়েরির সাহায্যে নির্দিষ্ট ফিল্ডের ডেটা, নির্দিষ্ট গ্রুপের ডেটা, নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে প্রদর্শন ও ছাপিয়ে উপস্থাপন করা যায়। কোয়েরিতে এক্সপ্রেশন, অপারেটর, ফিল্টার ইত্যাদি ব্যবহার করে পছন্দমতো ডেটা নির্বাচন করা যায়।

সিলেক্ট কোয়েরি (Select Query): কোনো ডেটা টেবিলের ফিল্ড বা কলাম নির্বাচন করে যে কোয়েরি করা হয় তাকে সিলেক্ট কোয়েরি বলা হয়।

প্যারামিটার কোয়েরি (Parameter Query): ডায়লগ বক্সের তথ্য পূরণ করে যে কোয়েরি করা হয় তাকে প্যারামিটার কোয়েরি বলে।

ক্রসট্যাব কোয়েরি (Crosstab Query):

শর্তারোপ করে কোয়েরিকৃত ফলাফলের সামারি আকারে প্রদর্শনের জন্য যে কোয়েরি করা হয় তাকে, ক্রসট্যাব কোয়েরি বলে।

অ্যাকশন কোয়েরি (Action Query):

কোনো কোয়েরি ফলাফল যখন ডেটাবেজের ডেটার মানের পরিবর্তন করে তাকে অ্যাকশন কোয়েরি বলে। যেমন- কোনো ডেটার পরির্বতনের জন্য Update Query, নতুন রেকর্ড যুক্ত করার জন্য Append Query, ফলাফল টেবিল থেকে মুছে ফেলার জন্য Delete Query, ফলাফল দিয়ে নতুন টেবিল তৈরির জন্য Make Table Query ব্যবহার করা হয়।

৬.৪.১ SQL কোয়েরি

SQL এর পূর্ণ রূপ হলো Structured Query Language- এটি একটি শক্তিশালী ডেটা মেনিপুলেশন এবং ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। এগুলো এক বা একাধিক ডেটাবেজ, টেবিল, কলাম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ SQL স্টেটমেন্টই ফলাফল হিসাবে একসেট রেকর্ড প্রদান করে। SQL কোয়েরি নিম্নোক্ত চার ধরনের হতে পারে-

- Union Query.
- Pass-through Query.
- Data Definition Query.
- Sub-query.

SQL ইংরেজি ভাষার কাছাকাছি একটি কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ। SQL একটি non-procedural ল্যাঙ্গুয়েজ। যে তথ্যাবলি দরকার কেবল তা বলে দিলেই হয়, কীভাবে কোয়েরি করা যাবে তা বলার দরকার হয় না। SQL একসাথে একটি রেকর্ড প্রসেস না করে বরং এক সেট রেকর্ড প্রসেস করে।

ডেটা ডেফিনেশন/ডেসক্রিপশন ল্যাংগুয়েজ (Data Definition/Description Language-DDL): ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে ডেটা ডেফিনেশন/ডেসক্রিপশন ল্যাংগুয়েজ বা DDL খুবই গুরত্বপূর্ণ। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডেটাবেজ ফাইল তৈরি, ডেটাবেজ ফাইল পরিবর্তন, ডেটাবেজ ফাইল ডিলিট করার কাজে ডেটা ডেফিনেশন/ডেসক্রিপশন ল্যাংগুয়েজ (Data Definition/Description Language-DDL) ব্যবহার করা হয়।

ডেটা ডেফিনেশন/ডেসক্রিপশন ল্যাংগুয়েজগুলো হলো-

- ডেটাবেজে ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় টেবিল তৈরি করা,
- টেবিল পরিবর্তন করা,
- টেবিল ডিলেট বা বাদ দেয়া,

DDL এ SQL এর ব্যবহার:

টেবিল তৈরিতে-

গঠন: SQL > CREATE TABLE <table name> (colum-1 definition, colum-2 definition, ... Colum- n definition)

উদাহরণ: SQL > CREATE TABLE student (Roll NUMBER (3), Name CHAR (50), Address CHAR (100)

ব্যাখ্যা: এখানে student নামের একটি টেবিল তৈরি হবে যার Roll, Name, Address নামের তিনটি কলাম থাকবে- টেবিলের নাম: student

Roll	Name	Address

টেবিল এর গঠন পরিবর্তন করতে:

গঠন: SQL > ALTER TABLE <table name> ADD/ DROP Column definitions

উদাহরণ: SQL > ALTER TABLE student ADD Age NUMBER (3)

ব্যাখ্যা: এখানে student নামের টেবিলে Age নামের একটি কলাম যোগ হবে।

Roll	Name	Address	Age

টেবিল ড্রপ/ ডিলিট করতে:

গঠন: SQL > DROP TABLE <table name>

উদাহরণ: SQL > DROP TABLE student

ব্যাখ্যা: এখানে student নামের টেবিলটি মুছে যাবে।

ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাংগুয়েজ (Data Manipulation Language-DML) DML):

ডেটাবেজে ডেটা ইনসার্ট (Insert) আপডেট (Update) ও ডিলেট (Delete) করার জন্য ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাংগুয়েজ বা DML ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ DML এর সাহায্যে ডেটাবেজে নিম্নলিখিত তিনটি কাজ করা যায়।

১. ডেটাবেজ এ নতুন কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা: ইনসার্ট অপারেশন (Insert)।
২. ডেটাবেজ থেকে ডেটা মুছে ফেলা: ডিলেট অপারেশন (Delete)।
৩. ডেটাবেজ থেকে ডেটা আপডেট করা: আপডেট অপারেশন (Update)।

DML এ SQL এর ব্যবহার:

ডেটাবেজে নতুন রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করতে:

গঠন: INSERT INTO <Table name> VALUES (Value1, Value2, Value3…)

উদাহরণ: INSERT INTO student VALUES (063, æAlvie”, æ28, Shahajadpur, Dhaka”, 06))

ব্যাখ্যা: student নামের টেবিলে 063, Alvie, 28, Shahajadpur, Dhaka, 06 মান দ্বারা নতুন রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত হবে।

Roll	Name	Address	Age
063	Alvie	28, Shahajadpur, Dhaka	06

ডেটাবেজে রেকর্ড পরিবর্তন / আপডেট করতে:

গঠন: UPDATE <Table name> SET Colum= <New value> WHERE Condition

উদাহরণ: UPDATE student SET Age= 05 WHERE Roll=063

ব্যাখ্যা: Student নামের টেবিলে Age= 05 পরিবর্তন করা হবে যে রেকর্ডের Roll= 063

Roll	Name	Address	Age
063	Alvie	28,Shahajadpur,Dhaka	05

ডেটাবেজের কোনো রেকর্ড মুছে ফেলা / ডিলিট করতে:

গঠন: DELETE FROM <Table name> WHERE Condition

উদাহরণ: DELETE FROM student WHERE Roll=063

ব্যাখ্যা: Student নামের টেবিলে যে রেকর্ডের Roll= 063 সে রেকর্ডটি ডিলিট হবে–

Roll	Name	Address	Age

এখানে, WHERE **ব্যবহার না করলে সম্পূর্ণ টেবিল মুছে যাবে।**

কাজ: Table1 নামের টেবিল থেকে একটি রেকর্ড মুছে ফেল এবং একটি রেকর্ড পরিবর্তন কর।

কোয়েরি এক্সপ্রেশন:

যেকোনো কোয়েরি তৈরি করতে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা হয়। এ এক্সপ্রেশনের উপর ভিত্তি করে কোয়েরি ফলাফল নির্বাচিত করে। এক্সপ্রেশন তৈরি করার জন্য সাধারণত Literal, Constant ব্যবহৃত হয়।

Literal: যেসব ভ্যালুকে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে সেই ভ্যালু হিসাবে বিবেচনা করে তাকে Literal বলে। কোনো ভ্যালুকে Literal হিসাবে ঘোষণা করতে–

- টেক্সট এর ক্ষেত্রে ডাবল কোটেশন দিতে হয় । যেমন- æDhaka”
- তারিখের ক্ষেত্রে # দ্বারা আবদ্ধ করতে হয় । যেমন- # 04-09-2007 #
- সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো চিহ্ন দিতে হয় না সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

Constant: Constant হচ্ছে অপরিবর্তনীয় টেক্সট বা সংখ্যা। কোনো টেবিল এক্সপ্রেশন, কোয়েরি, ফর্ম, রিপোর্ট বা ম্যাক্রোতে ব্যবহার করা যায়। এক্সপ্রেশন বিল্ডার নিচের Constant ভ্যালু ব্যবহার করতে পারে।

- ”   ” কোনো ফাঁকা স্ট্রিং এর সাথে ম্যাচিং করে।
- Null যেকোনো ফাঁকা এক্সপ্রেশনের সাথে ম্যাচিং করে।
- False কোনো লজিকের এক্সপ্রেশনের ফলাফল মিথ্যা হলে তার সাথে ম্যাচিং করে।
- True কোনো লজিকের এক্সপ্রেশনের ফলাফল সত্য হলে তার সাথে ম্যাচিং করে।

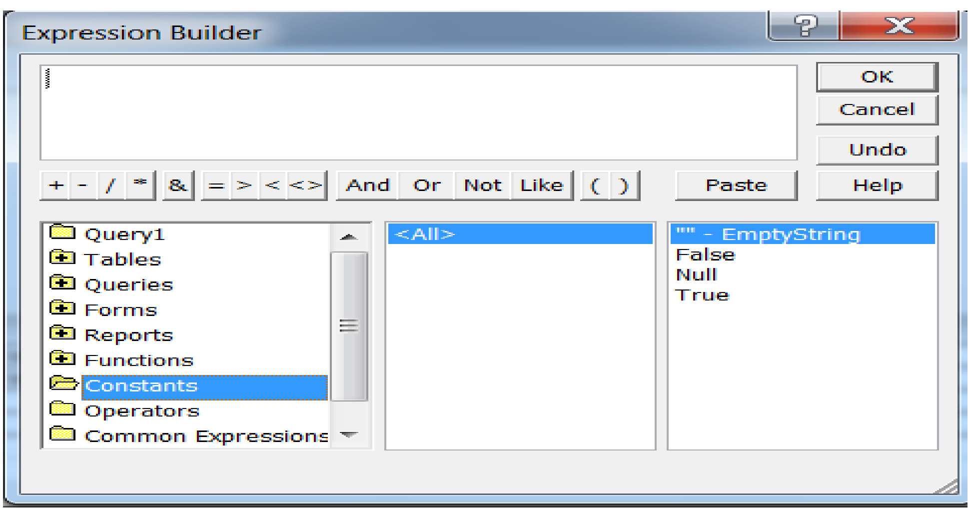

চিত্র: এক্সপ্রেশন বিল্ডার।

৬.৪.২ অপারেটর

এক্সপ্রেশন তৈরি করতে অপারেটর ব্যবহৃত হয়। অপারেটরগুলোকে সাধারণত নিম্নোক্ত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-

- Arithmetic অপারেটর
- Comparison অপারেটর
- Concatenation অপারেটর
- Logical অপারেটর
- Like অপারেটর
- Miscellaneous অপারেটর

Arithmetic অপারেটর:

নিউমেরিক এক্সপ্রেশন তৈরি করতে Arithmetic অপারেটর ব্যবহার করা হয়। যেমন - যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

অপারেটর	বর্ণনা
+	যোগ চিহ্ন।
-	বিয়োগ চিহ্ন।
*	গুণন চিহ্ন।
/	ভাগ হিহ্ন।
\	পূর্ণ সংখ্যায় ভাগফল নির্ণয়ের জন্য।
Mod	২ টি সংখ্যাকে ভাগ করে ভাগশেষ প্রকাশ করে।
()	গ্রুপ এক্সপ্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
^	এক্সপোনেনেশিয়ার।

Comparison অপারেটর:

দুটি এক্সপ্রেশনের মধ্যে তুলনা করতে Comparison অপারেটর ব্যবহৃত হয়। একে রিলেশনাল অপারেটরও বলা হয়। কোনো নির্দিষ্ট ডেটাকে খুঁজে বের করার জন্য Comparison অপারেটর ব্যবহার করা হয়। Comparison অপারেটর লজিক্যাল ফলাফল প্রকাশ করতেও ব্যবহৃত হয়।

অপারেটর	বর্ণনা
=	সমান চিহ্ন।
>	অপারেটরের বাম অংশ ডান অংশের চেয়ে বড়।
>=	অপারেটরের বাম অংশ ডান অংশের চেয়ে বড় অথবা সমান।
<	অপারেটরের বাম অংশ ডান অংশের চেয়ে ছোট।
<=	অপারেটরের বাম অংশ ডান অংশের চেয়ে ছোট অথবা সমান।
<>	সমান নয়/ অসমান।
Between .. And	রেঞ্জ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Concatenation অপারেটর:

দুটি স্ট্রিংকে যোগ করার জন্য Concatenation অপারেটর ব্যবহার করা হয়। & চিহ্ন হচ্ছে Concatenation অপারেটর। + চিহ্ন দ্বারাও দুটি স্ট্রিংকে যোগ করা যায়।

যেমন- ফলাফল = স্ট্রিং ১ & স্ট্রিং ২ অথবা,

ফলাফল = স্ট্রিং ১ + স্ট্রিং ২

Logical অপারেটর:

অপেক্ষাকৃত জটিল এক্সপ্রেশন তৈরির জন্য লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়। এটি দুটি এক্সপ্রেশনকে একত্র করে এবং এক্সপ্রেশনটি সত্য বা মিথ্যা মূল্যায়ন করে।

অপারেটর	বর্ণনা
And	উভয় শর্ত সত্য হতে হবে।
Or	দুটি শর্তের কমপক্ষে একটি শর্ত সত্য হতে হবে।
Not	এক্সপ্রেশনকে মূল্যায়ন করলে শর্তাবলি অবশ্যই মিথ্যা হতে হবে।
Eqn	দুটি এক্সপ্রেশনকে Bitwise তুলনা করে। এটি প্রোগ্রামিং এ ব্যবহৃত হয়।
Imp	দুটি নিউমেরিক এক্সপ্রেশনের মধ্যে লজিক্যাল Implecation সম্পাদন করে।
()	গ্রুপ এক্সপ্রেশনের জন্য।

Like অপারেটর:

? (প্রশ্নবোধক) চিহ্ন এবং * (ওয়াইল্ড কার্ড) চিহ্নের সাথে **Logical** অপারেটর ব্যবহার করা হয়।

অপারেটর	বর্ণনা
*	যেকোনো ধরনের এক বা একাধিক ক্যারেক্টারের সাথে ম্যাচিং করে।
?	যেকোনো ধরনের একক ক্যারেক্টারের সাথে ম্যাচিং করে।

Common এক্সপ্রেশন:

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সচরাচর ব্যবহারযোগ্য কতিপয় Common এক্সপ্রেশন রয়েছে। কমন এক্সপ্রেশনগুলো নিচের চিত্রে দেখানো হলো-

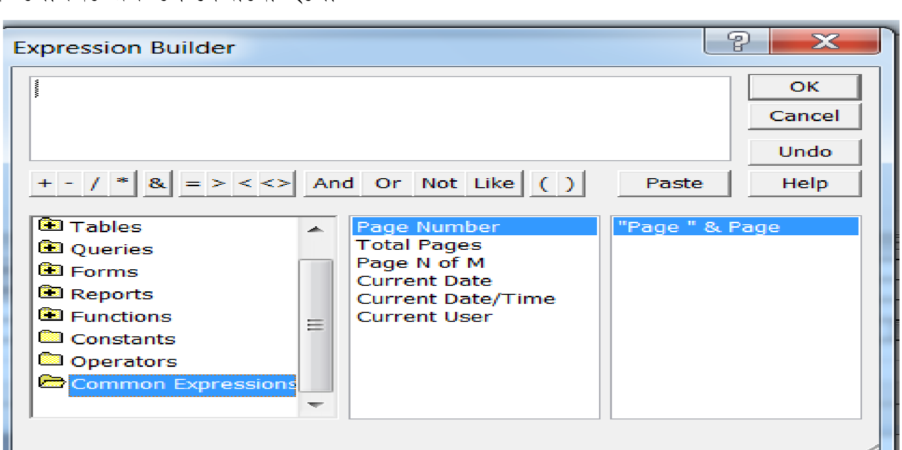

চিত্র: এক্সপ্রেশন বিস্তার।

Common এক্সপ্রেশনসমূহের বর্ণনা:

Page Number: পৃষ্ঠা নম্বর দেয়ার জন্য এ এক্সপ্রেশনটি ব্যবহার করা হয়।

Total Pages: কোনো ফর্ম বা রিপোর্টে মোট পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান করে।

Current Date: এ এক্সপ্রেশনটি Date () ফাংশনটি ব্যবহার করে এবং বর্তমান তারিখ প্রদর্শন করে।

Current Date/ Time: এ এক্সপ্রেশনটি Now () ফাংশনটি ব্যবহার করে এবং ফরমেট অনুযায়ী বর্তমান তারিখ / সময় প্রদর্শন করে।

Current User: এটা Current User () ফাংশন ব্যবহার করে।

৬.৫ সর্টিং (Sorting)

ডেটাবেজের রেকর্ডগুলোকে এদের মানের ক্রমানুসারে সাজানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে সর্টিং। যেকোনো এক বা একাধিক ফিল্ড এর উপর ভিত্তি করে রেকর্ডগুলোকে সর্ট/ সাজানো যায়। সর্টিং বা সাজানো দুপ্রকার হয়ে থাকে- উচ্চক্রম/ উর্ধ্বক্রম/ আরোহী/ Ascending order এবং নিম্নক্রম/ অবরোহী/ Descending order. রেকর্ডগুলো সর্ট করা থাকলে ঐ ফিল্ড অনুযায়ী রেকর্ড খুঁজে বের করা সহজ এবং সময় কম লাগে। নিচের ২য় টেবিলটি জিপিএ এর ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে–

চিত্র: সর্টিং

Roll	Name	GPA
01	Radia	3.50
02	Alvie	5.00
03	John	4.50
04	Joyeta	5.00
05	Radit	4.90

১ম টেবিল (সর্টিং এর পূর্বে)

Roll	Name	GPA
02	Alvie	5.00
04	Joyeta	5.00
05	Radit	4.90
03	John	4.50
01	Radia	3.50

২য় টেবিল (সর্টিং এর পরে)

সর্টিং করার পদ্ধতি:

- যে ফিল্ডের উপর সর্টিং করা হবে সেই ফিল্ডের উপর মাউস পয়েন্টার রাখতে হবে।
- মেনু বারের Record → Sort অপশন সিলেক্ট করে উচ্চক্রমের জন্য Ascending order অথবা নিম্নক্রমের জন্য Descending order সিলেক্ট করতে হবে।
- যে ফিল্ডের উপর সর্টিং করা হবে সেই ফিল্ডের উপর মাউসের ডান বাটন চেপেও Ascending order অথবা Descending order সিলেক্ট করা যায়।

৬.৬ ইনডেক্সিং (Indexing)

কোনো ফাইলের ডেটা ইন্ডেক্স করার অর্থ হচ্ছে সেই ফাইলের ডেটাকে আরোহী (Ascending) বা অবরোহী (Descending) অনুসারে ক্রমানুযায়ী সাজানো। ইনডেক্স হচ্ছে সুসজ্জিতভাবে বা সুবিন্যস্তভাবে তথ্যাবলির সূচি প্রণয়ন করা। ডেটাবেজ থেকে ব্যবহারকারি কোনো ডেটা যাতে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য ডেটাকে একটি বিশেষ অর্ডারে সাজিয়ে রাখা হয়। ডেটাবেজের টেবিলের রেকর্ডসমূহকে এরূপ কোনো লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকেই ইনডেক্স বলে। ডেটাবেজের এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করে Alphabetically বা Numerically সাজানো যায়।

চিত্রঃ ইনডেক্সিং

ইন্ডেক্স করার সময় যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়-

- সাধারণত কী ফিল্ডের উপর ইন্ডেক্স করতে হয় এবং ইন্ডেক্স এর একটি নাম দিতে হয়।
- ফিল্ডের নামের অনুরূপ নাম নির্বাচন করতে হয়। এতে ইন্ডেক্সসমূহ মনে রাখতে সুবিধা হয়।
- এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ইন্ডেক্স করা যায়। কোনো ডেটা টেবিলে এক বা একাধিক ইন্ডেক্স থাকতে পারে বা একই সময়ে খোলা থাকতে পারে। কিন্তু একই সময়ে কেবল একটি ইন্ডেক্স সক্রিয় থাকবে এবং রেকর্ডসমূহ প্রদর্শনের অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করবে।

1	Karim
2	Zamil
3	Radia
4	Nizad
5	Alvie
6	Suman
7	Baby

5	Alvie
7	Baby
1	Karim
4	Nizad
3	Radia
6	Suman
2	Zamil

Record Number　　　　Key Field- Name Field

চিত্রঃ ইনডেক্সিং।

ইন্ডেক্সিংয়ের বড় সুবিধা হলো ইনডেক্স করার পরে ফাইলে সহজে ডেটা খুঁজে বের করা যায়। ইনডেক্স করার পরে ডেটাবেজ ফাইলে নতুন কোনো রেকর্ড ইনপুট করা হলেও ইনডেক্স ফাইলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে যায়। ডেটা টেবিলের রেকর্ডসমূহের উপর বিভিন্ন অপারেশন যেমন- Searching, Sorting, Reporting এবং Queries ইত্যাদি খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার জন্য ইনডেক্স করা হয়। অর্থাৎ ডেটাসমূহ ইনডেক্স করলে Speedy পারফরমেন্স পাওয়া যায়। ইনডেক্স ফাইল মূল ডেটাবেজ ফাইলের কোনোরূপ পরিবর্তন না করে বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে।

ডেটা টেবিলকে যদি একটি ফিল্ডের উপর ইনডেক্সিং করা থাকে তবে কোনো ডেটা এডিট করলে প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) ইনডেক্স আপডেট করে এবং এর জন্য খুবই অল্প পরিমাণ সময় লাগে। তবে যদি একাধিক ফিল্ডের উপর ইনডেক্সিং করা থাকে তাহলে কোনো ডেটা এডিট করলে ইনডেক্স আপডেট করার জন্য অনেকক্ষণ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়। একাধিক ফিল্ডের উপর এবং অনেক রেকর্ডের জন্য ইন্ডেক্স করা হলে অপেক্ষাকৃত বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ইনডেক্স সংরক্ষণের জন্যও কিছু বেশি জায়গা লাগে। ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে ইনডেক্স ফাইলের রেফারেন্সসমূহ আপডেট হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য ডেটা এন্ট্রি করতেও বেশি সময় লাগে। এ কারণে কেবলমাত্র সেসব ফিল্ডের উপরই ইনডেক্সিং করা উত্তম যা সচরাচর বিভিন্ন অপারেশন যেমন- Finds, Queries এবং Sorts ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ইন্ডেক্সিং করার পদ্ধতি:

- যে টেবিলে ইন্ডেক্সিংয়ের কাজ করা হবে সেই টেবিলটি ডিজাইন ভিউ মোডে ওপেন করতে হবে।
- যে ফিল্ডের উপর ইন্ডেক্সিং করা হবে সেই ফিল্ডের উপর মাউস পয়েন্টার রাখতে হবে।
- উইন্ডোর নিচের দিকে Field Properties থেকে General ট্যাব সিলেক্ট করতে হবে।
- Indexed অপশনের ড্রপ ডাউন অ্যারো ক্লিক করলে কিছু অপশন দেখা যাবে।
- Yes (No duplicates) সিলেক্ট করে পুনরায় ফাইলটি সেভ করতে হবে।

কাজ: ইন্ডেক্সিং ও সর্টিংয়ের মধ্যে ৫টি পার্থক্য লিখ।

৬.৭ ডেটাবেজ রিলেশন (Database Relation)

ডেটাবেজ একাধিক টেবিল নিয়ে গঠিত। ডেটাবেজের বিভিন্ন টেবিলের মধ্যকার লজিক্যাল সম্পর্ককে ডেটাবেজ রিলেশন বলে। এ রিলেশন একটি টেবিলের সাথে এক বা একাধিক টেবিল কিংবা রেকর্ডের মধ্যে হতে পারে। ডেটাবেজের রিলেশনের উপর ভিত্তি করে টেবিলের রেকর্ড সর্টিং, সার্চিং, কোয়েরি প্রভৃতি অপারেশন করা হয়।

রিলেশনশিপের ডিগ্রি (Degree of Relationship):

ডেটাবেজে রিলেশনশিপ তৈরি করার জন্য যে কয়টি এনটিটি বা টেবিল ব্যবহার করে তার সংখ্যাকেই রিলেশনশিপের ডিগ্রি বলা হয়। রিলেশনশিপের ডিগ্রি সাধারণত তিন ধরনের হতে পারে। যথা:

- ডিগ্রি ১ বা ইউনারি (Unary) রিলেশনশিপ
- ডিগ্রি ২ বা বাইনারি (Binary) রিলেশনশিপ
- ডিগ্রি ৩ বা টারনারি (Ternary) রিলেশনশিপ

ডিগ্রি ১ বা ইউনারি (Unary) রিলেশনশিপ:

ইউনারি রিলেশনশিপে শুধুমাত্র একটি এনটিটি/টেবিল অংশগ্রহণ করে। যেমন- মানুষ একটি এনটিটি। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে বিয়ে করে। কাজেই মানুষ এনটিটি নিজের সাথে নিজের রিলেশনশিপ তৈরি করেছে।

ডিগ্রি ২ বা বাইনারি (Binary) রিলেশনশিপ:

বাইনারি রিলেশনশিপে দু'টি এনটিটি/টেবিল অংশগ্রহণ করে। যেমন- ছাত্র ও শিক্ষক দুটি পৃথক এনটিটি বা টেবিল। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। কাজেই শিক্ষক এনটিটি ছাত্র এনটিটির সাথে বাইনারি রিলেশনশিপ তৈরি করেছে।

ডিগ্রি ৩ বা টারনারি (Ternary) রিলেশনশিপ:

টারনারি রিলেশনশিপে তিনটি এনটিটি/টেবিল অংশগ্রহণ করে। যেমন- বিক্রেতা, পণ্য ও ওয়্যারহাউজ তিনটি পৃথক এনটিটি বা টেবিল। বিক্রেতা ওয়্যারহাউজে পণ্য সরবরাহ করেন। কাজেই বিক্রেতা, পণ্য ও ওয়্যারহাউজ টারনারি রিলেশনশিপ তৈরি করেছে।

ডেটাবেজের বিভিন্ন টেবিলের মধ্যে নিম্নলিখিত রিলেশন হতে পারে-

1. One to One
2. One to Many
3. Many to Many

One to One:

যখন কোনো টেবিলের একটি রেকর্ডের জন্য অন্য টেবিলের একটি মাত্র রেকর্ড থাকে তখন তাকে One to One রিলেশন বলে। যেমন-একজন ছাত্রের কেবল একটি মাত্র রোল নং থাকতে পারে। এখানে একটি ছাত্রের সাথে একটি মাত্র রোল নং ম্যাচ করবে।

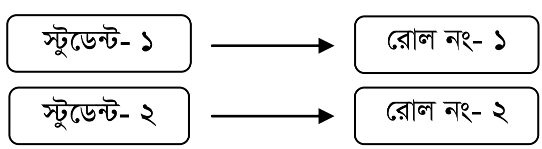

চিত্র: One to One Relation

One to Many:

যখন কোনো টেবিলের একটি রেকর্ডের জন্য অন্য টেবিলের একাধিক রেকর্ড থাকে তখন তাকে One to Many রিলেশন বলে। যেমন-একজন গাইড টিচারের অধীনে একাধিক ছাত্র থাকতে পারে। এখানে একজন গাইড টিচারের সাথে একাধিক ছাত্র ম্যাচ করবে।

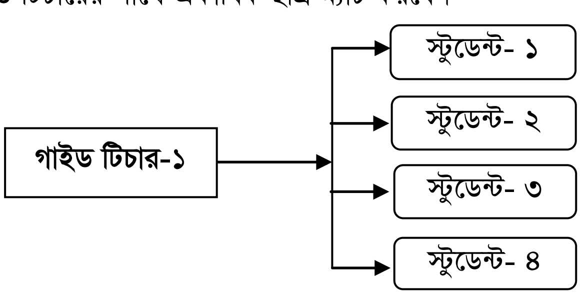

চিত্র: One to many Relation

এ পদ্ধতিতে কোনো ডেটা টেবিলের একটি রেকর্ড অন্য টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে রিলেশন রক্ষা করে। ধরা যাক, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টেবিল-A হলো গাইড টিচারদের তথ্য টেবিল এবং টেবিল-B হলো ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য টেবিল । এখানে টেবিল A এর একটি রেকর্ডের জন্য টেবিল **B** এর একাধিক (৩টি) রেকর্ড আছে। নিম্নের চিত্রে One to Many রিলেশন নির্দেশ করে দেখানো হলো–

টেবিল -A

ক্র: নং	গাইড টিচারের নাম	বিভাগ
০১	মি. মতিয়ার	আইসিটি
০২	মি. দেলোয়ার	আইসিটি
০৩	মি. সজল	পরিসংখ্যান
০৪	মি. এস আহমেদ	বাংলা
০৫	মি.সাইফুল ইসলাম	সা. বিদ্যা

টেবিল -B

রোল নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম	গাইড টিচারের নাম
১০১	আলভী	মি. মতিয়ার
১০২	শুভদ্বীপ	মি. মতিয়ার
১০৩	জিসান	মি. মতিয়ার
১০৪	সুজন	মি. সজল
১০৫	আবদুল্লাহ	মি. সজল

চিত্রঃ One to Many Relation

Many to Many:

যখন কোনো টেবিলের একাধিক রেকর্ডের জন্য অন্য টেবিলের একাধিক রেকর্ড থাকে তখন তাকে Many to Many রিলেশন বলে। যেমন: একাধিক ছাত্র একাধিক বিষয় পছন্দ করতে পারে।

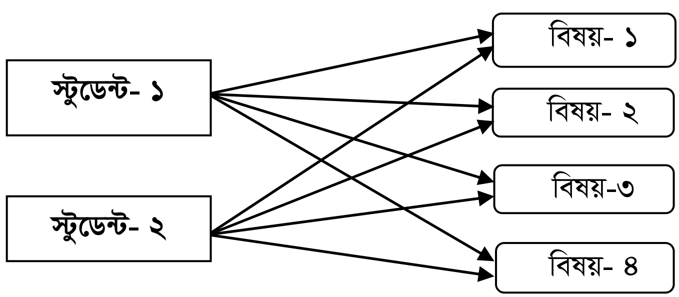

দুটি টেবিলের মধ্যে যখন উভয় পক্ষে একাধিক ম্যাচিং রেকর্ড থাকে তখন তাদের মধ্যে Many to Many রিশেলশন প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ রিলেশন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৃতীয় আরেকটি টেবিলের প্রয়োজন হয়- যাকে জাংশন (Junction) টেবিল বলা হয়। মনে করি, টেবিল A তে ছাত্র-ছাত্রীদের রোল এবং নাম রয়েছে , অপরদিকে টেবিল B তে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত বিভিন্ন বিষয়ের নাম এবং ঐ বিষয়ের কোড নম্বর রয়েছে। এক্ষেত্রে A টেবিলের কোনো রেকর্ডের বিপরীতে B টেবিলে একাধিক ম্যাচিং কেস থাকতে পারে। আবার B টেবিলের কোনো রেকর্ডের বিপরীতে A টেবিলে একাধিক ম্যাচিং রেকর্ড থাকতে পারে। এরকম রিলেশন তৈরি করতে চাইলে তৃতীয় একটি জাংশন (Junction) টেবিল তৈরি করার প্রয়োজন হয়। জাংশন টেবিলে উভয় ডেটাবেজের প্রাইমারি কী নিয়ে দুটি ফিল্ড তৈরি করতে হবে। Many to Many রিলেশনশপ জাংশন টেবিলের জন্যে উভয় দিক থেকে One to Many রিলেশনশিপের মতো। ধরা যাক, A টেবিল এবং B টেবিলের মধ্যে Many to Many রিলেশন তৈরি করতে J নামে একটি Junction টেবিল তৈরি করা হলো। J টেবিলের কাছে অন্য দুটি রিলেশন One to Many রিলেশনের মতো কাজ করবে।

নিম্নে একটি Many to Many রিলেশনশিপের চিত্র উপাস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল–A	
রোল নং	**ছাত্র-ছাত্রীর নাম**
৫০১	আলভী
৫০২	শুভদ্বীপ
৫০৩	জিসান
৫০৪	সুজন
৫০৫	আবদুল্লাহ

টেবিল–B	
বিষয় কোড	**বিষয়ের নাম**
১০১	বাংলা ১ম পত্র
১০২	বাংলা ২য় পত্র
১০৭	ইংরেজি ১ম পত্র
১০৮	ইংরেজি ২য় পত্র
২৩৭	কম্পিউটার শিক্ষা ১ম পত্র
২৩৮	কম্পিউটার শিক্ষা ২য় পত্র

টেবিল–J		
রোল নং	**বিষয় কোড**	বিষয়ের নাম
৫০১	১০১	বাংলা ১ম পত্র
৫০১	১০২	বাংলা ২য় পত্র
৫০১	১০৭	ইংরেজি ১ম পত্র
৫০৪	১০৮	ইংরেজি ২য় পত্র
৫০৪	১০৭	ইংরেজি প্রথমপত্র
৫০৪	২৩৭	কম্পিউটার শিক্ষা প্রথম পত্র

চিত্রঃ Many to Many Relation

যেসব ডেটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন স্থাপন করা হয় তাদের মধ্যে অন্তত একটি কমন ফিল্ড থকতে হয়। এ কমন ফিল্ডের নাম, ডেটা টাইপ, ফরমেট, ফিল্ড সাইজ ইত্যাদি হুবহু একই থাকতে হয়। রিলেশনাল ডেটা টেবিলের একটি ফিল্ডকে প্রাইমারি কী হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়।

যে ফিল্ডের ডেটাগুলো অদ্বিতীয় সে ফিল্ডকে প্রাইমারি কী ফিল্ড বলে। যদি একাধিক ফিল্ডের সমন্বয়ে প্রাইমারি কী গঠিত হয় তখন তাকে কম্পোজিট প্রাইমারি কী বলে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি ডেটা টেবিলের প্রথমটি প্রাইমারি কী যদি ২য় ডেটা টেবিলে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে ফরেন কী বলে। উল্লেখ যে ২য় টেবিলে একটি প্রাইমারি কী থাকবে।

দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরির পদ্ধতি: মাইক্রোসফট এক্সেস ব্যবহার করে দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরির পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো। যথা:

১. প্রথমে টেবিল দুটি ওপেন করতে হবে।

২. Tools মেনু থেকে Relationships-এ ক্লিক করতে হবে। তখন পর্দায় Relationships উইন্ডোটি দেখা যাবে এবং এর উপরে Show Table ডায়ালগ বক্সটি দেখা যাবে।

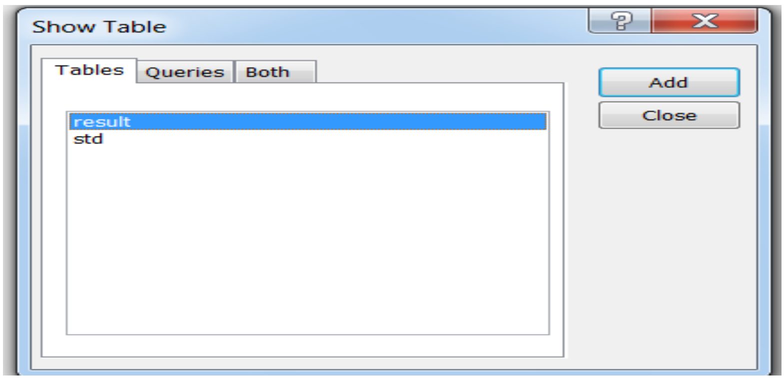

৩. তারপর result টেবিলটি সিলেক্ট করে Add বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর std টেবিলটি সিলেক্ট করে Add বাটনে ক্লিক করলে টেবিল দুটি Relationships উইন্ডোতে দেখা যাবে।

৪. Show Table ডায়ালগ বক্সের ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলে তখন পর্দায় নিম্নের Relationships উইন্ডোতে দেখা যাবে।

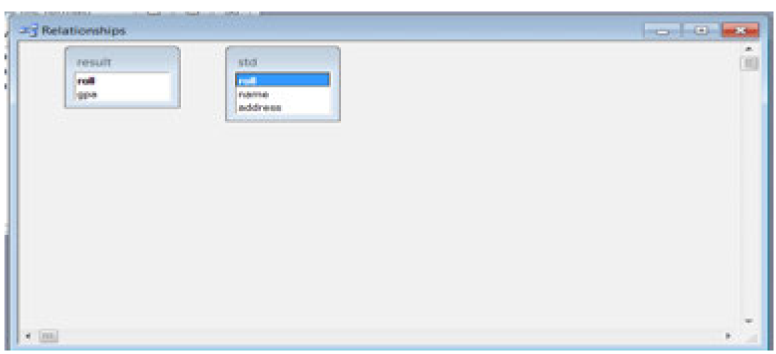

৫. তারপর result টেবিলের roll ফিল্ডকে ড্রাগ করে std এ ছেড়ে দিতে হবে। এরপর পর্দায় Edit Relationship ডায়ালগ বক্স আসবে।

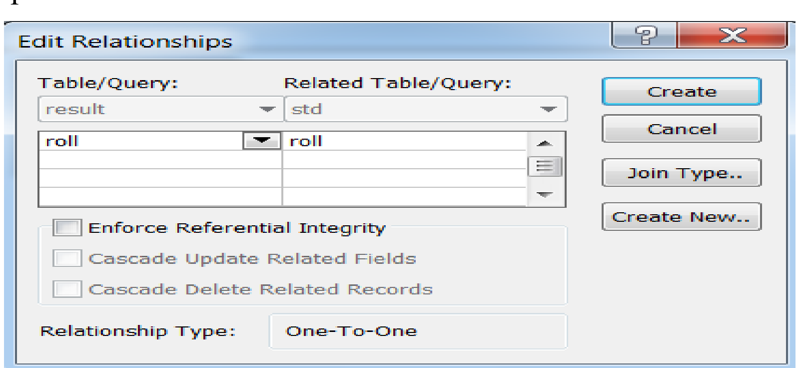

৬. এ Edit Relationship বক্স থেকে Create বাটনে ক্লিক করলে নিম্নের চিত্রের ন্যায় রিলেশন তৈরি হবে।

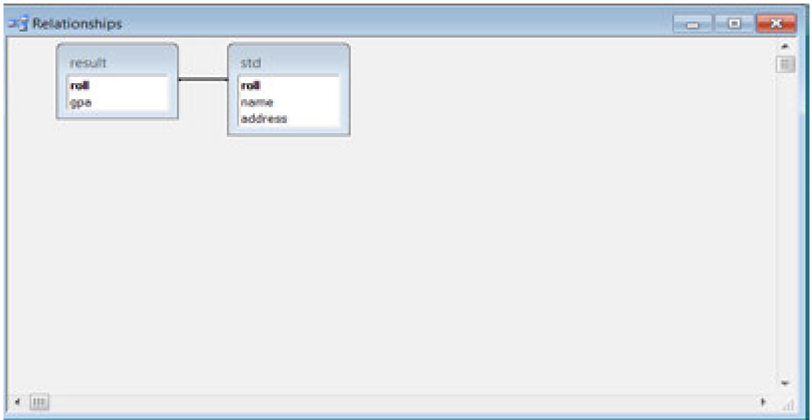

৭. File মেনু থেকে Save বাটনে ক্লিক করে রিলেশনটি একটা নাম দিয়ে Save করতে হবে।

৬.৮ কর্পোরেট ডেটাবেজ (Corporate Database)

কর্পোরেট ডেটাবেজ হলো প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সেই ডেটাবেজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ এন্টারপ্রাইজের একাধিক ব্যবসা-বাণিজ্য থাকতে পারে। প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের বিভাগ বা অনুবিভাগ থাকে যেমন- উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ, বিপনন, গ্রাহক সেবা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আইটি, অডিট, গ্রাহক সেবা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এ ডেটাবেজ গড়ে তোলে যেখানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকা সকল ডেটার এক বিশাল সংগ্রহ থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মী, ক্রেতা, সরবরাহকারি, অংশীদার এবং সরকারকে নির্ভুল ও সময়মতো তথ্য প্রদান করতে হয়। কর্পোরেট ডেটাবেজ এ কাজটিকে সহজ করে তোলে। কর্পোরেট ডেটাবেজে প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজের জন্য এ ডেটাবেজকে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

চিত্র: কর্পোরেট ডেটাবেজ

এসব ডেটা বিভিন্নভাবে সংরক্ষিত হতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- Simple Sequential Files
- Indexed Sequential & Random Access Files
- Hierarchic Database Management Systems (IMS)
- Network Database Management Systems (ORACLE)
- End-User Database Management System (DBASE, PARADOX, ACCESS)
- Spreadsheets (EXCEL, QUATTRO PRO)

কোনো বৃহৎ এন্টারপ্রাইজ অথবা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ বা উপ- বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে কর্পোরেট ডেটাবেজ তৈরি করা হয়। কর্পোরেট ডেটাবেজ কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই মূল্যবান সম্পদ। তাই এটিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আজকাল ছোটখাট, কার্যকর ও লক্ষ্য স্থির করা বিপণন কোম্পানিগুলোও তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্পোরেট ডেটাবেজ ব্যবহার করে থাকে। আরও বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত। কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যবহৃত জনপ্রিয় কিছু ডেটাবেজ সফটওয়্যার হলো-

(i)	Oracle	(v)	Teradata	(ix)	Access
(ii)	DB2	(vi)	ADABAS	(x)	Informix ইত্যাদি।
(iii)	SQL Server	(vii)	MySQL		
(iv)	Sybase	(viii)	FileMaker		

কাজ: কর্পোরেট ডেটাবেজের সুবিধাগুলো লিখ।

৬.৯ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ
Database in Government Organization

সরকারি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত উপায় হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডেটাবেজ ব্যবহার করা। শক্তিশালী সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায় ডেটাবেজ হলো গুরত্বপূর্ণ একটি উপাদান। প্রতিটি সরকারের অধীনে থাকে অসংখ্য মন্ত্রণালয়। এসব মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্রভাবে কিংবা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিত উপায়ে কাজ করে থাকে। এসব কাজে তথ্যের ব্যবহার অপরিহার্য। এ তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও সুন্দর ও কার্যোপযোগী করে তুলতে পারে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডে এসব তথ্যকে ব্যবহার করে আশাতীত ফলাফল পাওয়া যায়। যেমন– নির্দিষ্ট সময় পর পর দেশে আদমশুমারি পরিচালিত হয়। এ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেশের নাগরিকদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এসব তথ্য পরবর্তীতে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করলে তা থেকে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এগুলোকে পৃথকভাবে কাজে লাগাতে পারে। এর ফলে যে অঞ্চলে যে ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন সেগুলো করার জন্য বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সরকারের জন্য সহজ হয়ে যায়।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ এর ব্যবহার

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ছবিসহ ব্যক্তিগত নানা তথ্য, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখতে পারে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী। এর ফলে যেকোনো অপরাধ সংঘটিত হলে ঘটনাস্থলের বিভিন্ন আলামত, আঙ্গুলের ছাপ, রক্ত, ব্যবহৃত হাতিয়ার ইত্যাদি পরীক্ষা করে সহজে অপরাধী সনাক্ত করা যায়।

সরকারি নানা গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করা, পরিসংখ্যান ব্যুরো, নির্বাচন কমিশন, ব্যানবেইজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা, আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বিবাহ, তালাক প্রভৃতি রেজিস্ট্রেশন ও রেকর্ড সংরক্ষণ। জন্মহার ও মৃত্যুহার নির্ণয়, জন্ম-মৃত্যু রেকর্ড সংরক্ষণ, দুর্ঘটনার রেকর্ড সংরক্ষণ, আইন, আদালত, মামলা, অধ্যাদেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ। তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে নাগরিকদের ছবিসহ ভোটার আইডি সংরক্ষণ, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, ভূমি ট্যাক্স, আয়কর, ফোন নম্বর সংরক্ষণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোর ছাত্রদের ফলাফল ও তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এর ফলে আমরা যেকোনো সময় বিগত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল দেখতে পারি বা সংগ্রহ করতে পারি। শিক্ষার হার, পাসের হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি সংরক্ষণ, ভূমি জরিপ, নানা ধরনের রেকর্ডের তথ্য সংরক্ষণ, সরকারি বিভিন্ন নথিপত্র ও জরিপ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ, শহর বা গ্রামাঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন রেকর্ড সংরক্ষণ, জেলা, থানা বা এলাকাওয়ারী বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, সামরিক বাহিনীর ভূমি, সৈন্য, অপারেশন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি আয়-ব্যয়, রাজস্ব বা উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রভৃতি কাজে। তাছাড়াও বর্তমানে অনলাইনে বিদেশে গমনেচ্ছুদের ডেটাবেজ সংরক্ষিত আছে। এর ফলে অতি সহজে নির্দিষ্ট পেশার বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিক নির্বাচন করা যায়। মোট উৎপাদন, বার্ষিক জিডিপি, গড় আয়, বিদেশি ঋণের পরিমাণ প্রভৃতি নিরূপণ ও সংরক্ষণ, স্টক মার্কেটে শেয়ার দর, কোম্পানি প্রোফাইল, কোম্পানি প্রসপেক্টাস, সূচক প্রভৃতি নির্ণয় ও সংরক্ষণ আয়কর, কাস্টম, আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স প্রভৃতি সংরক্ষণ। অর্থাৎ সার্বিকভাবে সরকারি পর্যায়ে ডেটাবেজ ব্যবহারের কারণে রাষ্ট্রের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনা সম্ভব।

৬.১০ ডেটা সিকিউরিটি (Data Security)

ডেটা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কখনো ডেটা প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ আবার কখনো ডেটা গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরি। যেমন বর্তমানে প্রায় সকল ব্যাংক ক্রেডিট/ডেভিড কার্ড প্রচলন করছে। কার্ডের মাধ্যমে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিন কোড / পাসওয়ার্ড এটি অত্যন্ত গোপনীয়, যদি অন্য কেউ এ পিন কোড জানতে পারে তাহলে কার্ডের মাধ্যমে যে কেউ টাকা উত্তোলন করতে পারবে। কোনো কোম্পানি চায়না অন্য কেউ তার সকল তথ্য জেনে যাক। সেক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক গোপনীয় ডেটার ব্যবহার অনুমোদিত হওয়া উচিৎ নয়। ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডেটাবেজের গোপনীয়তা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ডটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার ব্যবহারকারিদের বিভিন্ন ধরনের এক্সেস ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন।

চিত্র: ডেটা সিকিউরিটি পলিসি

যেমন: কোনো ব্যাংকের একাউন্টেন্ট গ্রাহকদের হিসাবে টাকা যোগ বা বিয়োগ করতে পারে অর্থাৎ ব্যালেন্স পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো অফিসার এ কাজটি করতে পারে না, হয়তো অন্যরা শুধু বিভিন্ন তথ্য দেখতে পারে বা সীমিত তথ্য পরিবর্তন করতে পারে।

ডেটাবেজ সিকিউরিটি নিচের বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে:

- ব্যবহারকারির ডেটা ব্যবহার করার অধিকার সংরক্ষণ করা।
- সিস্টেম রিসোর্স ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- ডিস্ক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- ব্যবহারকারির অ্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করা।
- ব্যবহারকারির ডেটা ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করা।

চিত্র: ডেটা সিকিউরিটি পলিসি

ডেটাবেজের সিকিউরিটি প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) সিস্টেম সিকিউরিটি (খ) ডেটা সিকিউরিটি।

৬.১১ ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption)

ডেটা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরের সময় ডেটার গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতে পারে, বিশেষ করে যদি ডেটা পাবলিক পথ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত মূল ডেটাকে বিশেষ কোডের মাধ্যমে পরিবর্তিত করে প্রেরণ করা হয়। মূল ডেটাকে গোপন করার পদ্ধতিকে বলা হয় এনক্রিপশন। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় ডেটাকে বিশেষ কোডের মাধ্যমে গোপন / পরিবর্তন করা হয় তাকে এনক্রিপশন বলে। উৎস ডেটাকে এনক্রিপ্ট করে পাঠালে প্রাপক ঐ ডেটা ব্যবহারের পূর্বে ডিক্রিপ্ট করতে হয়। এনক্রিপ্ট করা ডেটাকে নির্দিষ্ট নিয়মে মূল ডেটায় পরিবর্তন করাকে বলা হয় ডিক্রিপ্ট। প্রেরক এবং প্রাপককে যথাক্রমে এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট করার পদ্ধতি / অ্যালগরিদম জানতে হয়। ডেটা এনক্রিপ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে–

১. সিজার কোড (Caesar Code)
২. ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Data Encryption Standard-DES)
৩. ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম (International Data Encryption Algorithm-IDEA)

এদের মধ্যে আমেরিকার National Bureau of Standards (NBS) কর্তৃক উদ্ভাবিত Data Encryption Standard-DES পদ্ধতি হলো বহুল ব্যবহৃত এনক্রিপশন পদ্ধতি। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সময় থেকে ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য সিজার কোড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে আসছে।

এনক্রিপশন পদ্ধতি-১: এ পদ্ধতিতে ইংরেজি প্রত্যেক বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বর্ণ ব্যবহার করা হয়। যেমন- ইংরেজি প্রত্যেক বর্ণকে তার পরবর্তী বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে- ALVIE শব্দটির এনক্রিপশন হলো BMWJF এখানে মূল শব্দের প্রত্যেক বর্ণের পরবর্তী বর্ণ ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হয়েছে।

এনক্রিপশন পদ্ধতি-২: এ পদ্ধতিতে মূল ডেটার প্রত্যেক বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

১. অবস্থানগত সংখ্যাকে ৮ দ্বারা গুণ করা হয়।
২. গুণফলের মানকে অবস্থান ধরে বর্ণমালার ক্রমানুসারে যে বর্ণটি পাওয়া যায় তা এনক্রিপ্টেড বর্ণ হিসাবে ধরা হয়।
৩. গুণফল ২৬ অপেক্ষা বড় হলে গুণফলকে ২৬ দ্বারা ভাগ করে ভাগশেষ নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে ভাগশেষের মানকে অবস্থান ধরে বর্ণমালার ক্রমানুসারে যে বর্ণটি পাওয়া যায় তা এনক্রিপ্টেড বর্ণ হিসাবে ধরা হয়।

এ পদ্ধতিতে CAESAR শব্দটি এনক্রিপ্ট করি-

C = 3 X8 = 24 → X
A = 1X8 = 8 → H
E = 5X8 = 40 → 40÷ 26 → ভাগশেষ 14 → N
S = 19X8 = 152 → 152÷26 → ভাগশেষ 22 → V
A = 1X8 = 8 → H
R = 18X8 = 144 → 144÷26 → ভাগশেষ 14 → N

সুতরাং CAESAR শব্দটি এনক্রিপ্ট হয়ে XHNVHN হয়ে গেল, যা Chiper Text হিসেবে পরিচিত।

কাজঃ তোমার নিজের নামের একটি এনক্রিপ্ট কোড তৈরি কর। যেখানে প্রত্যেকটি বর্ণ তার পূর্ববর্তী বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নিচের অনুচ্ছেদগুলো পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

১। XYZ কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি তথ্য, পরীক্ষার রেজাল্ট, বেতনের হিসাব, প্রভাষকদের তথ্যসমূহ কম্পিউটারে সংরক্ষণের চিন্তা করছেন। এজন্য কলেজের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের প্রভাষক মি. খানের পরামর্শ চাইলেন। মি. খান অধ্যক্ষ মহোদয়কে একটি রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয় করার পরামর্শ দিলেন।

ক. RDBMS এর পূর্ণরূপ লিখ।
খ. ফিল্ড ও রেকর্ড বলতে কী বুঝ?
গ. ছাত্র-ছাত্রীদের রোল, নাম, জিপিএ, ঠিকানা নিয়ে একটি এবং রোল, নাম, বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর নিয়ে একটি ডেটা টেবিল তৈরি কর এবং এদের মধ্যে রিলেশন তৈরি কর।
ঘ. অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর কলেজের জন্য রিলেশনাল ডেটাবেজ তৈরি করলে কি কি সুবিধা পাবে? বিশ্লেষণ কর।

২। বর্তমানে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অনেক সফলতা এনেছে। এখন বিভিন্ন কাজে যেমন স্কুল কলেজে ভর্তি, চাকুরির আবেদন, ভোটার সনাক্তকরণ ইত্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন তথ্য অতি সহজে পাওয়া এবং ব্যবহার করা যায়।

ক. সর্টিং কি?
খ. কম্পোজিট প্রাইমারি কী বলতে কি বুঝ?
গ. সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজের ব্যবহার বর্ণনা কর।
ঘ. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ডেটাবেজ তৈরি করলে জনগণ কি কি সুবিধা পাবে? –ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করার জন্য নিচের কোনো সফটওয়্যারটি প্রয়োজন?
ক. ওরাকল খ. ইউনিক্স গ. সি ঘ. জাভা

২। ডেটাবেজে মন্তব্য লিখার জন্য ঐ ফিল্ডের ডেটা টাইপ কী হবে?
ক. text খ. Number গ. OLE object ঘ. memo

৩। many to many রিলেশন তৈরি করতে কতটি টেবিল প্রয়োজন হয়?
ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ১ টি ঘ. ৪ টি

৪। সিসি কলেজ তার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করেছে। এর ফলে–
i. সহজেডেটা এন্ট্রি করতে পারবে।
ii. সংখ্যাবাচক ডেটাসমূহে সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাব করতে পারবে।
iii. কাঙ্ক্ষিত রেকর্ড সহজে খুঁজে বের করতে পারবে।
নিচের কোনোটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত